নবলীলা

উপন্যাস।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রণীত।

"Man can do no other. In this wild element of a life, he has to struggle onwards; now fallen, deep-abased; and ever, with tears, repentance, with bleeding heart, he has to rise again, struggle again still onwards."

"No nobler feeling than this of admiration for one higher than himself dwells in the breast of man."

"All God's works are still in a sense symbols of God."

THOMAS CHARLYLE.

প্রথম সংস্করণ—১৫০০।

কলিকাতা,

২১০/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে,

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত এবং ২১০/৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রাবণ—১২৯২।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

উৎসর্গ।

শ্রদ্ধেয় সুহৃদ—শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ

সুহৃদবরেষু।

দুঃখীর বন্ধু—নবীন বাবু,—

দুঃখীর গৃহে যিনি পদার্পণ করেন, পৃথিবীর সুখ-স্বর্ণ তিনি কখনই পাইতে আশা করিতে পারেন না। দুঃখীর গৃহে,—সুখ নাই, শান্তি নাই,—আমোদ নাই, উল্লাস নাই,—ক্রীড়া নাই, কৌতুক নাই;—আছে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া, কেবলই ঘনীভূত মসীময়ী দুঃখরাশি। আমি জন্মদুঃখী, তাহা আপনি জানেন। পাইয়া পাইয়া লোক ধনী হয়, পাইয়া পাইয়া দিন দিন আমি কাঙ্গাল হইতেছি,—আমার দারিদ্র্য দিন দিন বাড়িতেছে। দুঃখেই জীবন্ আরম্ভ, দুঃখই সম্বল। আমার গৃহে এপর্য্যন্ত যে সকল চিত্র ফুটিয়াছে, সে সকলই দুঃখের চিত্র, তাহা আপনার নিকট অপরিচিত নাই। দুঃখীর হৃদয় হইতে কেবল দুঃখের চিত্রই ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মলিন দুঃখের চিত্রগুলিকে লইয়া আমি কতই খেলা খেলিতেছি। যাঁহাকে যা মনে হইতেছে, হাতে তুলিয়া দিতেছি। শিশু ধূলিমুষ্টি উপহার দিয়া যেমন আনন্দিত হয়, আমিও তেমনি বন্ধুবর্গকে দুঃখের চিত্র উপহার দিয়া আনন্দিত হইতেছি। ইহাতেই আমার সুখ। দুঃখই যার সম্বল, দুঃখেই সে সুখী। একবারও ভাবিতেছি না, বন্ধুবর্গ আমার উপহারে বিরক্ত হইতেছেন! ভাবিব কেন? জানিয়া শুনিয়া এ দুঃখীর গৃহে যিনি আসিবেন, তাঁহার মনে অন্য আশার স্থান পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র; দুঃখ দিয়াই তাঁহাকে ঢাকিব। শিশুর ক্রীড়ালয়ে যে যায়, শিশুর ধূলি-বালিতে তাহার অঙ্গ ঢাকিবেই ঢাকিবে। আপনাকে গৃহে পাইয়াছি ত, আপনার সকল ভূষণ কাড়িয়া লইব,—আপনার আনন্দ আর শান্তি, সুখ আর বিলাস,—সকল আভরণ কাড়িয়া আজ এই গাঢ় দুঃখরাশিকে আপনার হৃদয়ে ঢালিয়া দিব;—পাষাণ ফাটিয়া জল পড়িবে,—হৃদয় ভাঙ্গিয়া প্রেম গলিবে, তবে ত ছাড়িব! হায়, মূর্খের আশা কত! নবীন বাবু, দুঃখীর আশা কত, একবার দেখুন। আশা নাই?—একজনকে কাঁদাইতে পারিব না? একজনের সুখকে ডুবাইতে পারিব না?—একজনের হৃদয়কে কাড়িয়া নিরানন্দে, শোকে, ও দুঃখে মজাইতে পারিব না?—আর কাহাকে না পারি, আপনাকে পারিব। আর কাহাকে

না পারি, ভালবাসার ফাঁদে যাঁহার পা পড়িয়াছে, তাঁহাকে পারিব। আর কাহাকে না পারি, দুঃখীর গৃহে যিনি পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকে পারিব। ভারত চিরকালই ধর্ম্মনীতি-হীন জাতিভেদের আনন্দ-গীতি গাইবে,—ইংরাজ নিন্দানীতিকে কণ্ঠের ভূষণ করিয়া রাখিবে? ভারতে কি কেবলই অবিশ্বাস আর নাস্তিকতা, অপ্রেম আর কুসংস্কার রাজত্ব করিবে? আমি তাহা সহিতে পারি না। তাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, অন্তত একজনকে, দুঃখের অশ্রুতে চিত্রিত করিয়া, উদার সাম্যবাদের বিশ্ব-প্রেমময় চিত্র দেখাইব,—একজনকে অন্তত সে চিত্র দেখাইয়া গভীর জাতীয় চিন্তাতে নিমগ্ন করিব,—একজনকে অন্তত বিশ্বাস ভক্তির কথা শুনাইব। অনেক কষ্টে, দুঃখের তুলিকায়, এক খানি ছবি আঁকিয়াছি। কাহাকে ইহা দেখাইব? চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম, আর কাহাকেও দরিদ্রের গৃহে পাইলাম না—সম্মুখে সদানন্দময়, প্রেম-বিহ্বল, বন্ধুত্ব-কাতর, সরল-প্রাণ আপনাকেই দেখিতে পাইয়া ধরিয়াছি। এ দুঃখের কাহিনী আপনাকেই বলিব, আপনাকেই শুনাইব! এ দুঃখের চিত্র আপনাকেই উপহার দিব, আপনাকেই দেখাইব! এ বিষাদের কাহিনী আপনাকেই শিখাইব, আপনা-কেই জানাইব। আপনার আনন্দকে নিরানন্দে ডুবাইব, সুখকে দুঃখে ঢাকিব, —হাসিময় ফুল্ল-কমলকে ক্রন্দনময় অশ্রুতে সিক্ত করিব। এ দুঃখের কাহিনী শুনিয়াও যদি আপনি পূর্ব্ববৎ থাকিতে পারেন, আমার কিছুই বক্তব্য থাকিবে না। একবার স্থির হউন, আমি দুঃখ-বালি দিয়া ভাণ্ড করিয়া, শিশুর ন্যায়, একবার আপনাকে সাজাইয়া দি, তারপর ধূলি ঝাড়িতে পারেন, ঝাড়িবেন। আমি একবার আপনাকে দুঃখের সাজে সাজাইয়া সুখী হই। একটু স্থির হউন, একবার আমার ভাণ্ডারের সকল দুঃখ-বালি আপ-নার ক্রোড়ে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হই। নবলীলা—দুঃখময়, বিষাদময় হৃদয়-কাহিনী;—সাম্যবাদের বীজমন্ত্র;—ঘোর অন্ধকারময় জীবন্ত দুঃখ রাশি। আজ আপনাকে এই দুঃখরাশিকে উপহার দিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম, নিশ্চিন্ত হইলাম। পূর্ণ দুই বৎসরের ভার সমর্পণ করিয়া—হৃদয়-টাকে পাত্‌লা করিলাম। শিশুর আনন্দ আজ দেখে কে?

আপনার স্নেহের—

আনন্দ-আশ্রম
১৫ই শ্রাবণ—১২৯২

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গরলধারিণী—বিপদের কোলে।

সন্ন্যাসী বিনোদ শান্তিপাহাড়ে শান্তিরাজ্য-শাসনের ভার পাইলেন। উদাসীনতায়—আসক্তি, প্রেমে—কর্ম্ম মিশিল। প্রথমে জ্ঞান, পরে উদাসীনতাময় প্রেমের অঙ্কুর, পরে কর্ম্মশীলতার প্রবল স্রোত, দৈব বিড়ম্বনায়, বিনোদের হৃদয়কে অধিকার করিল। ক্ষেত্র পাইয়াছি, কার্য্য করিব;—ভগবতীর রাজ্যে খাটিয়া মায়ের চরণ-পূজার সাধ মিটাইব, এই ইচ্ছা জন্মিল। জ্ঞান, প্রেম, ও কর্ম্ম, এই তিন যখন জোট বাঁধিয়া বিনোদকে ধরিল, তখন উদাসীনতা—অলসতা ভয়ে জড়সড় হইয়া পলায়ন করিল;—কর্ত্তব্যের প্রবল স্রোত সর্ব্বশরীরে বহিতে লাগিল। ঘটনা-পীড়নে, সন্ন্যাসী সংসারী হইলেন, উদাসীন কর্ম্মশীল হইলেন। সাধুইচ্ছার রাজ্য বুঝি এমন করিয়াই বিস্তৃত হয়। এণ্ডার্‌সনের ঐকান্তিক ইচ্ছার রাজ্য, বিনোদের প্রাণে, সহজ ও সরলভাবে বিস্তৃত হইল। মঙ্গলময়ের রাজ্যে কেবল ইচ্ছারই জয়। ইচ্ছার সহিত সংগ্রামে পৃথিবীর সকল শক্তি পরাস্ত। ইচ্ছার সাধনা করিয়া দেখ, মানুষ, তোমার সকল অসাধ্য সাধিত হইবে। ইচ্ছাকে অসৎবৃত্তির সহিত, মানুষের কূটবুদ্ধি-প্রসূত বাসনার সহিত মিলাইও না। ইচ্ছা, মঙ্গলময়ের মঙ্গল-দূত, মানুষের নহে। মঙ্গলময়ের ইচ্ছা মানুষের প্রাণে অবতীর্ণ হইলে, ইচ্ছার কার্য্য জগতে অপ্রতিহত প্রভাবে হইবেই হবে। ঈশ্বরের রাজ্যে কেবল ইচ্ছারই জয়। ইচ্ছাতেই সৃষ্টি—ইচ্ছাতেই ন। স্বর্গের ইচ্ছা স্বর্গ ছাড়িয়া মানুষের প্রাণে যখনই উদিত হই—তখনই পৃথিবীতে তাহার কার্য্য অপরাজিত প্রভাবে সম্পন্ন হই-ইচ্ছাতে অমঙ্গল নাই, দুর্নীতি নাই, অসৎভাব নাই—পৃথিবীর য়ু নাই। এণ্ডার্‌সনের সৎ ইচ্ছার কার্য্য, অলক্ষিত ভাবে, বিনো-

দের জীবনে সম্পন্ন হইতে লাগিল যখন, তখন বিনোদ বুঝিলেন, তাহার পূর্ব্বের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইল; কিন্তু চেষ্টা করিয়া আর সে স্বভাবের গতিকে প্রতিরোধ করিতে ইচ্ছা হইল না। যাহা হইবার, তাহা হইতে লাগিল;—সাধু-ইচ্ছার মঙ্গলময় রাজ্য বিস্তৃত হইল। অসংখ্য মানব-সন্তানের ভার গ্রহণ করিয়া, বিনোদ বিষম ভাবনার মধ্যে পড়িলেন। ভাবনাতে কার্য্যের প্রবল স্রোত থামিবার নহে—দ্বারে অসংখ্য ভিক্ষুক, দান করিতেই হইবে; নিকটে অসংখ্য রোগী, ঔষধ দিতেই হইবে। ভাবনার পরেই চেষ্টা আরম্ভ হইল। চেষ্টার সহায়, জিতন ও ফেলাই সিংহ। উভয়ে, দাসানুদাসের ন্যায়, বিনোদের সাহার্য্য করিতে লাগিল। অতি গোপনে, বিনোদের চেষ্টার ফল প্রসূত হইতে লাগিল। প্রেমের অবতার, শান্তির অবতার হইলেন। প্রেম আর শান্তির লীলা, একত্রে বিস্তৃত হইতে লাগিল;—পশু সদৃশ অগণ্য অসংখ্য পাহাড়ীদের রক্ত-পিপাসা একটু একটু করিয়া কমিয়া আসিতে লাগিল। বিনোদের চেষ্টায়, সাহেব-ঘৃণা, সাহেব-বিদ্বেষ ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল। পরস্পরের উন্নতির জন্য, সকল পাহাড়ীর প্রাণে কেমন একটা টান জন্মিল। তীর ধনুক রাখিয়া, অনেকে লাঙ্গল ধরিয়া কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইল। বিনোদের ভাবনা-মেঘাবৃত চেষ্টায় প্রভূত ফল ফলিল। ভাঙ্গাজীবনে শুভ ইচ্ছার ফল ফলিল। বিনোদ খাটিয়া সুখী হইলেন, পরিশ্রম করিয়া কৃতার্থ হইলেন। প্রেমেতে ও শান্তিতে পাহাড়কে শাসনে রাখিতে লাগিলেন।

সেই জ্যোৎস্না বিধৌত রজনীর পর হইতে, পাহাড়ীরা আর অত্যাচার করিতে প্রান্তরে নামিল না। এমন নিভৃত অরণ্যবেষ্টিত পাহাড়ের মধ্যে তাহারা বাস করিতে লাগিল যে, অল্প সংখ্যক ইংরাজেরা তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিল না। বৃক্ষের উপরে বৃক্ষ, পাহাড়ের উপরে পাহাড়,—অসংখ্য বৃক্ষশ্রেণী, অসংখ্য পাহাড়শ্রেণী। সংক্ষিপ্ত পথ ইংরাজেরা জানে না, পাহাড়ের গায়ে উঠিতে তাহারা তত অভ্যস্ত নহে। একে অনভ্যস্ত, তাতে সাহেবদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প,—তাতে পথশূন্য পাহাড়ের গায়ে উঠিতে সর্ব্বদাই আশঙ্কা হয়; কারণ পদস্খলন হইলেও মৃত্যু, ঊর্দ্ধ হইতে পর্ব্বত খণ্ড প্রক্ষিপ্ত হইলেও মৃত্যু। মৃত্যুর ভয়ে, অল্পসংখ্যক সাহেবেরা, প্রাণ মনে অত্যাচারীদের অনুসন্ধান করিতে পারিল না। কিয়দ্দিবস পরে, সংবাদ পাইয়া, স্থানান্তর হইতে বহুসংখ্যক ইংরাজ সৈন্য, দর্পে মেদি-

নীকে কাঁপাইয়া, দলে দলে পৌঁছিল। অশিক্ষিত পাহাড়ীদের অত্যাচার প্রশমিত করিতে, অনেক দুর্দ্দম সুশিক্ষিত সৈন্য পৌঁছিয়া ছাউনি পুতিল। ইংরাজ প্রতাপে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইল।

সেই রাত্রে বিনোদ যখন ফেলাই সিংহের সহিত চলিলেন, তখন জেলী বিনোদের অকৃতজ্ঞ চরিত্রের কথা ভাবিলেন, ভাবিয়া মনে মনে বিনোদকে অনেক গালিগালাজ দিলেন। ঘটনার সূক্ষ্ম কারণ না জানিতে পারিলে যাহা হয়, তাহা হইল। অভিপ্রায়ের মর্ম্মভেদ করিতে না পারিলে যাহা হয়, তাহা হইল। বিনোদ যে উদ্দেশ্য কল্পনায় আঁকিয়া ফেলাই সিংহের সহিত চলিলেন, জেলী তাহা বুঝিল না, মানব-সমাজের অসংখ্য একদেশ-দর্শী লোকের ন্যায়, জেলী সেই ঘটনা হইতে, আপন প্রবৃত্তি ও চিন্তা অনু-সারে, কূট ভাব বাহির করিলেন। হিংসার দুর্দ্দম্য তাড়নায়, মানুষ আর মানুষের ভালভাব গ্রহণ করিতে পারে না। এ দেশী লোকেরা ভাল, ইহা জেলীর প্রাণে কখনই সহিত না। স্বামীর ভালবাসা যখন বিনোদের হৃদয়কে স্পর্শ করিল, তখন জেলীর হিংসা গুপ্ত স্থানে গুপ্ত ভাবে আসন গাড়িল,—বাহির হইল না। জেলী, অতি কষ্টে কোন প্রকারে স্বামীর মন যোগাইয়া চলিতেন। এণ্ডারসন জেলীর ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিলেন না, কিন্তু কি করিবেন, স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে, অন্যান্য সাহেবদের ন্যায়, তাঁহার ইচ্ছা হইল না। হিন্দু-দেব ভাব, পাশ্চাত্য পশুভাবকে পরাস্ত করিয়াছে,—এণ্ডার্সন্ দুর্ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হইয়াও জেলীকে পরিত্যাগ করিলেন না। এই ভাবে এক প্রকারে অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। এ দেশের সকল লোকের প্রতিই জেলীর যে আন্তরিক ঘৃণা,—সে ঘৃণা বিনোদের প্রতিও ছিল। বিনোদের প্রতি যে ঘৃণার ভাব ছিল, তাহা হৃদয়ের অতি গুপ্ত স্থানে পোষিত হইতেছিল। এত দিন পরে, তাহা বাহির হইয়া পড়িল। বাঙ্গালী নরাধম জাতি—চরিত্র-হীন, অকৃতজ্ঞ, পশু;—জেলী আজ বিনো-দের কৃত কার্য্যের মর্ম্মার্থ না বুঝিয়া, এমনি করিয়া মনে মনে গালি দিলেন। যে বিষ এত দিন হৃদয়ে পোরা ছিল, তাহা এই ঘটনায় বাহির হইল। বিষে সর্ব্বশরীর জর্জ্জর হইল—এমন অকৃতজ্ঞ নরাধম বাঙ্গালীকে স্বামী, বন্ধুত্বে বরণ করিয়া, বিল সেঁচিয়া পচাজল পুকুরে আনিয়া ইংরাজকুলে কলঙ্ক লেপিয়াছেন, মনে হইতে লাগিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই সকল সিদ্ধান্ত হইল। এমন কৃতঘ্নের প্রতিশোধ না লইলে ইংরাজকুলে কলঙ্ক

পড়িবে, ইহাও মনে জাগিল। জেলী অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটী বন্দুক লইয়া গৃহের বাহিরে আসিলেন। গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, দস্যুরা অনেক দূরে গিয়াছে। দেখিয়া হৃদয় জ্বলিতে লাগিল। আর অবসর দেওয়া উচিত নহে, নিমেষের মধ্যে ইহা ভাবিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া জেলী দস্যুদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

ফেলাই সিংহের দল পাহাড়ের পদতলে উপস্থিত হইতে না হইতে, জেলীর ঘোড়া তাহাদিগের অতি নিকটে উপস্থিত হইল। অতি নিকটে আসিয়া, জেলী ঘোড়া হইতে অবতরণ করিলেন, ঘোড়ার পদশব্দে দস্যুরা জানিতে পারিবে ভাবিয়া, জেলী মাটীতে অবতরণ করিয়া, ঘোড়াকে বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিয়া চলিতে লাগিলেন। যখন ফেলাই সিংহের লোকেরা পাহাড়ে উঠিতে লাগিল, তখন জেলী বড়ই অসুবিধার মধ্যে পড়িলেন। কি করিবেন, যাইতেই হইবে, প্রতিহিংসার তাড়নে জেলী অত্যন্ত দুঃসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। দস্যুদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গুপ্তভাবে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন। পাহাড়ের ক্রম-উচ্চ স্থানে উঠিতে তত কষ্ট হইল না, ক্রম-উচ্চ স্থান ধরিয়া, বহু বহু অধিত্যকা অতিক্রম করিয়া জেলী অনেক দূর উঠিলেন। ক্রমে পাহাড়ের যে অংশে ঘনীভূত জঙ্গল, সেই অংশে উপস্থিত হইলেন; সে অংশে পাহাড় উর্দ্ধদিকে লম্বভাবে অনন্ত আকাশকে ভেদ করিয়া উঠিয়াছে—চতুর্দ্দিকে ঘোরতর অরণ্য—আকাশের চন্দ্রের আলোক অতি কষ্টে স্থানে স্থানে প্রবেশ করিতেছে;—ভীষণ দৃশ্য। পাহাড়ীরা অক্লেশে উঠিতে লাগিল;—বিনোদকে তাহারা ধরাধরি করিয়া তুলিতে লাগিল। জেলীর পা আর উঠিতে চায় না—হাঁটু ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—সর্ব্ব শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে; ক্লান্ত কলেবর লইয়া জেলীর চলিতে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। ক্লান্তিমাখা কলেবর লইয়া, প্রতিহিংসার উত্তেজনায়, তবুও উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু চেষ্টার ফল ভাল হইল না—হতভাগিনী লম্বস্থানে উঠিতে না পারিয়া, পদস্খলিত হইয়া, নিম্নে পড়িয়া গেলেন। পাহাড় হইতে পড়িলে কি দুর্দ্দশা হয়, যাঁহারা কখনও পাহাড় দেখেন নাই, তাঁহারা তাহা কল্পনাও করিতে পারেন না। হতভাগিনী, উর্দ্ধ হইতে পড়িয়া বৃক্ষে ঠেকিতে ঠেকিতে শব্দ উৎপন্ন করিয়া নিম্নে পড়িতে লাগিল। সে শব্দ, বৃক্ষের পত্র ভেদ করিয়া, নৈশগগনে বিস্তৃত হইতে লাগিল। সে শব্দতে প্রথমে হতভাগিনীর

আর্ত্তনাদের শব্দ মিশ্রিত ছিল, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই হতভাগিনীর বাক-শক্তি রুদ্ধ হইল—চেতনা বিলুপ্ত হইল। সেই ভাবে পড়িতে পড়িতে, সর্ব্ব শরীর দিয়া রক্ত নির্গত হইতে লাগিল,—আঘাত লাগিতে লাগিতে অনেক স্থানের চর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন হইল—পড়িতে পড়িতে, হতভাগিনী অবশেষে এক বিস্তৃত জঙ্গলে ঠেকিয়া রহিলেন। ফেলাই সিংহের দলের লোকেরা ইহার কিছুই সংবাদ পাইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিপদের কোলে—শান্তিকুটীর।

দুঃখের রজনী বসিয়া থাকে, শুনিয়াছ কেহ? বা সুখের দিন চিরস্থায়ী হয়, দেখিয়াছ কেহ? জেলীর দুঃখে পাঠকের হৃদয় ব্যথিত হইতেছে না, তাহা বুঝিয়াছি। একে জেলী বাঙ্গালী-বিদ্বেষী, তাতে আবার বিদেশী, বাঙ্গালী-পাঠকের ঘৃণার পরিসীমা নাই। পাঠক মনে করিতেছেন, হতভাগিনী পাহাড় হইতে পড়িল ত, অস্থি চূর্ণ হইল না কেন? পড়িল ত, মরিল না কেন?—বিপদ আসিল ত, চিরকালের জন্য জেলীকে ডুবাইয়া রাখিল না কেন? মানুষের সকল বাসনাই পূর্ণ হয় না—কোনটী ফুটিয়া শুকায়, কোনটী না ফুটিয়াই বিলীন হয়, কোনটীতে অঙ্কুর জন্মে। পাঠক, তোমার সকল বাসনা পূর্ণ না হইলে দুঃখ করিও না,—পৃথিবীতে কোন লোকেরই সকল বাসনা পূর্ণ হয় না।

জেলীর দুঃখের রাত্রি বসিয়া থাকিল না,—প্রত্যূষে যখন শীতল বায়ু বৃক্ষের ভিতর দিয়া বহিল, তখন জেলীর চেতনা হইল। চৈতন্য লাভ করিয়া জেলী বুঝিল, সর্ব্ব শরীরে বেদনা হইয়াছে—শরীরের অনেক স্থান চিরিয়া রক্ত পড়িয়াছে—জল-পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে। প্রত্যূষের শীতল বায়ু বহিয়া কত পাখীকে মধুর স্বরে ডাকাইল,—কত পুষ্পকে প্রস্ফু-টিত করিল;—কত নব-পল্লবিত শাখাকে আনন্দে দোলাইল; কিন্তু যে বৃক্ষপত্রগুলি ঝড়িয়াছিল, তাহাদিগকে উলটি পালটি কত রঙ্গ দেখিল;—যে ফুলগুলি বৃন্তচ্যুত হইয়া ঝরিয়া পাহাড়ের গায়ে পড়িয়াছিল,—তাহা-দিগকে ধরিয়া লাঞ্ছনার একশেষ করিল—তাহাদিগকে নিষ্ঠুর ভাবে উড়া-

ইয়া, প্রস্তরে প্রস্তরে আঘাত করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিল। পৃথিবীর সকলের অস্তিত্বই কি, এই প্রকার, একের দুঃখ ও অপরের সুখের জন্য? বৃষ্টি পড়ে, বায়ু বয়, সূর্য্য উঠে, চন্দ্র হাসে, কোকিল ডাকে, ফুল ফুটে,—কেবল কি একজনকে হাসাইয়া একজনকে কাঁদাইতে? বাস্তবিকই যেন তাই। সৃষ্টির বৈচিত্র্যে, সকল মনুষ্যই সমান ভাবে সুখী নয়। তোমার অস্তিত্বে যে মুহূর্ত্তে দশজনের আনন্দ বর্দ্ধিত হইতেছে, সেই মুহূর্ত্তেই স্থানান্তরে হয়ত আর দশজনের নিরানন্দ বাড়িতেছে। স্থানবিশেষে তোমার হাসি আমার দুঃখের কারণ; আমার দুঃখ, তোমার হাসির কারণ হইতেছে। একের দুঃখ, অপরের সুখের হেতু; একের সুখ, অপরের দুঃখের কারণ। বৈচিত্র্যে আনন্দ থাকে ত, নিরানন্দও আছে। সেই উষার স্নিগ্ধ আলোকে মাতিয়া, বায়ু, বৃক্ষে বৃক্ষে ফুল ফুটাইল,—আঘাতে আঘাতে বৃন্তচ্যুত ফুলের অস্তিত্ব বিলীন করিল। হতভাগিনী জেলীর শরীরে শীতল বায়ু বহিয়া, জেলীকে চেতনা দিল। চেতনা দিল—যেন জেলীকে কষ্টের দুঃসহ জ্বালায় দগ্ধ করিতে! অচেতন অবস্থায় জেলীর সুখবোধও ছিল না, দুঃখবোধও ছিল না। বায়ু বহিয়া, জেলীকে জাগাইয়া, জ্বালা যন্ত্রণা কি, তাহা বুঝাইল। সর্ব্ব শরীরে বেদনা—সর্ব্বাঙ্গে রক্তময় ক্ষত—সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা—তায় কণ্ঠ শুষ্ক। নিষ্ঠুর বায়ু, তৃণ পত্র, ফলফুল উড়াইয়া জেলীর গায়ে ঢালিতে লাগিল;—পরিধানের বস্ত্রাদি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কোথায় গিয়াছে, কে জানে? অনাবৃত শরীরকে, বায়ু, পত্র ও ফুল দিয়া ঢাকিল। তাহাতে জেলীর যন্ত্রণা আরো বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অল্প অল্প আঘাতেও ক্ষত স্থানে বিশেষ কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। বেলা চড়িতে লাগিল, তাহার সঙ্গে বায়ুও চড়িল। পাঠকের মন-তুষ্টার্থ, পবন, উপর হইতে ধূলি, বালি, তৃণ পত্র, আবর্জ্জনা উড়াইয়া জেলীর গায়ে ঢালিয়া জ্বালা বৃদ্ধি করিল। হতভাগিনী কষ্ট যন্ত্রণা পাইয়া, বিনোদের প্রতি আরো বিরক্ত হইল। বিনোদ তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। অনেক সময়ে এমনই হয়। তুমি যাহাকে প্রাণ মন সঁপে দিয়া ভালবাসিতেছ, সে হয়ত এমনই করিয়া তোমার জন্য কেবল গরল পুষিতেছে। পরদিন জেলীর সংবাদ লইতে বিনোদ লোক পাঠাইলেন। লোক আসিয়া সংবাদ বলিল, "মেম সাহেব, সেই রজনীতেই, দস্যুদের পশ্চাৎ-বর্ত্তিনী হইয়াছেন।" পাহাড়ের নিম্নে জেলীর অশ্ব বাঁধা রহিয়াছে, অনুসন্ধানে সে সংবাদও বিনোদ পাইলেন। এই দুটী সংবাদ পাইয়া বিনোদ বুঝি-

লেন, জেলী হয়ত দস্যুদিগের অনুসরণে পাহাড়ে উঠিতে চেষ্টা করিয়া, পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া মারা গিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া, বিনোদ পাহাড়ের গায়ে গায়ে অনুসন্ধান করিতে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু লোকেরা আর কোন সংবাদ আনিতে পারিল না। সংবাদ না পাইয়া বিনোদ একটু চিন্তান্বিত হইলেন বটে, কিন্তু কার্য্যের ভিড়ে ৪।৫ দিনের মধ্যে সে চিন্তা হৃদয় হইতে অবসর লইল; তিনি নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানে ব্রতী রহিলেন।

জেলী পাহাড়ের যে স্থানে উত্থানশক্তি রহিত ভাবে পড়িয়াছিলেন। তাহার নিকটেই কোন যোগীর একটী ক্ষুদ্র আশ্রম। লতাকুঞ্জে পরিবেষ্টিত একখানি ক্ষুদ্র গৃহ, তাহার পশ্চাতে একটী ক্ষীণ-প্রবাহিনী ঝরণা কুল কুল করিয়া বহিতেছে, চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষপরিশোভিত পাহাড় আকাশে উঠিয়াছে। এই প্রকার আশ্রম, পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। সংসার-গঞ্জনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, ধর্ম্মপিপাসু মহাত্মাগণ এমনি করিয়া, নির্জন স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মসাধন করেন। যোগী প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে যখন কুটীরের উন্মুক্ত বারাণ্ডায় বসিয়া পর্ব্বতের শোভা দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে, জেলীর অবসন্ন শরীর তাঁহার দৃষ্টি পথে পড়িল। যোগীগণ সাধরণত সংসার-বিরাগী—কোথায় কে কষ্ট পাইতেছে, কোথায় কাহার কি অভাব হইয়াছে, এসকল বিষয়ে সাধারণত তাঁহাদের মন আকৃষ্ট হয় না। সংসার-নিরপেক্ষ,—সুখ দুঃখ নিরপেক্ষ, ভোগবিলাস-বিরহিত যোগীদিগের এ সকল সামান্য বিষয়ে মন যায় না। ধ্যানই তাঁহাদের ব্রত, ধ্যানই ধর্ম্ম, ধ্যানই জ্ঞান, ধ্যানই মুক্তি-সোপান। পার্ব্বত্য-শোভা দেখিতে দেখিতে চক্ষু নিমীলিত হয়,—বাহ্যদৃষ্টি বিলুপ্ত হয়,—চিদাকাশে অনন্তস্বরূপের অনন্ত ভাব-লীলার বিকাশে মন নিমগ্ন হয়। বাহ্য দৃষ্টি, ভিতর দৃষ্টির পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। আজ আর তাহা হইল না;—বাহ্যদৃষ্টি যোগীকে টানিয়া বাহিরে লইয়া চলিল। কে যেন বলপূর্ব্বক মত বিরুদ্ধ পথে, যোগ ধ্যানে নিবিষ্ট হইবার সময়ে, যোগীকে লইয়া চলিল। যোগী, জেলীর সন্নিকট হইয়া বলিলেন, —"তুমি এরূপ অবস্থায় কোথা হইতে আসিয়া পড়িয়াছ?—তুমি কে?" জেলী ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিলেন না, অতি কষ্টে, অস্পষ্টভাষায় বলিলেন,—"পিপাসায় প্রাণ যায়, একটু জল দিন।" যোগী, ঝরণা হইতে জল আনিয়া জেলীর মুখে দিলেন। জেলী একটু সুস্থ হইলেন। যোগী যথাসাধ্য যত্ন

করিয়া জেলীর শুশ্রূষা করিলেন। জেলী একটু সুস্থ হইলে যোগীর আশ্রমে আশ্রয় পাইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধে—আহুতি।

কিছুদিন পরেই সাহেবদের দৌরাত্ম্য ভয়ানক রূপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রতিশোধ তুলিতে সাহেবেরা যেমন মজবুত, পৃথিবীতে আর কোন জাতিই তেমন নহে। মধুমক্ষিকার চাকে ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়া পথিকের নিরাপদে গমন করাও সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু উষ্ণরক্ত, বীর্য্যশালী সাহেবের শরীরে আঘাত করিয়া, নিরাপদ শান্তিতে গমন করা, কোন লোকেরই সাধ্যায়ত্ত নহে। এই জাতির একের শরীরের আঘাতে যেন, অপরের শরীরে আঘাত লাগে,—একের দুঃখে অপরের হৃদয় ব্যথিত হয়;—ভ্রাতায় ভ্রাতায় এমনই ঘনিষ্ট যোগ। সাহেব কুঠিয়ালদের প্রতি অসভ্য পাহাড়ীদের অত্যাচার-কাহিনী শ্রবণ করিয়া দূর দূরান্তরের সাহেবেরা মর্ম্ম-পীড়িত হইয়া, পঙ্গপালের ন্যায় আসিয়া পাহাড়কে বেষ্টন করিল। দর্পে চতুর্দ্দিক কম্পিত হইয়া উঠিল। প্রেমদাস বিনোদের ইচ্ছা ছিল না, কাহারও সহিত কোন প্রকার বিবাদে প্রবৃত্ত হন। বিশেষত, যে জাতির রক্ত অভিন্ন হৃদয় এণ্ডারসনের শরীরে প্রবাহিত, সে জাতির সহিত শত্রুতা করিতে, কৃতজ্ঞতা-বিহ্বল বিনোদের প্রাণ অগ্রসর হইল না। কিন্তু বিনোদ যত পশ্চাৎবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই সাহেবদের অহঙ্কারস্ফীত প্রাণ আরো উৎসাহিত হইতে লাগিল—ক্রমেই তাহাদের অত্যাচার ভীষণাকার ধারণ করিল। ইংরাজেরা প্রতিশোধ তুলিবার জন্য, বুদ্ধি বিবেচনা ভুলিল, এবং সকলের উপর, খ্রীষ্ট-প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিল। শেষে সাহেবদের অত্যাচার এত বৃদ্ধি হইল যে, ফেলাই সিংহ একেবারে অধীর হইয়া উঠিল। জিতনের ইচ্ছা ছিল, বিনোদকে লইয়া শান্তিতে থাকিবে; কিন্তু বিধাতার যেন সে ইচ্ছা হইল না। অবশেষে ইচ্ছায় ইচ্ছায় বিবাদ উপস্থিত হইল। প্রেমের রাজ্যে অপ্রেমের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। জিতনের সহিত বিনোদের একটু মতের অনৈক্য হইল। বিনোদ বলিলেন, অত্যাচার সহ্য করিব,—মানুষের

হৃদয় কত দূর নীচগামী হইতে পারে, দেখিব ;—অত্যাচারীকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিব। জিতন বলিল,—আমরা অত্যাচার করিব না,—পূর্ব্বে আমরা যে অত্যাচার করিয়াছি, তাহার জন্যও ক্ষমা চাহিব, কিন্তু যদি সাহেবেরা পুন অত্যাচার করে, তবে কখনই ক্ষমা করিব না,—তাহা হইলে তুমুল কাণ্ড বাধাইব। আরো বলিল—আমি বিশ্বাস করি, মানুষ বিশেষের মধ্যে এমন এক স্বর্গীয় জিনিস থাকিতে পারে, যাহার গুণে প্রেমের বাহু বিস্তার করিয়া, শত্রুর সম্মুখে বক্ষ পাতিয়া দিলে শত্রু আপনি মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু যাহার মধ্যে সে স্বর্গীয় অমূল্য পদার্থ নাই, সে কেমন করিয়া, প্রাণে হিংসা ক্রোধকে পোষণ করিয়া, হস্তকে গুটাইয়া রাখিবে? যাহার ভিতরে গরল রহিল, সে বাহিরে প্রহার না করিলেই কি তাঁহার পরিণাম সুখের হইবে? কখনই নহে। ভিতরে যদি হিংসা বা ক্রোধের উদয় না হইত, তবে অবশ্য স্বীকার করি, অত্যাচারীকে বক্ষ পাতিয়া আলিঙ্গন করিলে স্বর্গসুখ লাভ হইত। পৃথিবীর পাপবিষে জর্জ্জরিত হইলে—পৃথিবীর অত্যাচারে মুহ্যমান হইলেও, যাঁহার ভিতরে কোন প্রকার মলিনভাব—হিংসা বা ঘৃণা, ক্রোধ বা উদ্দীপনা উপস্থিত না হয়, তিনি মহৎ ব্যক্তি ;—সকলের পূজ্য। কিন্তু হায়, পৃথিবীতে সে প্রকার পূজ্য ব্যক্তি একটীও আছে কি না সন্দেহ। আপনার মনের ভিতরে, হৃদয়ের সেই নিগূঢ়তম প্রদেশে কি ভাব রহিয়াছে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। আমার বিনীত প্রার্থনা, আপনার ভিতরেও যাহা বাহিরেও তাহাই হউক। কিন্তু আমি হতভাগ্য নরাধম—আমার হৃদয়, অত্যাচার-পীড়িত দুঃখী দরিদ্রের চক্ষের জলে অস্থির হইতেছে। আমি জীবিত থাকিতে, আমার প্রাণতুল্য ভ্রাতাদের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, ইংরাজগণ রক্তপিপাসা নিবৃত্তি করিতেছে ;—আমার প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসার পাত্রী ভগ্নী সকলের সতীত্ব, পশুর ন্যায় দলে দলে অপহরণ করিয়া, হিংসা-প্রদীপ্ত কামরিপুকে পাষণ্ডেরা চরিতার্থ করিতেছে, ইহা আমি কেমনে সহিব?—দলের লোকেরা আর অত্যাচার সহ্য করিতে পারে না,—ফেলাই পারিতেছে না, আমিও পারিতেছিনা। ধর্ম্মই বা কোথায়, শান্তিই বা কোথায়?—অসহায় মেষপালকে একেবারে ধ্বংশ করিয়া ফেলিল,—মেষপালক, আপনি কি কেবল চাহিয়া দেখিবেন? আপনার একতার উপদেশ, প্রেমের উপদেশ সকলই কি ব্যর্থ হইতেছে না?

যাহাকে ভালবাসিয়াছেন, তাহার প্রাণ, আপনার সম্মুখে, অনায়াসে ম্লেচ্ছগণ লইতেছে, আর আপনি চাহিয়া দেখিতেছেন ?—এই কি একতা ও প্রেমের ধর্ম্ম ? হায়, দেবতা কি আপনার মধ্যে তেজ, বীর্য্য, ও পুরুষত্ব কিছুই প্রদান করেন নাই ? বলিতে বলিতে জিতনের চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতে লাগিল। বাক্‌রোধ হইল। জিতন নীরব হইল।

বিনোদ গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া জিতনের জ্বলন্ত উপদেশ শুনিলেন। জিতনের প্রত্যেক উচ্ছাস তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে বিদ্ধ হইল। উর্দ্ধদিকে স্থির নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন, সূর্য্য প্রখর মূর্ত্তিতে কটাক্ষপাত করিতেছে। প্রাণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—অত্যাচারীর প্রতি অত্যাচার করাই কি বিবেকানুমোদিত কার্য্য ?—আত্মরক্ষার জন্য মানুষ কি চেষ্টা করিতে অধিকারী নয় ? যখন আত্মরক্ষার আর কোন উপায় থাকে না, তখনও কি অস্ত্রাঘাত অবৈধ ?—আত্মরক্ষার জন্য কোন অবস্থায় যদি অস্ত্রাঘাত বৈধ হয়, তবে আত্মতুল্য ভ্রাতা ভগ্নীর জন্য কি অস্ত্রাঘাত বৈধ নয় ?—আমার ভ্রাতা—আর আমি, ইহাতে কি বিভিন্নতা ?—যেখানে পৃথকত্ব আছে, সেখানে আত্মীয়তা—একতা—মিলন নাই। আমি আর জিতন,—একই হৃদয়, একই প্রাণ, একই জীবন। দুটী নদী এক হইয়া গিয়াছে। জিতনের জন্য, আমি আমার প্রাণ দিতে পারি ; আমার জন্য জিতন প্রাণ দিতে পারে। সেই জিতনের দল, অত্যাচারে, উৎপীড়নে ভাসিয়া যায় ! জিতন সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণ ভাসাইতে চায়, আমার কি নীরবে থাকা বিধেয় ? গম্ভীরভাবে, স্থির চিত্তে, বিনোদ এই প্রশ্ন বিবেকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। বিহ্বল-চিত্তে, গম্ভীর ভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া, ইষ্টদেবতার নিকট এই কূট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্ম্ম ভিন্ন সংসার নাই—ধর্ম্ম ভিন্ন সংসারের কল্যাণ নাই ; বিনোদ ইহা বিশ্বাস করিতেন। সংসারের কল্যাণের জন্য যদি যুদ্ধের প্রয়োজন হয়, তাহাও অবশ্য ধর্ম্মানুমোদিত হইবে, এই বিশ্বাসে বিনোদ ইষ্টদেবতাকে, এই সঙ্কটের সময়ে, এই গভীর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। মুহূর্ত্ত পরে বিনোদ স্থির হইয়া দেখিলেন, সমস্ত পাহাড়ীরা সুসজ্জিত হইয়া নিকটে দণ্ডায়মান, ফেলাই সিংহ অশ্বপৃষ্ঠে নিষ্কোষিত অসি হস্তে উপবিষ্ট। বিনোদের এ চিত্র দেখিয়া ভয় ভাবনা তিরোহিত হইল। পতঙ্গ সংসার জ্বালা ঘুচাইতে অগ্নিতে পুড়িয়া মরিবে, ইহাই যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয়, তবে

আমরাও পাপ অত্যাচার ঘুচাইতে যুদ্ধাগ্নিতে দেহ বিসর্জ্জন দিব, ইহাও তাঁহারই ইচ্ছা; নিমেষের মধ্যে বিনোদের মনে এই সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইল। এ সিদ্ধান্ত ভাল কি মন্দ হইল, পৃথিবীর সমালোচনার ভয়ে বিনোদ তাহা চিন্তা করিলেন না। তিনি নিরপেক্ষ ভাবে তখনই যুদ্ধ-যাত্রা করিতে অনুমতি দিলেন, এবং আপনি অধিনায়ক রূপে জিতনের সহিত অশ্ব পৃষ্ঠে চলিলেন। ভাই পাঠক, বল তো বিনোদ ধর্ম্মের উচ্চ সোপান হইতে অবতরণ করিলেন কি না?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিনোদ—বন্দী।

বিনোদের অনুমতি পাইয়া, উৎসাহ-প্রদীপ্ত, অত্যাচার-পীড়িত ফেলাই সিংহের সমস্ত সৈন্য নিমেষের মধ্যে ইংরাজ-সেনানীগণের সহিত সমরক্ষেত্রে মাতিতে চলিল। লোকে বলে, এই প্রকার সময়ে লোকের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তুমি আমার প্রতি অপ্রতিহত প্রভাবে অত্যাচার করিবে, আর আমি নিরাপত্তিতে নির্ব্বাক হইয়া তোমার সে অত্যাচার সহ্য করিব, পৃথিবীর প্রচলিত কাহিনীতে এ প্রকার দৃষ্টান্ত অতি বিরল, "অন্যকে উপদেশ দিতে পারি, কিন্তু আমি কখনই ইহা সহিতে পারি না;" পৃথিবীর নরনারী অবিরত ইহাই জ্বলন্ত ভাষায় প্রচার করিতেছে। হিংসায় হিংসা, প্রহারে প্রহার, শঠতায় শঠতা, ধর্ম্মানুমোদিত কি না, সে বিচার অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকে। 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া যখন অহঙ্কারস্ফীত মানুষ, মানুষকে সমরে আহ্বান করে, তখন উত্তরে "শান্তি-ক্রোড় দিব" ইহা অতি অল্প লোকেই বলিতে পারে। ফেলাই সিংহের দল অশিক্ষিত,—নীতিহীন, চরিত্রহীন;—তাহাদের নিকট কখনই ঐ উচ্চ নীতি আশা করা যায় না। তাহাদের কথা দূরে থাকুক, ধর্ম্ম-পিপাসু, শান্তি-ভিক্ষুক বিনোদও ঐ উচ্চ-নীতি অবলম্বন করিতে পারিলেন না। জিতনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল;—বিনোদ সাহেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। হিতাহিত জ্ঞান রহিল না—বিনোদ প্রজ্জ্বলিত মহা যজ্ঞে অগণ্য লোকাহুতি দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পৃথিবী আজ যে শক্তির নিকট অবনতমস্তক, সেই শক্তি বিনোদের

বা জিতনের, সুতরাং ভারতের শত্রু। হৃদয়ে কতই সাহস, মনে কতই বীর্য্য, বাহুতে কতই বল, মাথায় কতই বুদ্ধি, কতই জ্ঞান—এই ইংরাজদের। যাহা মনে করে, নিমেষের মধ্যে তাহাই কার্য্যে পরিণত করে। বাহিরের বীরত্ব, ভিতরের অধ্যবসায় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত মিশ্রিত ;—জ্ঞানে কর্ম্মে ঘনীভূত মিলন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইংরাজের বন্দুকের আওয়াজে দিক্‌পূর্ণ হইয়া পড়িল,—কামানের গর্জ্জন-বাষ্পে দিক্ আঁধারময় হইয়া পড়িল। তীর ধনুক লইয়া পাহাড়ীরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, বলিলে ঠিক বলা হয় না, তাহারা বহু ক্লেশ-সঞ্চিত জীবন-রত্নকে বিস্মৃতি-সাগরে বিসর্জ্জন দিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে ফেলাই সিংহের দলের অর্দ্ধেক লোক নিহত হইল। মহা বৈরাগ্যের মহা শিক্ষা এই ভাবে প্রদত্ত হইতে লাগিল। এক এক করিয়া দলের কত কত রত্নকে, কত ভারতসন্তানকে,—কত প্রাণ-তুল্য ভ্রাতাকে বিনোদ জীবন বিসর্জ্জন দিতে দেখিলেন। রক্তের স্রোতে ধরা প্লাবিত হইল, মৃতদেহে ময়দান পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল। কত কালের কত চেষ্টা ও কত সাধনার ফল—মানব শরীর, আজ মাটীতে পড়িয়া মহা বৈরাগ্য-উপদেশ দিতে লাগিল। একটী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখা গেল, পাহাড়ীদিগের মধ্যে কেহই পশ্চাতে হটিল না, দলে দলে সকলেই তীর ধনুক লইয়া ইংরাজের সম্মুখীন হইতে লাগিল, আর অমনি অলক্ষিত, অব্যর্থ বন্দুকের সন্ধানের সম্মুখে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে লাগিল। জিতন বিনোদকে যুদ্ধে যোগ দিতে দিল না, আপনিও কতক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে দাড়াইয়া সকল দেখিল, পরে যখন দলের লোক প্রায় শূন্য হইয়া আসিল, তখন অশ্বকে ইঙ্গিত করিল। ইঙ্গিত মাত্র শিক্ষিত অশ্ব রণস্থলাভিমুখে ধাবিত হইল। বিনোদের প্রাণ এই সময়ে একেবারে অস্থির হইল, আর নীরব ভাবে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল ; তিনিও তখনি অশ্বকে ইঙ্গিত করিলেন। সুতরাং বিনোদের অশ্বও পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুত চলিল। বিনোদের অশ্ব দ্রুতগামী, সুতরাং জিতনের অশ্ব অধিক দূর না যাইতে যাইতেই ধৃত হইল। বিনোদ শ্বাস-ভাঙ্গা ক্লান্তস্বরে বলিলেন,—"জিতন, কোথায় চলিয়াছ ? ফের, পরিণাম ভাল হইবে না।" জিতন বলিল,—"বৈরাগ্য কথার কথা নহে,—আজ এ প্রেমের মমতা ছিড়িয়াই এ যুদ্ধে আসিয়াছি। অধীনতাই যাহাদের পরিণাম, তাহাদের জীবনের আবার মমতা কি ? অধীনতার জ্বালায় দগ্ধ করিতে আমি আজ আর প্রাণের ভাইদিগকে ফিরাইব না,—কারণ জানিয়াছি, মৃত্যুই আমাদের এক

মাত্র উপায়। যে পথে ভ্রাতাদিগকে যাইতে উৎসাহিত করিয়াছি, সে পথে আপনি যাইতে কুণ্ঠিত হইব?--কৃতঘ্ন কাপুরুষের ন্যায় কার্য্য করিব? কিসের মমতায় ফিরিব? আমি আজ আর ফিরিব না।" বিনোদ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ জিতনকে বিলক্ষণ জানিতেন, এই অল্প কথাতেই জিতনের মনের ভাব বুঝিলেন। বুঝিলেন, জিতন আজ আর ফিরিবে না; তবুও কয়েকটী কথা বলিতে ইচ্ছা হইল; বলিলেন, "ভাই জিতন, ইচ্ছাকৃত মৃত্যু ধর্ম্মানুমোদিত নহে, ভাই ফের। ঈশ্বর যে জীবন দিয়াছেন, ইহা দ্বারা দেশের অনেক কাজ করিবার আছে। স্বাধীনতা মনে,বাহিরে নহে। বাহিরে আমরা শরীরের অধীন, জড় সৃষ্টির অধীন, চন্দ্র সূর্য্যের অধীন, জল বায়ুর অধীন, স্ত্রী পরিবারের অধীন, সমাজের অধীন, রাজার অধীন। এই অধীনতার মধ্যে প্রতিপালিত হইতেই হইবে,—ইহা ভিন্ন আমাদের মানুষ হইবার আর উপায় নাই; কিন্তু ভিতরে যে স্বাধীনতা রত্নকে রাখিতে পারিতেছে—পাপ অধর্ম্ম হইতে উদ্ধার হইবার জন্য আত্মার যে স্বাভাবিক শক্তি স্বাধীনতা, তাহাকে যে হৃদয়ের গুপ্ত স্থানে পোষণ করিতে পারিতেছে,—সে বহুজনার অধীন হইয়াও স্বাধীন। ভাই ফের, অধীনতায় নরক আছে, স্বর্গও আছে, কিন্তু সে কথা বলিবার এখন সময় নাই। ফের, পরে সকল বলিব।"

জিতন পুন গম্ভীর ভাবে বলিল,—"যে সত্য বহু কাল হইতে এ পর্য্যন্ত বুঝি নাই, তাহা এই শেষ সময়ে যে বুঝিতে পারিব, সে সম্ভাবনা নাই। আমি বুঝিয়াছি, অধীনতা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়াই বাঁচা, অধীনতারবিষে জর্জ্জরিত হইয়া জীবন ধারণ করাই মরা। যাহা মন্দ, তাহা সব সময়ে মন্দ। যাহা বিষ, তাহা সকল সময়েই বিষ, কখনও সুধা হইতে পারে না। দাসত্ব স্বীকারে ভারতের সর্ব্বনাশ ঘটিবে—কখনই মঙ্গল হইবে না। স্বদেশের দুর্গতি দেখিতে বাঁচিয়া থাকিয়া কি করিব? দেব, আপনি ফিরুন, জিতন স্বদেশের দুর্গতি দেখিতে আর ফিরিবে না; আমাদিগকে বিদায় দিয়া বৈরাগ্য ধর্ম্মে আপনি দীক্ষিত হউন।"

বিনোদ পুন বলিলেন,—বিষই এক সময়ে সুধা হয়;—বিষেরও উপকারিতা আছে, ঈশ্বরের রাজ্যে কিছুই বিনা প্রয়োজনে সৃষ্ট হয় নাই। সময় বিশেষে সুধাই বিষ হয়, বিষ সুধা হয়। সে কথা এত অল্প সময়ে বুঝাইতে পারিব না;—ভাই ফের। যদি একান্তই না ফিরিবে, তবে আমিও তোমার সহিত যাইব।

জিতন বলিল ;—পৃথিবীতে আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে ;—স্বাধীনতা প্রচার করা আমার কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল, তাহা একরকম পালন করিয়াছি ; দ্বিতীয় কার্য্য ছিল,—আপনাকে প্রকৃত বৈরাগ্য-ধর্ম্মের উপযুক্ত করা, আজ এই সুসময়ে আমার জীবনকে ভাসাইয়া আপনাকে বৈরাগী সাজাইব,—আপনার সকল আসক্তি নিবাইব। আমি কখনই ফিরিব না। এই বলিয়া সহসা জিতন তরবারি উত্তোলন করিল, এবং উন্মত্তের ন্যায় ক্রোধে বলিল,—শীঘ্র পলায়ন কর, আমার সহিত আসিবে ত ইহার আঘাতে তোমার প্রাণ লইব, এবং পরে আত্মহত্যা করিয়া আপনি মরিব।

এই কথা শুনিয়া বিনোদ চমকিত হইলেন, বলিলেন, জিতন, তুমি কি পাগল হয়েছ? আমি বৈরাগ্যের অনুপযুক্ত পাত্র; তাহা আমি বুঝিয়াছি, সুতরাং তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য আজও ত সমাধা হয় নাই। আমার হৃদয়ের ভিতরে আজও আসক্তির আগুন জ্বলিতেছে ;—আমি বৈরাগ্যের নিতান্ত অনুপযুক্ত ; সুতরাং তোমার তরবারিরই উপযুক্ত। আমি মরিলেই তোমার কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হইবে, সুতরাং আমি তোমার অসির আঘাতেই মরিব। এই বলিয়া বিনোদ জিতনের অসির নিম্নে মস্তক পাতিয়া দিলেন, এবং বলিলেন,—"ভাই, আঘাত কর ;—তোমার আঘাতে আমার শরীর পবিত্র হউক। সকল যন্ত্রণা নির্ব্বান হউক।"

এই সকল কথাবার্ত্তা হইতে যে সময় অতিবাহিত হইল, তাহারই মধ্যে প্রায় সমস্ত পাহাড়ী সৈন্য হত হইল। শেষ কথা বলা হইতে না হইতে, জিতন দেখিল, ফেলাই সিংহ বন্দী হইয়াছে। দলের একটী লোকও অধীনতায় আবদ্ধ থাকিবে, ইহা জিতনের প্রাণের অসহ্য। জিতন শান্ত-ভাবে পুন বলিল, আজ আমার মরা হইল না,—ফেলাই বন্দী হইয়াছে, তাহাকে দাসত্বশৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়া আমি মরিব না ; সুতরাং আপনার কথাই পূর্ণ হইল ; কিন্তু এখন বন্দী হওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। আমি বন্দী হইব, আপনি পলায়ন করুন।

বিনোদ বলিলেন, আমি বলিয়াছি, আমি বৈরাগ্যের অনুপযুক্ত, আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া কখনই যাইব না।

এই কথা বলা হইতে না হইতে উভয়ে বন্দী হইলেন।

যুদ্ধ শেষ হইল—আগুন নিবিল। রক্ত-প্লাবিত মৃতদেহ-পূর্ণ রণক্ষেত্রের মধ্য দিয়া জিতন্, ফেলাই ও বিনোদকে বন্দী করিয়া, ইংরাজেরা দর্পে ধরা কাঁপা-

ইয়া লইয়া চলিল। সে যে কি দুঃখের চিত্র, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সে দৃশ্য দেখিয়া জিতনের হৃদয় অস্থির হইল—এক মুহূর্ত্ত আর জীবন ধারণে ইচ্ছা হইল না। মনে হইল,"সকল পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছি? হৃদ্‌পিণ্ড শ্মশানে ছিড়িয়া কি সুখের কামনায় বন্দী হইয়া গৃহে ফিরিব?—এ শরীরের রক্ত ভ্রাতাদের সহিত মিশাইব। এ শরীর ঐ সকল মৃত ভ্রাতাদের পার্শ্বে রাখিব;—আর কি কামনা মানুষের হইতে পারে? আমার পরামর্শে সকলে প্রাণ দিল,আর আমি ফিরিব?— তা কখনই হইবে না?"এই সকল কথা মনে উঠিল। জিতন্ আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না, ফেলাইকে ইঙ্গিত করিয়া গুপ্ত অস্ত্র বাহির করিয়া আপন বক্ষ বিদীর্ণ করিল। দেখিতে দেখিতে জিতন্ ধরাশায়ী হইয়া পড়িল। জিতনের প্রতি যখন সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, তখন নিমেষের মধ্যে ফেলাইসিংহও আত্মহত্যা করিল। উভয় বন্ধু একত্রে মিলিয়া অমরধামে চলিল। নিমেষের মধ্যে এই সকল ঘটনা ঘটিল। অধীনতার পূজা করিতে,—বিচ্ছেদের মর্ম্মদাহে দগ্ধ হইতে,—ইংরাজ-পীড়ন সহ্য করিতে, সেই ভীষণ সমরের অবশিষ্ট রহিলেন কেবল বিনোদ। বিনোদ, ভয়ে, দুঃখে এবং যন্ত্রণায় একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। অধীনতার গরল যেন প্রতি লোমকূপ দিয়া, ইংরাজের বৃথা অহঙ্কার-মূলক ঠাট্টা বিদ্রূপের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল। জীবিত থাকিয়াও, বিনোদ, একাকী, মৃতের ন্যায় বন্দীভাবে চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শোক-বিজয়ী বৈরাগী।

বন্দী অবস্থায় শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস যখন নির্ব্বাপিত হইল, তখন বিনোদ আপন ত্রুটী উত্তমরূপে বুঝিলেন। আর বুঝিলেন,—জিতনের জীবনের লক্ষ্য অতি উচ্চ, অতি মহৎ। শোক-পীড়িত অশ্রু বিনোদের চক্ষে শুষ্ক হইতে না হইতে প্রশ্ন উপস্থিত হইল;—আপনাকে আপনি বলিতে লাগিলেন,'স্বাধীনতা-লালায়িত জীবের পরিণাম কি মৃত্যু? বলিলেন,—জ্ঞান প্রেমহীন স্বাধীনতা-তৃষ্ণা কি স্বেচ্ছাচার? জিতন যদি বুঝিতে পারিত,—এই যুদ্ধের পরিণামএইরূপ হইবে,তবে কি সে এ পথে আসিয়া জীবনমমতা ছিন্ন করিতে পারিত? পতঙ্গ

ইচ্ছা পূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন দিতে উল্লসিত হয় কেন? জিতন মৃত্যু-সময়ে বলিল,—তাহার জীবনের উদ্দেশ্য স্বাধীনতা প্রচার করা; এবং আমাকে বৈরাগ্য শিক্ষা দেওয়া। তাহার স্বাধীনতার সাধ মিটিয়াছে,—শরীর-বিচ্যুত আত্মা অমরধামে যাইয়া শান্তি পাইয়াছে, কিন্তু আমার বৈরাগ্য-শিক্ষা কোথায় হইল? এ শরীরের শিরায় শিরায় আসক্তি-গরল প্রবাহিত, মানুষে তাহা কি জানিবে? জিতনের শোক এত চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারিতেছি না—ইংরাজ অত্যাচার ভুলিতে পারিতেছি না। জীবনতুল্য বন্ধু এণ্ডারসনের আত্মীয়দিগের প্রতি আমার এতই বিদ্বেষ হইতেছে! চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারিতেছি না! আর সকলই কি ভুলিতে পারিতেছি?—প্রাণতুল্য এণ্ডারসন আমার সুখের জন্যই পরিবারের সুখকে বিসর্জ্জন দিয়াছে, সেই এণ্ডারসনকে কি ভুলিতে পারিতেছি? ভুলিতে পারাই কি মহত্ত্ব? কিছুই বুঝি না। হায়, কিছুই ত ভুলিতে পারিলাম না! এতদিন সংসার হইতে অবসর লইয়া কেবলই আসক্তির পূজা করিলাম। নির্জ্জনে, সজনে, নগরে প্রান্তরে, ভিতরে বাহিরে কেবল আসক্তির পূজাই করিলাম! মনের বাসনা যাহার গেল না, অরণ্য তাহার কি করিবে? আমি বৈরাগ্য-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত! শরীর যতদিন আছে, ততদিন যে আসক্তি ও মায়া মোহের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব, সে সম্ভাবনাও দেখি না। কোন্ শিক্ষায় আমার এদশা ঘটিল? কোন্ পাপে সংসার-বিরাগী, শ্মশানবাসী মহাদেবের উপাসকের এই দুর্দ্দশা ঘটিল? হর কোথায়? প্রেম-বিভূতি কোথায়? তত্ত্ব-জটা কোথায়?—বিবেক-ভূজঙ্গ কোথায়? কিছুই আমার ভাগ্যে ঘটিল না! পাশ্চাত্য জ্ঞানের ফলে কি এই সকল বিদূরিত হইল? মহাদেব! কোথায় তুমি? তোমার আধ জ্ঞান আধ প্রেম; আধ ভক্তি, আধ কর্ম্ম; আধ আসক্তি, আধ বৈরাগ্য; কোথায় এসকল স্বর্গীয় ভাব? এস, দেব, এক গণ্ডে আঁধার লেপিয়া, বৈরাগ্য আঁকিয়া, আর গণ্ডে আসক্তি বা প্রেমজ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া, এস, ভক্তের কাছে আজ একবার এস প্রভু। তোমার স্বর্গ-মর্ত্ত্যদর্শী ঐ ঢুলু ঢুলু নয়ন আমি একবার দেখিব! তোমার ঐ জগন্মোহন রূপ আমি একবার নয়ন ভরিয়া দেখিব। সতী-কলঙ্ক স্কন্ধে করিয়া, প্রেম-বিরাগী ক্ষেপা-ভোলা, আজ শোক-সন্তপ্ত ভক্তের নিকটে একবার এস।” এমনি করিয়া দুঃখী বিনোদ পাগলের মত দিন রাত্রি বিড় বিড় করিয়া কত কি বকিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দিবস যাইতে না যাইতে

বিনোদের পূর্ব্বের আকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ ধরিল। গভীর শোক, গভীর চিন্তার পথ পরিষ্কার করিল। গভীর চিন্তা ক্ষীণ মস্তিষ্ককে মাতাইয়া তুলিল। দিবসে আহার নাই, রাত্রে চক্ষে নিদ্রা নাই,—দিন রাত্রি বিড় বিড় করিয়া কত কি বকিতে লাগিলেন। ইংরাজেরা সে ভাবের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিল না;—এসকল গভীর তত্ত্বের মর্ম্মভেদ করিতে পারিল না। বিনোদের উপর স্বার্থান্বেষী ইংরাজদের অনেক আশা ছিল। আশা ছিল, বিনোদকে হাতে পাইয়া অনেক কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইবে। কিন্তু সে আশায় কালি পড়িল। বিনোদ ঠিক উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। অজ্ঞাতসারে যেন বিনোদের প্রার্থনা মহাদেব পূর্ণ করিলেন। মাথায় তৈল নাই, উদরে অন্ন নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই, পরিধানে ছিন্নমলিন বস্ত্র—সর্ব্ব শরীর মৃত্তিকায় সুশোভিত,—কাহারও সহিত কথা বলা নাই—কিছুই যেন অভাব নাই। বিনোদের সদানন্দ ভাব দেখিয়া, সদানন্দময়রূপ দেখিয়া, সাহেবেরা শেষে ঠিক করিল, বিনোদ উন্মত্ত হইয়াছেন। উন্মাদকে সাধারণ কয়েদখানায় বদ্ধ করিয়া রাখিয়া কি হইবে? অনেক ইংরাজের মনে এই চিন্তা উঠিল। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিল—বড় বড় লোকেরা বিচার করিল,—পরে যখন স্থিরসিদ্ধান্ত হইল, বিনোদ উন্মত্ত হইয়াছেন, তখন এক নির্জ্জন পাহাড়ে একখানি কুড়ে ঘরে বিনোদকে বন্দীর অবস্থাতেই রাখা হইল। এদিকে দেশ দেশান্তরে অল্পসময়ের মধ্যে যুদ্ধ-জয়ের সংবাদ প্রচার হইয়া পড়িল। সংবাদ পত্রের কলেবরে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষর শোভা পাইল। বিলাতে আনন্দের বার্ত্তা প্রেরিত হইল। অসভ্য জাতিদের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া, ইংরাজদের বুকের ছাতি দশগুণ ফুলিয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে অত্যাচার আরো বাড়িতে লাগিল। কুঠিয়ালদের দৌরাত্ম্য ভীষণ আকার ধারণ করিল। চারিদিকে নিষ্কণ্টক হইয়া চা-করেরা সেই হইতে একাধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল. সে অত্যাচার আজও অপ্রতিহত প্রভাবে চলিতেছে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যোগীর সংস্পর্শে—জেলী।

জ্বলন্ত অনলের সংস্পর্শে লৌহের পূর্ব্ব রূপ যেমন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়;—গাঢ় কালিমা ঘনীভূত রক্তিমায় পরিণত হয়; তেমনি যোগ-ধর্ম্ম-পিপাসু

জ্বলন্ত-চরিত্র-আগুনের তাপে লৌহ-সদৃশ কঠোর জেলীর হৃদয়টা পুড়িয়া পুড়িয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধরিল। আগুনে লৌহ যতক্ষণ, ততক্ষণ আর পূর্ব্বরূপ বা পূর্ব্ব ধর্ম্ম থাকেনা। জেলীরও তাহাই হইল। বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক ভাব দেখিয়া জেলী বিমুগ্ধ হইল। ভগবানের নাম করিতে করিতে যোগীর শরীর রোমাঞ্চিত হয়, দুনয়ন বহিয়া অশ্রু ধারাবাহী হইয়া পড়িতে থাকে,—কি সুন্দর দৃশ্য! ক্ষুদ্র আশ্রমে থাকিয়া যোগীর সংস্পর্শে জেলীর জীবনে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। যোগীর আচার ব্যবহার সকলই মধুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যোগীর হৃদয়ে দ্বেষ বা হিংসা, ঘৃণা বা বিদ্বেষের রেখাও ছিল না। ভগবান সর্ব্বভূতে। সকলই ভগবানের লীলা—সকল বস্তুতেই ভগবান প্রত্যক্ষ বিদ্যমান আছেন,যোগীর এই বিশ্বাস। আপন কে,পর কে,রাখ্য কে, পরিত্যজ্য কে?—হিন্দু কে, মুসলমান কে?—জাতি কি, কুল কি? তাঁহার নিকট এসকলের কিছুই ভেদাভেদ ছিল না। সে উদার বিশ্বপ্রেমে কোন প্রকার সঙ্কীর্ণ জাতিভেদের অঙ্কুর ছিল না। ভগবানের সৃষ্টির সকলই ভাল, কাহাকেও ঘৃণা করিবার যো নাই! যোগী জেলীকে আপন কন্যার ন্যায় স্নেহ করিলেন, আপন মাতার ন্যায় ভক্তির চক্ষে দেখিলেন। অথবা মাতাই বা কি, কন্যাই কি?—ভগবানের জীবন্ত অবতার বলিয়া জেলীকে প্রাণে ধরিলেন। কোন উপদেশ দিলেন না, কোন পরামর্শ দিলেন না, তথাচ জেলীর জীবন সে আগুন-সংস্পর্শে রূপান্তরিত হইল। আপন হৃদয় হইতেও আপন যিনি, সেই ভগবানের প্রত্যক্ষ জ্বলন্ত চিত্র যে ব্যক্তি নরনারীর প্রাণে দেখিতে পায়, তাঁহার হৃদয়ে আবার ঘৃণা বিদ্বেষ কি থাকিবে?—জেলী হইল যেন উপদেষ্টা, যোগী হইলেন যেন উপদিষ্ট। যাহা কিছু নিকটে, যাহা কিছু দূরে, সকলের মধ্যেই ভগবান প্রত্যক্ষ থাকিয়া মানুষকে শিক্ষা দিতেছেন,—বালককে যুবক করিতেছেন, যুবককে বৃদ্ধের জ্ঞানে সুশোভিত করিতেছেন; এই বিশ্বাস যাঁহার প্রাণের মূলে,তিনি আর অন্যকে কি উপদেশ দিবেন? তাঁহার ভাষা বা কথার সমস্ত দ্বার বন্ধ। বাহির হইতে উপদেশ কেবলই প্রতি লোমকূপ দিয়া তাঁহার শরীরে ঢুকিতেছে! জেলী যোগীর নিকট দেবী বিশেষ,—শিক্ষাগুরু। যোগী সেখানে মহা শিক্ষা পাইলেন। আর জেলীর কি হইল?—যোগীর মুখে উপদেশ শুনিলেন না বটে,কিন্তু যোগীর ভিতরে যে চিদ্‌ঘনআনন্দরাশি লুক্কায়িত ছিল,—যে সকল মহাসত্য উপার্জ্জিত হইয়া হৃদয়ে সঞ্চিত ছিল,সে সকল যেন শরীরের চর্ম্ম ভেদ করিয়া, প্রতি লোমকূপ দিয়া বাহির হইয়া জেলীকে

আক্রমণ করিল। সে জ্বলন্ত জীবনময় আগুনে জেলী পুড়িয়া ভস্ম হইলেন! পূর্ব্বের বেশ, পূর্ব্বের ভূষণ, পূর্ব্বের শরীর, পূর্ব্বের হৃদয় পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া গেল। সমস্ত অপবিত্রতা যখন পরিষ্কার হইল, তখন জেলীর উজ্জ্বল রূপ বাহির হইল। জেলীর চক্ষে ভাসিতেছে—বিনয়, মুখে ভাসিতেছে—ভক্তি;—সর্ব্ব শরীরে শোভিতেছে—বৈরাগ্য-গৈরিক;—হৃদয়ে জ্বলিতেছে—বিশ্বপ্রেম। অতি আশ্চর্য্য, অতি সুন্দর, অতি মনোহর আদান প্রদান হইয়া গেল। এ পৃথিবীতে বুঝিয়া শুনিয়া যে দান করে, সে ত অহঙ্কারী; কর্ত্তব্যের অনুরোধে যে দান করে,সে ত আত্মাভিমানী। সঞ্চয় করাই যোগীদের কার্য্য—আপনাকে ভোলাই মহৎ ব্রত। দান?—সেত আপনা আপনিই হইবে। সেখানে ইচ্ছা বা চেষ্টা কিছুই থাকিবে না। যেমন এক দ্বার দিয়া ঘরে আসিতেছে, অমনি আর দশটী গুপ্তদ্বার দিয়া তাহা বাহির হইয়া যাইতেছে! তাহার আবার গণনা কি! ব্যয়ের আবার হিসাব কি? ভবের হাটে আসিয়া যে প্রকৃত কোন সত্য-ধন পাইয়াছে, সেই দাতা হইতেছে;—কিন্তু সে তাহা জানেও না। যে মনে করে, আমি উপদেশ দেই, আমি শিক্ষা দেই, আমি অপরকে সাহায্য করি, সে ঘোরতর অহঙ্কারী। পাই আমি, দেন ভগবান। যেখানে জমা হইয়াছে, সেই খানেই খরচের হাট তিনি বসাইয়া দিতেছেন। জমার হিসাব সাধকেরা রাখেন বটে, কিন্তু খরচের হিসাব সেখানে নাই। সেখানে ঘোরতর স্বার্থপরতা বিদ্যমান। আমি কেবল উপার্জ্জনশীল হইব, আমি কেবল আপনাকে তুলিতে চেষ্টা করিব, আর কিছুই জানি না। আমার ভিতরে যাহা অন্যকে দিবার আছে, তাহা আপনি বাহির হইয়া যাইবে, মানুষের তাহা তালা চাবি দিয়া বন্ধ রাখিবার শক্তি নাই। যোগীদের নিকট দান-তালিকার খাতা নাই;—জমার খাতা সকলেরই আছে। প্রচার-তত্ত্ব তাঁহারা জানেন না, সংসারের মঙ্গলামঙ্গল তাঁহারা গণনা করেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস, যাঁহার রাজ্য তিনিই সংসারের মঙ্গল করিবেন। তাঁহারা কেবল প্রেমানন্দ রসে সদাই নিমগ্ন থাকিয়া, বিশ্বের অন্তরালে লুক্কায়িত যে চিদ্‌ঘনআনন্দ বিদ্যমান, তাহাই উপার্জ্জনে যত্ন করেন। আপন পর, সকল তাহাদের নিকট সমান। একরূপ বিশ্বময়, এক চিত্র ব্রহ্মাণ্ড-ময়—একই ভাব জগৎময়। আমি তুমি, সকলই তাঁহাতে মগ্ন। একই শক্তিতে জগৎ চিরনিমজ্জিত। এই প্রকার জ্বলন্ত বিশ্বাস যে সাধুর,

যে ভক্ত যোগীর,তাঁহার নিকটে থাকিয়া যে মনুষ্য-হৃদয়ধারিণী জেলীর জীবন পরিবর্ত্তিত হইবে, আশ্চর্য্য কি? জেলী নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করিলেন, মালা জপিতে সুরু করিলেন। হিন্দু ধর্ম্মের যে স্থানে জাতিভেদ নাই, সেই পবিত্র স্থানে ম্লেচ্ছ জেলী আশ্রয় পাইয়া হিন্দুধর্ম্মের সাধনায় রত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চিত্রান্তর।

লোকনাথপুরে আনন্দের উৎসব। গোরাচাঁদ যখন পুলিসের হস্তে পড়িল, তখন করালী এবং এণ্ডারসনের হৃদয় উৎকণ্ঠা-বর্জ্জিত হইল। তাঁহারা যখন লোকনাথপুরে শুভ সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন রাণী কৃপাময়ীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। সকলের মনেই আনন্দ, সকলের মুখই প্রফুল্ল। আনন্দের বাজার চারিদিকে বসিয়া গিয়াছে। কত দুশ্চিন্তার পরে, কত বিপদের পরে, কত দুঃখের পরে হতভাগিনী সুলোচনাকে নিরাপদ স্থানে তুলিয়াছেন! সোণার প্রতিমাকে কত কষ্টে আশ্রয়ে আনিয়াছেন! কুলকামিনীর হৃদয়ের আনন্দ কে বুঝিবে? রাণী কৃপাময়ী বা শান্তিময়ীর আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শান্তিময়ী কৃপার অবতার,—কল্পতরু। জীবনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে প্রকারেই হউক স্বামীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। হিন্দুরমণীর মহত্ত্ব দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। স্ত্রীর দোষে স্বামী দেশান্তরিত হইয়াছেন, শান্তিময়ী তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছেন। কমলে কণ্টক, চাঁদে কলঙ্ক,—তিনি রাখিবেন না। যে রমণীর দোষে স্বামী দেশান্তরিত হয়, সে রমণীর হৃদয় গরলময়; কোন্ হিন্দুরমণী তাহা বুঝিয়া জীবনে সুখ পাইতে পারে? স্বার্থ-ত্যাগ, সর্ব্বস্ব-ত্যাগ হিন্দুরমণীর পাতিব্রত্যের একমাত্র পণ। শান্তিময়ী যখন ইহা বুঝিলেন্, তখন হৃদয়ের গুপ্ত স্থানে একটী শিশু-প্রতিজ্ঞাকে রোপণ করিলেন। সেই প্রতিজ্ঞা এতদিনে সুফল-প্রসূ হইয়াছে! স্বামীর হৃদয়ের সুখের জন্য যে হিন্দুরমণী আত্মবিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প, আজ তাঁহার আনন্দ কে দেখিবে?—কে বুঝিবে? গৃহে তুলিয়া সে সোণার প্রতিমাকে হৃদয় পাতিয়া আলিঙ্গন করিলেন। সুলোচনার সোণার বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে—রূপ মিলাইয়া গিয়াছে,—শরীর তেজোহীন

হইয়াছে,—সুলোচনার এ চিত্র শান্তিময়ীর প্রাণে দারুণ বেদনা দিল। শান্তি-ময়ীর ভাণ্ডারে অভাব কিসের?—হৃদয়ে স্নেহ ছিল, তাহা ঢালিয়া দিলেন; শরীরে ভূষণ ছিল, তাহা সকলই সুলোচনাকে দিলেন; গৃহে ধন জন ছিল, তাহা সুলোচনার পরিচর্য্যায় নিয়োগ করিলেন। এক অভাব—বিষম অভাব ছিল, তাহাত পূর্ণ হইল না? হইল না, কিন্তু অকৃত্রিম ভালবাসায়, মিষ্ট-ভাষে, সস্নেহ ভাবে সুলোচনার চিন্তার দারুণ মর্ম্মদাহ ক্রমে যেন নিবিতে লাগিল। স্বার্থত্যাগের জীবন্ত ছবি দেখিয়া সুলোচনা স্বার্থ ছাড়িতে শিখিল। দৃষ্টান্তে এমনই হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে, সুলোচনার হৃদ-য়ের চিন্তা-রূপ-মলিন-আচ্ছাদন মাটীতে খসিয়া পড়িল।—হৃদয়ের চিন্তার সহিত শরীরের মলিনতা ও খসিল। চুলে তেল পড়িল, নবতেজে যেন তাহা আবার শোভিত হইল। দুই চারিটী জটা ছিল, তাহা কর্ত্তিত হইল। ভগ্নীর সহিত ভগ্নী মিলিল। অথবা প্রাণের সহিত প্রাণ মিশিল। শান্তি-ময়ী সুলোচনার প্রাণ পাইলেন,—হৃদয় বাঁধিলেন! কিন্তু হতভাগিনী সুলোচনা কিছুতেই শান্তিময়ীকে বাঁধিতে পারিল'না। ফুল্ল কুসুমে গুপ্ত সর্প ছিল,—শান্তিময়ীর ঐ হাসিময়, ঐ প্রফুল্লময়, ঐ আনন্দময় রূপের নিম্নে কি ভীষণ বিষধর লুক্কায়িত ছিল, সুলোচনা তাহা বুঝিতে পারিল না। সুলো-চনা যখন মজিল, শান্তিময়ীর প্রেমে যখন ডুবিল, তখন স্বার্থ-বর্জ্জিতা স্ত্রীর হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিল না।

শান্তিময়ী একদিন বলিলেন,—ভগ্নি,কেবল চোক থাকিলে হয় না, কাজ কর্ম্ম করিবার শক্তি থাকা চাই। এইবার দেখিব,তোমার ক্ষমতা কত? আমার সমস্ত বিষয় এই দেখ তোমার নামে লিখিয়া দিয়াছি,দলিলপত্র রেজেষ্টারি হই-য়াছে,—তোমাকে এইবার হইতে লোকনাথপুরের সিংহাসনে বসিতে হইবে।

সুলোচনা শুনিয়া অবাক হইলেন। এণ্ডারসন এবং কুলকামিনীর সহিত পরামর্শ করিয়াই শান্তিময়ী এই কাজ করিয়াছেন; কিন্তু উঁহারা কেহই তাঁহার হৃদয়ের গূঢ় অভিপ্রায় জানিত না। নানা প্রকার বাহিরের কথায় ভুলাইয়া, কুলকামিনী ও এণ্ডারসনের মত করিয়া, শান্তিময়ী এই কার্য্য করিয়াছেন। সুলোচনাও ভাবে কতক বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু সত্য সত্যই এতদূর গড়াইবে, তাহা জানিতেন না। আজ হঠাৎ শুনিয়া অবাক হইলেন।

শান্তিময়ী পুন বলিলেন,—কোন ভয় নাই। বিষয়ের এমন সুবন্দোবস্ত করিয়াছি যে, চিন্তার কিছুই নাই।

সুলোচনা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—আমি যে ভিখারিণী, আমার এ সকলে প্রয়োজন কি?

শান্তিময়ী।—প্রয়োজন আছে, তুমি বালিকা বইত নও, কি বুঝিবে? ভিখারিণী ত সকলেই—সংসার ত কেবলই মায়া, আর অভাব বিশ্ববিস্তৃত; সে হিসাবে রাজরাণীও ভিখারিণী,—আর ভিক্ষা-জীবিনীও ভিখারিণী। তাতে আপত্তি কি? তুমি বালিকা, সকল কথা না বলিলে বুঝিবে না। এণ্ডারসন আমাদের পরম আত্মীয়। তিনি তোমার দিদিকে লইয়া শীঘ্রই আসামে যাইবেন! কেন, বুঝিয়াছ কি? তিনি বলিয়াছেন, তোমাতে ও আমাতে যদি গভীর মিলন হয়, তবে স্বামী আবার দেশে ফিরিবেন। সাহেব বলিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ফিরাইতে পারিবেন! তোমাতে ও আমাতে মিলন হইয়া গিয়াছে—তুমি ও আমি আজ এক হইয়াছি। তোমার হৃদয়, আমার; আমার হৃদয়, তোমার। কেমন, মিথ্যা বলিতেছি? যখন ভগবতীর প্রসাদে একাত্মক হইতে পারিয়াছি, তখন আর বাহিরের বিভিন্নতা রাখিব কেন? বাহিরেও তুমি ও আমি একরূপ হইব। ভিখারিণী ও রাজরাণী, দুই এক হইব। ভালবাসার চক্ষে আবার নীচ আর উচ্চ কি,—সকল সমান। একত্রে বসিব, একত্রে খাইব, একত্রে রাজ্যশাসন করিব। আমি যখন তোমার, আমার সমস্ত দ্রব্যই ত তখন তোমার। কপটতা, প্রবঞ্চনা রাখিও না—এস উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া যাই,—ভিতর ও বাহির এক করি। সাহেবের প্রাণে কেন বৃথা সন্দেহ রাখিব? আজই সকল সন্দেহ মিটাইব। এই বলিয়া শান্তিময়ী সুলোচনার হাতে উইল-পত্র দিলেন, এবং হাত ধরিয়া তুলিয়া বৈঠকখানায় লইয়া চলিলেন। সেখানে এণ্ডারসন ও কুলকামিনী একদিকে, আর প্রজাপুঞ্জ অন্যদিকে উপবিষ্ট ছিল। রাণী কৃপাময়ীর আগমনে সকলেই আনন্দিত হইয়া উঠিয়া অভ্যর্থনা করিল। পরে রাণীর আদেশে সকলে বসিল। বসিয়া স্থির হইল—নীরব হইল। তখন রাণী কৃপাময়ী অপনার উইল-পত্র পাঠ করিলেন। চন্দ্র সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া, অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া, সম্মিলিত প্রজাপুঞ্জকে সাক্ষী করিয়া, ভীতি-বিহ্বল, স্নেহ-মুগ্ধ, কোমল-প্রাণা সুলোচনাকে সমস্ত বিষয় অর্পণ করিলেন। আনন্দে আরো আনন্দ মিশিল,—সুখে আরো সুখ বাড়িল। কৃপাময়ীর স্বার্থত্যাগ দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। এণ্ডারসন রাণীর মনোভাব বুঝিয়া, সানন্দ চিত্তে,

কুলকামিনীকে লইয়া, বিনোদকে আনয়ন করিবার জন্য, পরদিন আসামে যাত্রা করিলেন। সুলোচনা আশা-পূর্ণ হৃদয়ে লোকনাথপুরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কৃপাময়ী আপন লক্ষ্যপথে দৃষ্টিকে ফিরাইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অনলে—শান্তিনির্ব্বাণ!

তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি এণ্ডারসন ও স্নেহময়ী কুলকামিনী যখন লোকনাথপুরের মাটী পরিত্যাগ করিলেন, তখন কৃপাময়ী বা শান্তিময়ী সুলোচনার উপরে আরো স্নেহের আধিপত্য বিস্তার করিয়া ফেলিলেন। দেখিতে দেখিতে যখন একমাস দুমাস অতীত হইয়া গেল, তখন কৃপাময়ী উপযুক্ত সময় হইয়াছে বুঝিলেন। কিসের সময় হইয়াছে, তাহা কেহকে বলিলেন না। একদিন অপরাহ্নে কৃপাময়ী সুলোচনাকে বলিলেন,—"বোন্, এই বাক্সটী তোমার নিকটে সাবধানে রাখিয়া দেও।"

সুলোচনা দেখিলেন, একটী পরিপাটী সোণার বাক্স, তাহার উপরে পরিষ্কার অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

শ্রীবিনোদবিহারী চৌধুরী——"জীবন উপহার।"

ভাল মন্দ না বুঝিয়া, সুলোচনা বলিলেন দিদি, আপনি কি বিনোদ বাবুকে ইহা উপহার দিবেন?

শান্তিময়ী।—দিব। তাঁহাকে উপহার দিবার জন্যই ফরমাইস দিয়া ইহাকে প্রস্তুত করিয়াছি। কেন, ইহা কি স্বামীর উপযুক্ত হয় নাই?

শান্তিময়ীর দুইগণ্ড বহিয়া দু চারি ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

শান্তিময়ী পুন বলিলেন, এ দ্রব্যটী তাঁহার নিতান্ত অযোগ্য, তাহা বুঝিয়াছি, কিন্তু কি করিব? তাঁহার মন জানিলে আরো ভাল উপহার সাজাইয়া রাখিতাম। দুঃখিনী যেমন বুঝিয়াছে, তেমনই করিয়াছে। তাঁহার চরণের অনুপযুক্ত হইলেও ইহাই তাঁহাকে দিব। আমার জীবন অপেক্ষা আর কি মূল্যবান আছে?" শান্তিময়ীর চক্ষু হইতে অলক্ষিত ভাবে আবার জল পড়িল।

শান্তিময়ী এসকল কথা কেন বলিতেছেন, সুলোচনা তাহা কিছুই বুঝিলেন না। আপনার ভাবে আপনি বিভোর, আপনার উচ্ছ্বাসে আপনি বিহ্বল—শান্তিময়ী কত অসংলগ্ন কথাই বলিতে লাগিলেন। সরল-প্রাণা সুলোচনার হৃদয়ে কোন প্রকার সন্দেহ নাই, কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। তবুও বলিলেন,—দিদি বিনোদ বাবু কবে আসিবেন? আবার কি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে?

শান্তিময়ী।—তোমার সহিত অবশ্য সাক্ষাৎ হইবে?

সুলোচনা।—কেন, আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না?

শান্তিময়ী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—আমি কি জানি? বিধাতাই জানেন।

এই কথার প্রতি অক্ষর যেন উদাসীনতার স্পষ্ট ছবি সুলোচনার হৃদয়ে আঁকিয়া দিল, সুলোচনা বলিলেন,—দিদি আপনি এ প্রকার কথা বলিতেছেন কেন?

শান্তিময়ী বলিলেন, বোন, তোমাকে সকলই বলিব;—তোমাকে বলিতে আর আপত্তি কি?

এই কথা বলিলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই শান্তিময়ী নীরব হইলেন, কি এক গভীর নিস্তব্ধতা তাঁহার বাক্‌রোধ করিল। কিছুই বলিলেন না।

সুলোচনা পুন বলিলেন, দিদি, কি হয়েছে বলুন।

শান্তিময়ী অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া পরে বলিলেন, "আজ আর বলা হলো না;—আজ আর সময় নাই। করুণাময়ীর ইচ্ছা। আজ বড় ব্যস্ত। একটী কাজ ভুলিয়াছি।" এই কথা বলিয়া শান্তিময়ী অন্যমনস্ক হইয়া উঠিয়া আপনার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। পত্র খানি লেখা হইলে,—গৃহে স্বামীর যে সকল দ্রব্য ছিল, সে সকলের প্রত্যেককে একবার২ চুম্বন করিলেন, পরে যে বস্তু যেখানে ছিল, পুন সাজাইয়া রাখিলেন। স্বামীর যে সকল পত্রকে আদর করিয়া একটী বাক্‌সে পুরিয়া রাখিয়াছিলেন, সে সকল পত্রগুলিকে ছিড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিলেন। পত্রগুলি ছিড়িতে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল,—যেন হৃদয়টাকে ছিড়িতে লাগিলেন, কিন্তু কোন আসক্তি আজ আর বাধা দিতে পারিল না। এই কার্য্যগুলি শেষ হইতে হইতে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিকের গ্রাম্য কোলাহল থামিয়া আসিল। অন্ধকার

আসিয়া চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া রাজ্য বিস্তার করিল। সন্ধ্যার পরেই শান্তিময়ী জানালা দিয়া গৃহের বাহির হইলেন। বাহির হইবার সময়ে একবার একটা পেচক ডাকিল, পায়ে একবার একটা হুঁছট লাগিল। একবার দাঁড়াইলেন, ক্ষণকাল মাত্র। পরক্ষণে ভাবিলেন,—'অমঙ্গলের ভাবনা ভাবিব কেন? শিবের রাজ্যে অশুভ ঘটনা ঘটিবে না;—সাধু ইচ্ছায় বিঘ্ন ঘটিবে না;—বিধাতার ইচ্ছা অবশ্য পূর্ণ হইবে।' এই ভাবিয়া শান্তিময়ী বাহির হইলেন,—একাকিনী, উন্মাদিনী, এলোকেশী, করাল-বদনী, রণরঙ্গিণী, স্বার্থ-নাশিনী, আত্ম ঘাতিনী!! বিদ্যুৎ যেন চমকিয়া গেল,—তীর যেন ধনু-চ্যুত হইয়া ছুটিয়া গেল,—চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে, কেহ সে গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া দেখিতে না দেখিতে, কেহ ভাল করিয়া চিনিতে না চিনিতে,—কৃপাময়ী বা শান্তিময়ী লোকনাথপুর অতিক্রম করিলেন। লোকনাথপুরের একদিকে বিস্তৃত মাঠ, এক দিকে জঙ্গল, উন্মাদিনী আজ সেই জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। ভয় নাই, ভাবনা নাই,—চিন্তা নাই, কামনা নাই,—আসক্তি নাই, মোহ নাই,—কৃপাময়ী একাকিনী উন্মাদিনী অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। অরণ্যের ভিতরে একটী নিভৃত কুটীর ছিল, সেখানে একজন ভৃত্য রাণীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। রাণী ত আজ উন্মাদিনী। সেই উন্মাদিনী যখন কুটীরে পৌঁছিলেন, তখন ভৃত্য ভয়ে পলায়ন করিল। ভৃত্য রাণীকে অন্ধকারে চিনিতে পারিল না। ভৃত্যের সহিত কথাছিল, কোন কুলটা রমণীকে সেইখানে সেই রাত্রে গোপনে অগ্নিতে জীবন্ত দাহ করা হইবে। অগ্নিকুণ্ডে আগুন ধু ধু জ্বলিতেছে,—ধু ধু করিয়া নৈশনিস্তব্ধতাময় আঁধারকে ভেদ করিয়া এক দিকে জ্বলিতেছে। জ্বলিতেছে—কুটীরের কিছু দূরে। সে আলো কুটীরে ভাল করিয়া আসিতেছে না। ভৃত্য যখন পলায়ন করিল, এবং একটু একটু আলোক যখন বৃক্ষের ভিতর দিয়া দৃষ্টিতে পড়িল, উন্মাদিনী তখন যেন একেবারে মাতিয়া উঠিলেন। আর বিলম্ব না করিয়া, ছুটিয়া তখনই অগ্নিকুণ্ডের নিকট গেলেন। যাইয়া বলিলেন;—"রূপ ডুবাইতে তোর মত বন্ধু আর কে আছে? এরূপ আর রাখিব না,—এ বেশ আর ধরিব না, এ কণ্টক আর পুষিব না,—এ কলঙ্ক আর পালিব না, আজ তোকেই সকল উপহার দিব। বৈকুণ্ঠ—স্বর্গ—ধর্ম্ম—পুণ্য,—ও সকল কথার কথা;—স্বপ্ন,—মায়ারছবি,—বিষম মোহ! কেন ভুলিব?—কেন কণ্টক হইয়া পথরোধ করিব?—আমার ধর্ম্ম, স্বামীর মনোরথ পূর্ণ করা;—স্বামী-

সেবা —স্বামী-পূজা! জীবন কি?—সুখ কি?—সংসার কি?—স্বামীই সর্ব্বস্ব! স্বামী ভিন্ন সংসার, শ্মশান;—সুখ, দুঃখ; জীবন, মৃত্যু! আমি স্বামী-শূন্য!! স্বামীশূন্য স্ত্রীর মৃত্যু ভিন্ন, শ্মশান ভিন্ন আর কি গতি আছে? আমি আজ পুড়িব, স্বামী-শূন্য ভারতনারী কাহার মমতায় থাকিবে?—আমি আজ মায়া ছিড়িব! জ্বল্ আগুন, জ্বল্ চিতা, ভাল করিয়া দিগুন্ করিয়া আজ জ্বল্।" এই কথা বলিয়া ক্ষণকাল নীরব রহিলেন, পরক্ষণেই আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমি স্বামী-শূন্য?—মিথ্যা কথা! স্বামীই আমা-শূন্য। তিনি কি স্বেচ্ছায় স্ত্রী-ঘাতিনী?—কখনই নহে! স্বর্গের দেবতা,—নিষ্কলঙ্ক পূর্ণিমার চাঁদ তিনি,—আমি পিশাচিনী—স্বামী-ঘাতিনী,—আমি ঘোর নরক,—ঘোর আঁধার! পাপজীবনকে কেন রাখিব?—স্বামী-সেবা করিলাম না ত কেন বৃথা সংসারসেবা করিব?—দেবতার পূজা করিলাম না ত কেন শুধু স্বার্থের পূজা করিব? আমি চরণে ঠেলিয়া স্বামীকে আমার গৃহ হইতে বিদায় করিয়াছি,—আমি কুলটা! পৃথিবীর লোকেরা কি জানে? আমি কুলটা,—আমি রমণী কুলের কলঙ্ক,—অসতী,—স্বামীপদ-সেবার অযোগ্য! মানুষ আমাকে কি বুঝিবে, কি জানিবে? মানুষ আমার জন্য আর কি করিবে! আমার স্বামী কি অসতীর সহবাসে থাকিয়া অপবিত্র হইবেন?—পাপের সংস্পর্শে চরিত্র-ধন হারাইবেন?—কলঙ্কে মজিয়া ধর্ম্ম ডুবাইবেন?—আমি পথ পরিষ্কার করিব!!—স্বামীর অধর্ম্ম, পাপ, কলঙ্ক—এ সকলের মুখে আমি আজ কালি ঢালিয়া যাইব!! ভালবাসার মোহে পড়িয়া স্বামী ব্যভিচারী হইবেন, আমি তাহা এপাপচক্ষে আর দেখিব না। কলঙ্কিনীর দিকে চাহিয়া স্বামী পবিত্র প্রণয়-কুসুমে বঞ্চিত থাকিবেন, আমি ইহা সহিব না! তবে তোতে ডুবি!—সখা, জীবন, মান, পতি, গতি, তবে তোতে শরীরকে বিসর্জ্জন দি? সুলোচনা—স্বর্গ, পুণ্য—সতী। পবিত্রতাতে পবিত্রতা, স্বর্গে স্বর্গ, পুণ্যে পুণ্য,—স্বামীতে স্ত্রী এবার একীভূত হইবে,—কূলে কূল মিশিবে,—জীবনে জীবন মিশিবে। সে দৃশ্য পবিত্র দৃশ্য, দেখিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?—কিন্তু আমার ভাগ্যে সে দৃশ্য দেখা ঘটিবে না, আমি জীবিত থাকিলে সে শুভ ঘটনা পৃথিবীতে ঘটিবে না। তবে আজ আর বিলম্ব করিব না। ধর, আগুন, কুলকলঙ্কিনীকে আলিঙ্গন কর।" এই বলিয়া সেই নিস্তব্ধ অরণ্যে, নিস্তব্ধ রজনীতে, নিস্তব্ধনৈশ-নীলাকাশ তলে কৃপাময়ী প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে

ঝাঁপ দিয়া পুড়িতে লাগিলেন !! বায়ু বহিল, আগুন মাতিল। মায়া মোহ, জীবন, সুখ,—আশা ভরসা, কৃপাময়ীর সকল আঁধার হইয়া গেল !! সে যে কি ভীষণ দৃশ্য, সে যে কি লোমহর্ষণ ব্যাপার,—মানুষ তাহা দেখিল না। কৃপাময়ী লোকনাথপুরকে আঁধার করিলেন, শান্তিময়ী বিনোদের সংসার-মায়া ছিন্ন করিলেন। জীবন-লীলা জন্মের মতন শেষ হইল! ভীষণ অনলে শান্তি ভস্মীভূত হইল !!

নবম পরিচ্ছেদ।

চিতারমূলে—অনুরাগিনী।

সেই রজনীতে যখন কৃপাময়ী অগ্নিকুণ্ডে দেহ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তখন সেই ভৃত্য গোপনে থাকিয়া সকলই দেখিয়াছিল। থাকিয়া থাকিয়া শেষে রাণীকে চিনিতে পারিয়াছিল। কিন্তু এতই ভয়বিহ্বল হইয়াছিল যে, দেখিয়াও কিছুই প্রতিবিধান করিতে পারে নাই। সোণার প্রতিমা যখন ভস্মীভূত হইল, তখন হাহাকার করিতে করিতে সে ফিরিয়া আসিয়া সকলকে সংবাদ দিল। সংবাদ পাইয়া সকলে হাহাকার রবে আকাশ কাঁপাইয়া সেই ভীষণ স্থানে গমন করিল। চিতার আগুন তখন ভস্মে পরিণত হইয়াছে,—প্রতিমা তখন পঞ্চভূতে মিলাইয়া গিয়াছেন, পূর্ণিমার চাঁদ তখন অস্ত গিয়াছেন! হায়, হায় সে সোণার রূপ, সে সোণার শরীর,সে অমূল্যকান্তি সকলই পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গিয়াছে, শরীরের ভিতরে যে প্রেমধ্বনি ছিল, তাহাও মিলাইয়া গিয়াছে? মহা আঁধারে সকল ঘিরিয়াছে !! সে দৃশ্য দেখিয়া পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হইল,—ক্রন্দনের রোল আকাশকে বিদীর্ণ করিল! এক মহা বৈরাগ্যভাব আসিয়া সকলকে যেন আলিঙ্গন করিল! সকলই ফাঁকি, সকলই মিথ্যা, সেই চিতা-কুণ্ডের তটে দণ্ডায়মান শত সহস্র নরনারীর প্রাণে এই জীবন্ত ভাব প্রদীপ্ত হইল! শত সহস্র নরনারীর চক্ষের জল রাণী কৃপাময়ীর চিতায় পড়িল, শত সহস্র নরনারীর হৃদয় রাণী কাড়িয়া লইলেন। সময়ে সকলেই আবার গৃহে ফিরিল বটে, কিন্তু হৃদয়-শূন্য শরীর লইয়া ফিরিল,—কেমন এক শুষ্ক ভাব,—নিরাশ অন্তর, কেমন এক উদাসীনত্ব সকলকে ঘিরিয়া রহিল। শান্তির স্থানে

অশান্তি,—আশায় নৈরাশ্য,—দয়ার পরিবর্ত্তে ঘৃণা বিদ্বেষ, লোকনাথপুরে আসিয়া ঘিরিল। স্বামী স্ত্রীকে আর ভালবাসে না, জননী পুত্রকে ভালবাসে না,—জ্ঞাতী জ্ঞাতীকে কোল দেয় না। ভয়ানক এক উদাসীন ভাব সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল। লোকনাথপুরে রাণী কৃপাময়ীর অভাবে সকল গৃহে যেন অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

-আর বালিকা সুলোচনা? হায় হায়, মাতৃহীনা, ভগ্নিহীনা সুলোচনা যখন আত্মীয়া-কৃপাময়ী-হীনা হইলেন, তখন চারিদিক হইতে যেন গভীর আঁধার আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল। রাজপুরী আঁধার,—রাজ্য আঁধার,—সুলোচনার হৃদয় আঁধার! সুলোচনার মুখে কথা নাই, নয়নে জ্যোতি নাই, শরীরে কান্তি নাই, হৃদয়ে প্রেম নাই,—কি এক গভীর আঁধার সকল ঘিরিয়াছে! হতভাগিনী মনে ভাবিতেছেন,—"এ পৃথিবী কি কেবলই দুঃখের আগার! আমি কি কেবলই কষ্ট পাইবার জন্য জন্মগ্রহণ করেছি? মা ভগবতী সকলই জানেন! মায়ের যদি তাই ইচ্ছা হয়, তবে সন্তান কেন সুখের জন্য লালায়িত হইবে? মায়ের ইচ্ছা আমি পূর্ণ করিব না?—মায়ের ইচ্ছা যদি হয়, আমার চক্ষে কেবলই জল পড়িবে, তবে আমি কেন সে জল মুছিব? মায়ের যদি ইচ্ছা হয় যে, আমি অরণ্যে থাকিব, তবে আমি কেন রাজরাণী হইব? হায়, এই বৃথা ইচ্ছাতেই ত মরিয়াছি! হায়, আমার জন্যই দিদি, রাণী কৃপাময়ী স্বর্গে গেলেন! তিনি দেবী! কি স্বার্থত্যাগ—কি জীবন্ত দৃষ্টান্ত! আর আমি স্বার্থমগ্ন হইয়া কেবলই আসক্তির সেবা করিব? রাণী-কৃপাময়ী আমাকে রাণী করে গিয়াছেন, তাঁর কি আশ্চর্য্য মহত্ত্ব এতে প্রকাশ পাইতেছে! আর আমি যে আসক্ত হইয়া মজিতেছি, আমার কি নীচত্ব প্রকাশ পাইতেছে! দেবী যে পত্রখানি আমাকে দিয়াছেন—তা ভাল করিয়া পড়ি নাই—পড়িতে পারি নাই—চক্ষের জলে দেখিতে কিছুই পাই নাই;—আজ একবার পড়ি" এই বলিয়া সুলোচনা পত্র পড়িতে লাগিলেন;——

"প্রাণের সুলোচনা,——

"তোমাকে আমার সর্ব্বস্ব দিয়াছি,—বিষয় সম্পত্তি দিয়াছি, ধন জন দিয়াছি, হৃদয় মন দিয়াছি,—সকলের উপরে প্রাণের বিনোদকে দিয়াছি! আমার মনের অনেক দিনের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে! আমার ভয় ছিল, তুমি যদি আমার ইচ্ছানুসারে বিষয় সম্পত্তি গ্রহণ না কর, তবে সকলই বৃথা হইবে।

মা ভগবতী আমাকে সে কষ্ট হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। সর্ব্বস্ব তোমাকে দিয়া ভাবিলাম, আমি থাকিলে তোমার সুখ হইবে না !! এই সকল কথাই তোমাকে বলিব মনে ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু বলিতে পারিলাম না। কেন পারিলাম না, তাও জানি না। সর্ব্বস্ব তোমাকে দিয়া যে সুখ পাইয়াছি—মনে ভাবিলাম, তুমি যদি তাহা প্রতিদান কর, তবে সে সুখ আর থাকিবে না। স্বামীর সুখের আশায়, শান্তির ভিখারিণী তোমাকে সর্ব্বস্ব দিয়াছে, ভাবিলাম, আমি থাকিলে যদি স্বামীর সুখে বাধা পড়ে, তবে বড়ই কষ্ট পাইব। সে কষ্টের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমি চলিলাম,—চিরকালের জন্য চলিলাম। এ পৃথিবীতে আর আমার সহিত তোমার কিম্বা স্বামীর সাক্ষাৎ হইবে না !"

এপর্য্যন্ত পড়িতে পড়িতে সুলোচনার চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল, চক্ষু দৃষ্টিহীন হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষের জল মুছিয়া আবার পড়িতে লাগিলেন,—"আমার স্বামী স্বর্গের দেবতা,—এতদিন পরে তাহা বুঝিয়াছি। আমি থাকিতে স্বামী তোমার হইবেন না, তাহা বুঝিয়াছি। যাঁহার জন্য তুমি জীবনে এত কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছ, তাঁহাকে তোমার হাতে প্রদান করিবার জন্য, আমার আত্ম-হত্যাকে অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ করিলাম। আত্ম-হত্যা পাপ বলিয়া তোমার নিকট শুনিয়াছি, কিন্তু আমি তাহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। হিন্দু রমণীর স্বার্থনাশ—আত্মত্যাগই মহা পুণ্য—মহা ধর্ম্ম। আপনাকে বিসর্জ্জন না দিতে পারিলে কোন কর্ত্তব্যই পালন করা যায় না। তজ্জন্যই আমাকে ডুবাইব। আমার বিশ্বাস, ইহাতে আমার মহাপুণ্য সঞ্চয় হইবে ! মা ভগবতীর চরণে স্থান পাইব !

আর স্বামীর চরণ ?—তাহা ত চিরকালের জন্য আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। কুলটা আজ সতী হইয়াছে, দ্বিচারিণী আবার পতিব্রতা হইয়াছে। জগতের লোকে কি তাহা বিশ্বাস করিবে ? করিবে না, তাহা জানি। বিনোদও তাহা বিশ্বাস করিবে না, তাহা জানিয়াছি। অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকিব কেন ? পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব ! স্বামীর চরণ ? তাহা ত আমার বক্ষে ! এই আশাতেই দেহ বিসর্জ্জন দিব ! আমার স্বামীকে তোমাকে দিলাম, কিন্তু আমি তাঁহারই রহিলাম ! সতীর ধর্ম্ম পালনের জন্য সতী মরিবে ! কুলটা নাম ধারণ করিয়া সংসারে আর থাকিব না। ভগ্নি,

তোমার নিকট একটী অনুরোধ, একটী বিনীত প্রার্থনা, তুমি তাহা অবশ্য অবশ্য পালন করিবে। অনুরোধ এই, তুমি আমার সেই বাক্সটীকে স্বামীর হস্তে দিবে। আর অনুরোধ, তুমি আমার হইয়া তাঁহার সকল অভাব পূর্ণ করিবে।

সময় হইয়াছে, তবে আমি যাই,—জন্মের মত তবে আমি যাই, কল্য আমাকে নির্ব্বাণ-অরণ্যে নির্ব্বাণ অবস্থায় দেখিতে পাইবে।"

তোমার স্নেহের—হতভাগিনী—শান্তিময়ী।

এই একখানি পত্র,সুলোচনার জীবনে ঘোরতর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। সুলোচনা পরদিন নির্ব্বাণ-অরণ্যে কৃপাময়ীকে নির্ব্বাণ অবস্থায় দেখিলেন। ভাবে বিভোর হইয়া চিতা-ভস্ম তুলিয়া তুলিয়া সুলোচনা সর্ব্বাঙ্গে মাখিলেন। শরীরের বেশ ভূষা সকল পরিত্যাগ করিয়া, চিতা-ভস্মকে জীবনের সার করিলেন; আর ঐ চিতামূলে দিন রাত্রি পড়িয়া রহিলেন। চতুর্দ্দিকে হাহাকার—রাজ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, গৃহে গৃহে বিবাদ বিসম্বাদ জ্বলিয়া উঠিল। সুলোচনার আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই, সুলোচনা চিতার মূলে,--ভস্মাবৃতা—সন্ন্যাসিনী! হস্তে সেই সোণার বাক্স! লোকনাথপুর অশান্তি-আঁধারে নিমগ্ন।

দশম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মমিলন।

এণ্ডারসন আসামে পৌঁছিয়া অল্প সময়ের মধ্যে সকল ঘটনা অবগত হইলেন। জিতনের কুঠি-লুণ্ঠনের কথা অবগত হইলেন,—নূতন জাতীয় দলের কথা অবগত হইলেন,—যুদ্ধের কথা অবগত হইলেন,—অবশেষে ইংরাজের অত্যাচারের কথা শুনিলেন। আর শুনিলেন,—জিতনের মরণের কথা ও বিনোদের কারাবাসের কথা। এণ্ডারসন এসকল অবগত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। সাহেবেরা আবার পাহাড়ীদের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, শুনিয়া আরো দুঃখিত হইলেন। প্রথমত তিনি প্রধান প্রধান ইংরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, বিনোদকে মুক্ত করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন, বলিলেন, বিনোদ একজন সাধু ভক্ত। তারপরে অনুরোধ করিলেন, পাহাড়ীদের প্রতি অত্যাচার না করিয়া তাহাদিগকে

উন্নত করিবার জন্য চেষ্টা করা হউক। অনেক চেষ্টার পর, অনেক লেখালেখির পর, বিনোদের মুক্তির হুকুম হইল, কিন্তু অত্যাচারী পাহাড়ীদিগকে পাশব বলে পদানত রাখা উচিত নহে, এ কথা কোন মতেই গৃহীত হইল না। এই কারণে এণ্ডারসনের হৃদয় কতক ভাঙ্গিয়া পড়িল। সাহেবেরা সুশিক্ষিত, সহৃদয়, সুসভ্য, বিশেষত খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রেমে অনুপ্রাণিত, এণ্ডারসনের আশা ছিল, তাহার উপদেশ উপেক্ষিত হইবে না। এণ্ডারসন সাহেব-মহলে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন, বিশ্বাস ছিল, তিনি কোন অনুরোধ করিলে সাধারণ ইংরাজমহলে তাহা অনাদৃত হইবে না। কিন্তু সে দিন চলিয়া গিয়াছে। পাহাড়ীদের অত্যাচারে সাহেবেরা ভয়ানক ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, দেখিলেন। কোন রকমেই যখন তিনি স্বদেশী ভ্রাতাদিগের হৃদয়ে প্রেমের বীজ রোপণ করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। বুঝিলেন, ভারতের অভিনব জাতিভেদ বিনাশের পথ অন্তত কয়েক শতাব্দীর জন্য রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে! সদ্ভাব ও শান্তি স্থাপনে যখন একান্ত পক্ষে অক্ষম হইলেন, তখন তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই ভগ্ন-হৃদয় লইয়া এণ্ডারসন বিনোদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

পাহাড়ের সেই নির্জ্জন কুটীরে বন্দী বিনোদের অবস্থা এখন কিরূপ, অগ্রে বলিতেছি। যখন বিনোদ বন্দী ছিলেন, সেই সময়ে বিনোদ গভীর চিন্তায় হৃদয় মন নিয়োগ করিলেন। কুটীর নির্জ্জন, চতুর্দ্দিকে প্রকৃতি কল্পতরুর ন্যায় ভাব ঢালিতেছেন। ভাবে পূর্ব্বভাব মিশিয়াছে। প্রেমিক আবার প্রেমের পথ পাইয়াছেন। জিতনের স্বাধীনতা-প্রিয়তার কুহক মন্ত্রণা বিনোদকে পরিত্যাগ করিয়াছে। ভালবাসায় অন্ধ হইয়া, প্রকৃত ধর্ম্ম পথ পরিত্যাগ করিয়া, জীবনে যে ভয়ানক অন্যায় পাপের বীজ রোপণ করিয়াছেন, তাহা বুঝিয়াছেন। এ পরিবর্ত্তনের সহায় হইল কে? পাঠক, তোমাকে বলিতেছি। জেলী যে যোগাশ্রমে থাকিয়া প্রকৃত জীবন লাভ করিয়াছিলেন, সে যোগাশ্রম বিনোদের কুটীরের অতি নিকট। জেলী অনুসন্ধানে যখন জানিলেন, বিনোদ সেখানে বন্দীভাবে আছেন, তখন তিনি, প্রহরীদিগের সহিত আত্মীয়তা করিয়া, বিনোদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—জেলী আর পূর্ব্বের জেলী নাই। হিংসা বা বিদ্বেষ, বা ঘৃণা অসদ্ভাব, অশান্তি বা অপ্রেম,—এ সকল জেলীর হৃদয়কে

পরিত্যাগ করিয়াছে। জেলী আজকাল রমণী-শ্রেষ্ঠ সোণা হইল। সঙ্কীর্ণ বিশেষ। সন্ন্যাস ধর্ম্ম পালনে জেলীর উজ্জ্বল বর্ণ আরো ...রে স্বর্গ অবতীর্ণ। কাঁচা সোণা যেন সর্ব্বাঙ্গ ভেদ করিয়া গলিয়া পড়িতেছে। পরিধান বস্ত্র,—মস্তকের তৈল-শূন্য চুল; আশ্চর্য্য শোভা ঢালিয়া,—সমস্ত পৃষ্ঠখান ছাইয়া পড়িয়াছে,—মুখে জ্যোতি, চখে জ্যোতি, শরীরে জ্যোতি,—হৃদয়ে জ্যোতি! জ্যোতির্ম্ময়ী, প্রতিভার খনি জেলীকে দেখিয়া বিনোদ আশ্চর্য্য হইলেন; মনে ভাবিলেন,—"স্বর্গ হইতে ভগবতী কি অবতীর্ণ হইলেন? দুঃখীর দুঃখ কষ্ট দেখে ভক্তবৎসলা অন্নপূর্ণা কি কুটীরে পদার্পণ করিলেন?" এক মুহূর্ত্ত মাত্র এই ভাব হইল। পরে বুঝিলেন,—জেলী আসিয়াছেন! সাহেবেরা মনে ভাবিয়াছিল, বিনোদ উন্মত্ত, কিন্তু ভাববিহ্বল বিনোদ প্রকৃত প্রস্তাবে উন্মত্ত হন নাই। অথবা উন্মত্তই হইয়াছেন,—ভাবোন্মত্ত, প্রেমোন্মত্ত,—ধর্ম্মোন্মত্ত। সাহেবেরা সে গভীর মত্ততাকে প্রকৃত পক্ষে বুঝিতে পারে নাই। জেলীর রূপান্তরিত বেশ দেখিয়া, সে জ্যোতির্ম্ময়ী রূপ দেখিয়া,—সে জ্বলন্ত প্রতিভা দেখিয়া, বিনোদ বিস্ময়পূর্ণ ভক্তিভাবে জেলীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। একটী সামান্য ঘটনাতে উভয়ের প্রতি উভয়ের হৃদয়ে যে মনোমালিন্য, যে বিরক্তি, যে কুভাব পোষিত হইতেছিল, তাহা বিদূরিত হইল। উভয়ের মন পরিষ্কার হইল। বিনোদের পরে, জেলীও বিনোদকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। প্রণামের পালা শেষ হইলে, কথাবার্ত্তার পালা আরম্ভ হইল। উভয়ে উভয়ের বিবরণ বলিলেন। বিনোদ জেলীর বিবরণ শুনিয়া মোহিত হইলেন। যে মহাত্মার দ্বারা জেলীর জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাঁহাকে দেখিতে বিনোদের বড়ই ইচ্ছা হইল। কিন্তু বিনোদের স্থানান্তরে যাইবার অধিকার নাই। সুতরাং জেলী যোগানন্দ স্বামীকে বিশেষরূপ অনুরোধ করিয়া কুটীরে আনিলেন। যোগানন্দস্বামীর মনমুগ্ধকর প্রকৃতি দেখিয়া, বিনোদ যেন নব জীবন লাভ করিলেন। তাঁহার সহিত আপনার তুলনা করিয়া বুঝিলেন,—স্বর্গ আর নরক, আলো আর আঁধার—সুধা আর গরল যেন একত্রে মিলিয়াছে;—জাতীয় সেনা সংগঠনে, যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জনে ও স্বাধীনতার লালসায় জীবনে যে পাপবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া বিনোদ বড়ই কাতর হইলেন। ভিতরে ভিতরে অনুতাপ জ্বলিয়া উঠিল। প্রজ্বলিত অনুতাপ-শিখায় সমস্ত মলিনতা দগ্ধ হইয়া

গেল। সংসার-যশনিন্দা-নিরপেক্ষ, যোগধর্ম্ম-পিপাসু, ভগবৎভক্ত, বিশ্ব-প্রেমিক, উদার জিতেন্দ্রিয়, সেই যোগানন্দ স্বামীর সহবাসে বিনোদের সর্ব্বাঙ্গ যেন কম্পিত হইল,—অনুতাপের ভীষণ দহনে সর্ব্বশরীর কম্পিত হইল। যোগানন্দ স্বামী বিনোদের সে অবস্থা বুঝিলেন। ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞ যোগী, মানব-তত্ত্বজ্ঞ। ভগবানের দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব যিনি জানেন, মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি মহা পণ্ডিত। বিনোদের অবস্থা বুঝিয়া তিনি বলিলেন,—"বৎস, অকারণ অনুতাপ করিতেছ। ভূতভাবন ভগবানই সকল করিতেছেন। তুমি কে? তাঁহার উপরই নির্ভর কর। সরল বিশ্বাসে,কর্ত্তব্যের অনুরোধে যাহা করিয়াছ,তজ্জন্য ভাবিওনা, সরল বিশ্বাসীর প্রাণে কথনই ভগবান বজ্রনিক্ষেপ করিবেন না। স্থির হও। স্বদেশের প্রিয় সন্তান, তুমি স্বদেশের উন্নতি সাধনে রত হও। উন্নতি সাধনে রত হইবার পূর্ব্বে আপনি সিদ্ধ হও, জিতেন্দ্রিয় হও।" যোগানন্দ স্বামীর জ্ঞানভক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া বিনোদ মোহিত হইলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন,—"ভগবান! ম্লেচ্ছের অত্যাচারে দেশ ভাসিয়া চলিল, কেমনে ইহা সহিব? জাতীয়ত্বের মূলে কুঠরাঘাত পড়িয়াছে, ভারত চির-নিমগ্ন হইতেছেন। কেমনে সহিব?"

যোগানন্দ স্বামী বলিলেন,—"আমি কি বলিব? আমি কি জানি? ভূত-ভাবন ভগবানকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহার কৃপা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? আমি এইমাত্র জানি, তিনি যাহা করিতেছেন, সকলই মঙ্গলের জন্য। তাঁহাকে স্মরণ কর, আপনার উপর নির্ভর না করিয়া তাঁহার নির্ভর উপর কর। সকল দুশ্চিন্তা দূর হইবে, সকল আঁধার দূর হইবে,—সকল আশা পূর্ণ হইবে।"

যোগানন্দ স্বামী আর কোন কথা বলিলেন না। তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার কয়েকটী সংক্ষিপ্ত কথা শুনিয়া মাতৃ-ভক্ত প্রেমিক বিনোদের হৃদয় আরো উন্নত হইল, আরো প্রশস্ত হইল! ম্লেচ্ছ জেলীর প্রতি স্বামীর অকৃত্রিম ব্যবহার বিনোদের প্রাণে উদারতার পবিত্র ভাব ঢালিয়া দিল। বিনোদের জীবন আরো উন্নত হইল। সেই নির্জ্জন কুটীর বিনোদের পক্ষে স্বর্গধামের ন্যায় হইয়া উঠিল। দিন রাত্রি কেবলই ভগবানকে ডাকিতেছেন,—আহার নিদ্রা নাই--ভোগ বিলাস নাই, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ নাই। মহাদেব, সন্ন্যাসী বিনোদের প্রাণে অবতীর্ণ হইলেন। দুর্ব্বল সবল হইলেন। অসহায় সহায় লাভ করিলেন। নির্জ্জন গৃহ, সজন হইল। এক ছিল, দুই হইল।

আত্মার পরমাত্মা মিলিলে পাষাণ বিদীর্ণ হইল—মাটী সোণা হইল। সঙ্কীর্ণ হৃদয়, বিশ্ব-বিস্তৃত উদার প্রেমে দীক্ষিত হইল! কারাগারে স্বর্গ অবতীর্ণ। বিনোদ কৃতার্থ হইলেন; শান্তি পাইলেন, পবিত্র হইলেন।

এণ্ডারসন যখন বিরক্ত হইয়া বিনোদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন বিনোদের এইরূপ অবস্থা। কারাগৃহে পদার্পণ করিয়া এণ্ডারসন বিনোদের এই অপরূপ দেখিলেন। বিনোদ এণ্ডারসনকে বহুদিন পরে দেখিয়া আলিঙ্গন করিলেন,—কিন্তু চিত্ত স্থির, অচঞ্চল। উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া মহা শান্তি পাইলেন।

এণ্ডারসন বলিলেন,—বন্ধু, কি করিয়াছ? অধিক দিন নহে, অল্প সময়ের মধ্যে তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে? ছি, ভারতের মুখে কলঙ্ক দিলে?

এই তিরস্কার শুনিয়া বিনোদের হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল, বলিলেন,"ভাই, সকলই ভগবানের লীলা, কেন তিরস্কার করিতেছ? পরীক্ষায় না পড়িলে কি শিক্ষা হয়? পরীক্ষায় পড়িয়া শিখিয়াছি—মানুষ না হইতে পারিলে আমাদের ন্যায় পশুর দ্বারা আর কিছুই হইবে না। সে শিক্ষাতে আমার মহৎ উপকার হইয়াছে,—প্রাণ ভরিয়া বিশ্বেশ্বরকে ডাকিতে পারিতেছি। জিতন গিয়াছে, সমস্ত জাতীয় সেনা গিয়াছে, ইংরাজ অত্যাচার বাড়িয়াছে! কিন্তু আমি সে সকলই ভুলিতে পারিতেছি—কেবল বিশ্বেশ্বরের কৃপায়! ভাই, আজ বহুদিন পরে একবার প্রাণ ভরিয়া বল, কৃপাময়ের কৃপার জয়;—আজ আকাশ কাঁপাইয়া একবার বল, বিশ্বেশ্বরের করুণার জয়। পাপী ঐ করুণায় তরিয়া যাইবে, ভারত ঐ করুণায় উদ্ধার হইবে! পরীক্ষায় না পড়িলে কি পাশব বলের আদর কখনও ভুলিতে পারিতাম? আজ বিশ্বেশ্বরের কৃপায় বুঝিতে পারিতেছি,—পাশব বল কখনই সিংহাসন পাইবে না। শক্তি সাধন করিতেছি। যে শক্তিতে ভারত রক্ষা পাইবে, তাহারই সাধনা করিতেছি। শান্তি ভিন্ন মুক্তি নাই; মুক্তি ভিন্ন স্বাধীনতা-প্রাপ্তি অসম্ভব—কল্পনার ক্রীড়া। এই আশীর্ব্বাদ কর, ভারত-সন্তান রিপুজয়ে সমর্থ হউক, শক্তি-সাধনায় জয়ী হউক। দুঃখ করিবে কেন? ইংরাজের অত্যাচারে ব্যথিত হইবে কেন? অত্যাচার টিকিবে না—পাশব বল টিকিবে না। ভয় নাই—বিশ্বেশ্বরের কৃপার জয়, ভাই,একবার বদন ভরিয়া গাও। অশান্তি, অপ্রেম বা ঘৃণাবিদ্বেষের কথা আর বলিও না। ইংরাজের অত্যাচারের কথা আর তুলিও না। তাঁহারা

আমার জীবনের একমাত্র শিক্ষাগুরু। তোমার দ্বারা যাহা হয় নাই, তাঁহাদের দ্বারা তাহা হইয়াছে। গাও, একবার বিশ্বেশ্বরের গুণ গাও।"

এই বলিয়া প্রেম-বিহ্বল বিনোদ গদ গদ কণ্ঠে গৃহ ভেদ করিয়া আকাশ কাঁপাইয়া গাইতে লাগিলেন—

"জয় বিশ্বেশ্বরের জয়, জয় ভোলানাথের জয়,
জয় কাশীশ্বরের জয়, জয় বিশ্বপতির জয়,
জয় পতিতপাবন জয়, জয় কৃপাময়ের জয়।"

সে সুমধুর ধ্বনি, সে ভক্তিমাখা স্বর, কলনাদিনী ঝরণার বীণানিন্দিত শব্দে মিশিয়া এণ্ডারসনের হৃদয়ে ভাব ঢালিল। এণ্ডারসন মোহিত হইলেন। বিনোদের সেই সুমধুর কণ্ঠ-বিনিস্থত সঙ্গীত শুনিয়া,উন্মত্ত বেশে, জেলী ছুটিয়া আসিলেন। জেলী আসিয়া, অন্য কোনদিকে মন না দিয়া, বিনোদের সহিত নৃত্য করিতে করিতে গাইতে লাগিলেন,—'জয় বিশ্বেশ্বরের জয়,' ইত্যাদি।

উভয়ের নৃত্যে, উভয়ের মিলিত সঙ্গীতে, উভয়ের প্রেমভক্তিতে এণ্ডারসনের হৃদয় মাতিয়া উঠিল। পাষাণ গলিল। জ্ঞান, প্রেমের নিকট পরাজিত হইল। এণ্ডারসনও গাইতে লাগিলেন—'জয় বিশ্বেশ্বরের জয়' ইত্যাদি

তিন জনের মিলিত কণ্ঠের স্বরে যোগানন্দস্বামীর যোগ ভঙ্গ হইল। তিনিও প্রেম-বিহ্বল হইয়া আসিয়া সেই সঙ্গীতে যোগ দিলেন। পরে আপনার ভাবে বিভোর হইয়া গাইলেন,—"জয় বিঘ্নবিনাশন,জয় কুল-পাবন,
জয় রিপু-দমন, জয় হিংসা-দলন,
জয় জগত-মিলন, জয় পাপ-শাসন।"

যোগানন্দ স্বামীর সেই মধুর মিলন-সঙ্গীতে সকলের হৃদয় যেন দ্বিগুণ উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। আবার সকলে নৃত্য করিতে করিতে গাইতে লাগিলেন—"জয়-বিঘ্ন বিনাশন," ইত্যাদি।

এই ভাবোন্মত্ততায় সমস্ত দিবস অতীত হইল। জ্ঞান আর প্রেম, প্রেম আর কর্ম্ম; যোগ আর ভক্তি, ভক্তি আর কর্ম্ম, সকলই একত্রে মিলিয়া গেল। এণ্ডারসন আর বিনোদ, বিনোদ আর জেলী, জেলী আর যোগানন্দ স্বামী, সকলে একাত্মায় মিলিত হইলেন। মহা মিলন, মহা ধর্ম্ম, মহা শাস্ত্র, মহা কীর্ত্তি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বেষ-হিংসার রাজত্ব।

যে চারিজনের মিলন হইল, সে চারিজনের হৃদয়ই হিংসা, দ্বেষ ও ঘৃণা বর্জ্জিত! সে মিলনে, পরস্পরের বিশেষ বিশেষ ভাব, পরস্পরের মধ্যে সংক্রামিত হইল। এণ্ডারসনের হৃদয়ে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ নাই, জেলী আধ্যাত্তিক বলে বাঙ্গালীর পক্ষপাতিনী হইয়াছেন, জেলীর আদর্শ-চরিত্রে বিনোদের সাহেব-ঘৃণা ঘুচিয়াছে,—তিনজন মিলিয়াছেন মহাযোগীর হৃদয়ে;—যেখানে যোগেশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। জাতি নাই, কুল নাই, হিংসা দ্বেষ, ঘৃণা বিদ্বেষ, কিছুরই অস্তিত্ব বোধ নাই যে পরম হিন্দুর প্রাণে, সেই মহাযোগীর হৃদয়ে তিনের ঘণীভূত মিলন হইল। চারিজনের জীবনের উচ্চ আদর্শ, চারিজনে গ্রহণ করিলেন। জ্ঞানী প্রেমিক হইলেন, প্রেমিক জ্ঞানী হইলেন, জ্ঞানী ও প্রেমিক যোগী হইলেন, যোগী জ্ঞান ও প্রেমে দীক্ষিত হইয়া সংসারী হইতে চাহিলেন;—সংসারী আসক্তিহীন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। চারি জনে মহা যোগ হইল। মহা যোগ নহে, মহা বল সৃজিত হইল। কিন্তু হইলে কি হইবে, অন্যান্য আশ্রমে যে সকল যোগী ছিলেন, তাঁহারা ম্লেচ্ছ-সহবাস-লালায়িত যোগানন্দস্বামীর প্রতি বড়ই বিরক্ত হইলেন। যোগাশ্রমে আবার দলাদলি আরম্ভ হইল, পুণ্যাশ্রম হিংসাশ্রমে পরিণত হইল,—আনন্দধামে নিরানন্দ বাড়িল। অন্যদিকে সাহেব-মহলেও আগুন জ্বলিয়া উঠিল—এণ্ডারসন বিলাতের গৌরব বিনাশ করিলেন, রাজকুলে কালি দিলেন, সাহেবের নাম হাসাইলেন, এই জন্য সাহেব-মহলে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। দুই দিকেই ভয়ানক জাতি-বিদ্বেষ পাকিয়া উঠিল। সাহেবেরা হিন্দুদিগকে আরো ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল হিন্দুরাও আরো জাতি-বন্ধনকে আটিয়া বাঁধিতে লাগিল। ধর্ম্ম লইয়া যখন গোল উঠিল, তখন বড়ই মাতামাতি আরম্ভ হইল। যোগাশ্রম সকল অশান্তির আশ্রম হইয়া উঠিল, এবং ক্রমে ক্রমে সেই কেন্দ্রস্থল হইতে অশান্তি ও অপ্রেম ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ইংরাজের ভারত-উন্নতি-কামনায় ঘোরতর স্বার্থ-কামনা প্রবেশ করিল। দুই জাতিতে ভয়ানক অন্তর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ভিতরে বাহিরে ঘৃণা বিদ্বেষ রাজত্ব স্থাপন করিল। দলে দলে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচারকেরা, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার

ছলনায়, হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা প্রচার আরম্ভ করিল; এবং হিন্দুস্থানবাসীগণ তাহার প্রতিবাদ করিবার ছলনায়, ইংরাজ-নিন্দা-ব্রত গ্রহণ করিলেন, এবং জাতিভেদের বন্ধনকে ভিতরে২ শিথিল করিয়া বাহিরে টানিয়া কষিয়া বাঁধিলেন। ভয়ানক আন্দোলন চলিতে লাগিল। সে দৃশ্য দেখিয়া বিনোদ আর যোগানন্দস্বামী, এণ্ডারসন আর জেলী, সকলেই বিষণ্ণ হইলেন,—মহা অনিষ্টের আশঙ্কা করিলেন। তাঁহারা আর সেই আন্দোলনের মধ্যে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ভিন্ন আর ফললাভের সম্ভাবনা নাই, ইহা ভাবিয়া, তাঁহারা যোগাশ্রম,—সেই প্রকৃতির কাম্যকানন বা পুণ্যধাম পরিত্যাগ করিয়া লোকনাথপুরে যাত্রা করিলেন। বিনোদ বুঝিলেন,—আপাতত কিছুদিন, হিন্দু, সাহেবের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না; এণ্ডারসন বুঝিলেন, সাহেবেরা কিছুদিন হিন্দুদিগের প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখিয়া কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিবে না। যোগানন্দস্বামী বুঝিলেন,—ম্লেচ্ছ বা হিন্দু—সকলেই ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে। জেলী বুঝিলেন,—ভক্তি বিশ্বাসের রাজত্ব ভারতে এবং ইংলণ্ডে অচিরাৎ প্রতিষ্টা লাভ করিবে। প্রত্যেকে যাহা যাহা বুঝিলেন, প্রত্যেকের মনেই তাহা গোপনে রহিল।

এ অধ্যায়ে কুলকামিনীর কোন কথাই উল্লেখ-যোগ্য নাই। কুলকামিনী যেমন গিয়াছিল, তেমনি ফিরিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সুলোচনা—উদাসিনী।

নির্ব্বাণ-অরণ্য তীর্থ স্থানের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। দুই তিন মাসের মধ্যে সুলোচনার জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কৃপাময়ীর শোক ভুলিতে পারিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের মহত্ত্ব,—দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং চরিত্রবল সুলোচনার হৃদয় মনের স্তরে স্তরে অঙ্কিত রহিয়াছে। "আমার সুখের জন্য রাণী স্বর্গে গিয়াছেন"—স্বার্থত্যাগের এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সুলোচনাকে উন্নতির আর এক সোপান উর্দ্ধে তুলিয়া দিল। "সতী সাধ্বী স্ত্রীর স্বামী—বিনোদ বাবু; রাণী কৃপাময়ীর হৃদয়েশ্বর—বিনোদ বাবু,—জীবন প্রাণ সকলই; সেই বিনোদ বাবুর প্রতি আমি কুটিল দৃষ্টিতে

চাহিয়াছিলাম? ধিক আমার জীবনে।"—সুলোচনা এই অনুতাপে জ্বলিতে-ছেন। মানুষের মন ইহাপেক্ষা কি আর নীচ হইতে পারে?—এই কথা সরলা দিনরাত্র ভাবিতেছেন। আর ভাবিতেছেন,—স্বামীত্ব বা স্ত্রীত্বের জন্য নরনারী লালায়িত হয় কেন?—মিলন, ভালবাসা, ইহা সকলের সহিতই হইতে পারে। না—মিথ্যা কথা। সতী কৃপাময়ীর স্বামী—বিনোদ বাবু;—এমন মিলন, এমন ভালবাসা, দুর্লভ। স্বামীর সুখের জন্য স্ত্রী প্রাণ দিল; কি মহত্ত্ব! ভাবিলেও জীবন লাভ হয়। এই প্রকার কত কথা দিন রাত্রি ভাবিতেছেন। এক ভাবনা আর এক ভাবনার পথ পরিষ্কার করে। ভাবেন—"কৃপাময়ী লিখিয়াছেন,—" বোন, সর্ব্বস্ব তোমাকে দিয়া সুখী হইয়াছি।"—আবার লিখিয়াছেন—"তোমাদের সুখের জন্য আত্মহত্যাকে প্রয়োজন বোধ করিলাম।" হায়,এই জন্যই বিষয় সম্পত্তি আমাকে দিয়াছেন! বিনোদ বাবুকেও আমাকে দিয়াছেন! কি মহত্ত্ব! কিন্তু পরের ধন আমি লইব কেন? আমি কি এতই নীচ হৃদয় লইয়া থাকিব যে, রাণীর রাজত্ব কাড়িয়া লইব? না—না, তা হইবে না, প্রাণান্তেও পারিব না। এত দিন পরে শিক্ষা পাইয়াছি। পাপ-চিন্তায় মজিয়া তবে প্রকৃত শিক্ষা লাভ হইল। শিক্ষা দিলেন—আমার হৃদয়রাণী—মহারাণী। মহারাণী নহেন—আমার জীবনের সর্ব্বস্ব! তিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব আমাকে দিয়াছেন, আমিও আমার সর্ব্বস্ব তাঁহাকে উৎসর্গ করি। তিনিই আমার জীবনদায়িনী। করুণাময়ী শান্তিময়ী আমার জন্য কি না করেছেন?—সর্ব্বস্ব আমার জন্য অম্লান চিত্তে ঢেলে দিয়াছেন। মানুষে কি এত স্বার্থ ছাড়িতে পারে? রাণী, দেবী,—প্রত্যক্ষ ভগবতী—অন্নপূর্ণা। বিনোদ বাবু মহাদেব, কৃপাময়ী সতী। স্বামীর মঙ্গলের জন্য সতীর দেহ বিসর্জ্জিত হইয়াছে;—এই স্থানে। এই ত পবিত্র তীর্থ-স্থান। বৈকুণ্ঠও এই, স্বর্গও এই! রাজকুমারী সতী কৃপাময়ীর ভস্মই আমার জীবন ভূষণ! এই ভূষণে আমি সর্ব্বাঙ্গ সাজাইব! বেঁচে থাকিয়া মরণের সাজ পরিব। আমার জীবনে আর কি সুখ আছে?—রাণীর উদ্দেশে সকল কামনা বা বাসনাকে বলি দিব।" সুলোচনা সেই নির্ব্বাণ-অরণ্যে নির্ব্বাণ-কুণ্ডে বসিয়া বসিয়া এই প্রকার ভাবিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম, পরিধানে জীর্ণ মলিন বস্ত্র,—ভূষণহীনা সরল-প্রাণা জন্ম-দুঃখিনী বৈধব্য বেশে দিন কাটাইতে লাগিলেন। যে অমূল্য বেশ সুলোচনার চির-পরিচিত, আজ অঙ্গে সেই বেশ! কষ্ট ও দুঃখের বিদ্যালয়ের ছাত্রী কেমন উন্মত্ত হইতেছেন!

দুঃখের বেশের ভিতরে যে জিনিস ছিল, তাহা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কৃপাময়ী মরিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, সুলোচনা মৃত বেশ পরিধান করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গ করিয়া তুলিতেছেন! নির্ব্বাণ-অরণ্যে সুলোচনা যখন এই বেশে দিন যাপন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিতে দেশ দেশান্তর হইতে অসংখ্য লোক আসিতে লাগিল। সে মধুর দৃশ্য যে দেখিল, সেও যেন আপনাকে পুণ্যবান মনে করিতে লাগিল। সতীর চিতায় সতী, ভগ্নীর শ্মশানে ভগ্নী, অথবা জীবনের কোলে জীবন—যে দেখিল, সেও কৃতার্থ হইল। দূর দূরান্তর হইতে লোক আসিয়া সেই চিতার ভস্ম তুলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। সতীর আদর এমনি করিয়া দিন দিন বাড়িতে লাগিল। নির্ব্বাণ-অরণ্য এক মহা তীর্থ হইয়া উঠিল।

সুলোচনার মধ্যে যখন এই প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিল, তখন অনাথ-নগরের সেই ফকীর বুঝিল, সুসময় উপস্থিত হইয়াছে। ফকীর পূর্ব্বেই রাণী কৃপাময়ীর অভিপ্রায় জানিত;—বিষয় সম্পত্তি সকলই যে সুলোচনা পাইবে, ফকীর পূর্ব্বেই জানিত। জানিয়াই সুলোচনার নিকট হইতে দানপত্র গ্রহণ করিয়াছিল। এখন ফকীরের অত্যন্ত সুসময় উপস্থিত। কৃপাময়ীর মৃত্যুতে চতুর্দ্দিকে হাহাকার, কিন্তু ফকীর আপন সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। সুলোচনা যখন শোকে কাতর, তখনই নিষ্ঠুর ফকীর সুলোচনার নিকটে যাইয়া দানপত্র দেখাইল। সুলোচনা অম্লান চিত্তে আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন, কিন্তু ফকীরকে বলিলেন, "বিষয় দান করিতে ধর্ম্মত আমার অধিকার আছে কিনা, জানি না; তুমি বুঝিয়া দেখ। যদি ধর্ম্মের নিকট আমার কিম্বা তোমার পতনের সম্ভাবনা না থাকে, তবে বিষয় তোমারই হউক। তুমি আমার পর নহ, আমার উপকারী বন্ধু; তোমার নিকট অনেক উপকার পাইয়াছি।" বলিতে বলিতে দুই চক্ষু দিয়া কয়েক বিন্দু জল পড়িল।

ফকীর অনেক দিন পরে সুলোচনার সেই অপরূপ আবার দেখিল। সে রূপ আরো উজ্জ্বল হইয়াছে, সে হৃদয় মন আরো পবিত্র হইয়াছে। ফকীর সুলোচনার স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিল, এবং প্রতিজ্ঞা-পালনের মহত্ত্ব বুঝিল। আর বুঝিল,—সুলোচনার ধর্ম্মানুরাগ। ফকীর একটু ভাবিল। যে ফকীর আসিয়াছিল, সে ফকীর যেন আর নাই। ফকীর ধীরে ধীরে বলিল,—"আপনি এখন অত্যন্ত অস্থির, বিষয় সম্পত্তি আপনি রাখিতে পারিবেন না;—আমার নামে সকলেই ভীত; আমি আপাতত বিষয়ের

তত্ত্বাবধান করি; তারপর বিনোদ বাবু প্রভৃতি আসিলে যাহা ভাল বিবেচনা করেন, করিবেন। আমি আপনার নিকট অনেক শিক্ষা পাইয়াছি—আপনার বিষয় গ্রহণ করিয়া অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে এ বুড় বয়সে আর আমার ইচ্ছা নাই। উপকার ভিন্ন আমার দ্বারা যেন আপনার আর কোন অপকার না হয়।"

সুলোচনার কিছুতেই আপত্তি হইল না,বলিলেন,—"যেরূপ, ইচ্ছা কর; যাহাতে ধর্ম্ম থাকে, তাহাই হউক।"

এই কথার পর বৃদ্ধ ফকীর ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া রাজবাড়ীর তালাচাবি গ্রহণ করিল, এবং কোরাণকে স্পর্শ করিয়া, "অধর্ম্ম করিব না"—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বিষয়ের ভার লইল। ইহার পর বিষয় সম্পত্তি এক প্রকার ভাল ভাবেই চলিতে লাগিল।

আর সুলোচনা?—নির্লিপ্ত, অনাসক্ত, শোক-কাতর সুলোচনা,—নির্ব্বাণ-অরণ্যের নির্ব্বাণ-কুণ্ডে যোগ ধ্যান করিয়া প্রকৃত শান্তি ও পুণ্য সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কৃপাময়ীর উপহার।

বিনোদবাবু প্রভৃতি যখন লোকনাথপুরে পৌছিলেন, তখন লোকনাথপুরের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা পাঠক, তুমি জানিয়াছ। কিন্তু সেই দৃশ্য দেখিয়া বিনোদ ও এণ্ডার্‌সন, কুলকামিনী ও জেলী, এবং সকলের উপরে যোগানন্দ স্বামীর হৃদয় মন কিরূপ হইল, তাহা তোমাকে এখন বলিতেছি। লোকনাথপুরে পদার্পণ করিয়াই রাণী কৃপাময়ীর মৃত্যুর কথা সকলে শুনিলেন। গভীর ও অবিচলিত ভাব সকলের মধ্যেই দেখা গেল। কাহারও মুখে বাক্য নাই, শরীরে স্পন্দন নাই। গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে সকলে প্রথমে নির্ব্বাণ-অরণ্যের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। সুলোচনা কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, ইঁহারা আসিতেছেন, সুতরাং সুলোচনার হৃদয়ও একটু উতলা হইল! গভীর প্রেম-সাগরে একটু ভাব-তরঙ্গ খেলিল। শুষ্ক তরুতে একটু রস সঞ্চারিত হইল। মৃত শরীরে একটু আশা উদ্দীপিত হইল। নিরানন্দের পার্শ্বে, শোকের তীরে,

একটু হর্ষ, একটু আনন্দ বায়ু ধীরে ধীরে বহিল। ধীরা একটু চঞ্চলা হইলেন। হৃদয় যখনই চঞ্চল হইল, তখনই মনে ভাবিলেন,—"জীবন্ত শোক রাশির মধ্যে থাকিয়াও চঞ্চল হইতেছি?—আজ ত আনন্দের দিন নহে! রাণী কৃপাময়ী থাকিলে আজ সুখে ভাসিতাম! তিনি চিরকালের জন্য গিয়াছেন! তবে কিসের জন্য আনন্দ করিব? কারণ আছে। আজ মহাদেব আসিতেছেন, আমি প্রাণ ভরিয়া পূজিব; আজ সতীর জীবন আসিতেছেন, আমি নয়ন ভরিয়া দেখিব।" এই প্রকার ভাবিলেন। নির্ব্বাণ-অরণ্যে যাইবার সময়ে বিনোদবিহারীর মনে অনেক চিন্তা উঠিল। পূর্ব্বেই পথে পথে তিনি এগুারসনের নিকট গোপালপুরের সকল কথা শুনিয়াছিলেন। অনন্তদেবী অনন্তধামে গিয়াছেন, গোপালপুরের সকল সুখচিহ্ন আঁধার হইয়া গিয়াছে, শুনিয়াছেন। কিন্তু যে অবস্থায় বিনোদ এত বিষাদের কথা শুনিয়াছিলেন, সে অবস্থায় এ সকল দুঃখ শোকের কথা কিছুই ব্যথা দিতে পারে নাই। সকল কাহিনী শুনিয়া বিনোদ বলিয়াছিলেন,—"সবই যাইবে—আমিও যাইব, তুমিও যাইবে; কিছুই থাকিবে না।" বাল্যকালের মাতৃ-প্রেম আজ বিনোদের প্রাণে অনন্তদেবের অনন্ত প্রেমের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে, —মায়ের পরিবর্ত্তে আজ বিশ্বজননীকে হৃদয়মন্দিরে পাইয়াছেন। আজ আর তিনি সে সকল কাহিনী স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইবেন কেন? কিন্তু তাঁহারই সুখের জন্য শান্তিময়ী দেহ বিসর্জ্জন দিয়াছেন,—তাঁহার সুলোচনা-প্রণয়ের পাছে ব্যাঘাত হয়, এই জন্য পথ পরিষ্কার করিয়াছেন; ইহা যখন শুনিলেন, তখন হৃদয় যেন ছটফট করিতে লাগিল। যে অভাব আর ঘুচিবে না, যে ক্ষত আর পূরিবে না, বিনোদ তাহারই চিন্তায় অধীর হইলেন। মনের ভিতরে এক প্রবল দুঃখের স্রোত প্রবাহিত হইল। সঙ্গীরা সকলেই গম্ভীর, কিন্তু বিনোদ ভিতরে ভিতরে অস্থির হইলেন। অস্থির হইলেন বটে, কিন্তু বাহিরে অস্থিরতার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। সতী শান্তিময়ীকে এত দিন পরে বিনোদ চিনিতে পারিলেন। সতীর প্রেম বিনোদের হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। সুলোচনার মহাদেব সতীর শোকে উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। কিন্তু তখনও বাহিরে কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই।

নির্ব্বাণ কুণ্ডের নিকট তাঁহারা যথা সময়ে পৌছিলেন। পৌছিতে না পৌছিতে সুলোচনা—সেই জীবন-মৃতা, সেই শোক-বিহ্বলা, কৃপাময়ীর শেষ

উপহার লইয়া বিনোদের শ্রীচরণে রাখিলেন,—শান্তভাবে বলিলেন,—"সতীর শেষ উপহার এই।"

চক্ষের জল সম্বরণ করিতে সুলোচনা অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারিলেন না। শ্রাবণের ধারার ন্যায় জল পড়িতে লাগিল।

এণ্ডারসন সেই উপহার—পরিপাটী সোণার বাক্সটী তুলিয়া লইলেন। যোগানন্দ স্বামী বিনোদের হস্ত ধরিলেন। কুলকামিনী সুলোচনাকে ধরিলেন। জেলী নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইলেন।

যোগানন্দ স্বামী বলিলেন,—গভীর শোকের মধ্যে যে অটল থাকিতে পারে, সেই প্রকৃত বিশ্বাসী। বিশ্বাস, কথার কথা নহে। বিনোদ, শান্তভাবে এই শ্মশানের হর-গৌরীকে এক বার স্মরণ কর। বিশ্বেশ্বরের রূপ ঐ ভস্ম-ময় শ্মশানে এক বার দেখ।

বিনোদ অবিচলিত ভাবে রহিলেন, এণ্ডারসন বাক্স খুলিলেন। বাক্সের ভিতরে দুটী রূপার ধুতরা ফুল, একটী শিবের মূর্ত্তি, সতীর হাতের দুগাছী শঙ্খ-বলয়, এবং হস্তলিখিত এক খানি পত্র দেখিলেন। পত্র খানি খুলিয়া এণ্ডারসন বড় বড় করিয়া পড়িতে লাগিলেন,—"সতীর জীবন, সতীর প্রাণ, বিনোদ,—তুমি যে মাতাকে বড় ভালবাসিতে, তিনি অমর-ধামে গিয়াছেন! তুমি যে ধ্যান-নিমীলিত মহাদেবের মূর্ত্তিকে বাল্যকালে ভক্তি করিতে, সে মূর্ত্তি মাটীতে মিশাইয়া গিয়াছে। তোমার ভক্তি ও ভালবাসার যাহা ছিল, সে সকলই গিয়াছে। আমি তোমার মাতৃপ্রেম, এবং দেব-ভক্তির কণ্টক ছিলাম, আমি আর থাকিব কেন?—আমার কর্ত্তব্য সাধিত হইয়াছে, তাই আমি চলিলাম। আমি তোমার হৃদয়ে কষ্ট দিবার জন্য ছিলাম, তাহা ভাল করিয়া দিয়াছি। মাতৃভক্তি, দেবভক্তি—সংসারভক্তি—সকলই আমি একচেটিয়া করিয়া ব্যবসা চালাইতে চাহিয়াছিলাম,—তুমি স্বর্গের পরী, তুমি তাহা সহিতে পারিবে কেন? তাই তোমাকে হারাইলাম। হারাইয়াই আমি জ্ঞান পাইলাম। জ্ঞান পাইয়া দেখিলাম,—আমার গৃহ-শূন্য,—হৃদয় আঁধার। স্বামী-শূন্য স্ত্রী, পৃথিবীতে থাকার প্রয়োজন বুঝিল না। এক প্রয়োজন ছিল,—তোমার জন্য যে সরলা প্রাণ ধরিয়া রহিয়াছে, তাহার প্রতি কতক কর্ত্তব্য ছিল; তাহা করিবার জন্য এত দিন জীবিত ছিলাম। সে কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হইয়াছে। তোমার কুলটা শান্তিময়ী পৃথিবীতে আর থাকার কোনই প্রয়োজন দেখিল না; তাই আমি চলিলাম।

তুমি কি আমার জন্য অশ্রু ফেলিবে?—তুমি কি আমার জন্য ব্যথিত হইবে? হইবে বই কি, তুমি ত মানুষ নহ, তুমি দেবতা। পরের দুঃখ-মোচনের জন্য, পরের অভাব মোচনের জন্য সতত যাঁহার হৃদয় ব্যাকুল, সে কি মানুষ? মানুষে পরের জন্য জীবন ভাসাইতে পারে না। তুমি, দেবতা, আমার জন্য অবশ্য কাঁদিবে! আমার স্বামি, প্রাণ, জীবন! কাঁদিও, তোমার পায়ে ধরি, তোমার একবিন্দু চক্ষের জল যেন শান্তি-ভিখারিণীর চিতায় পড়ে। মহাদেবের অশ্রু ভিন্ন আমার চিতার আগুন নিবিবে না? স্বামীর অশ্রু-বৈতরণী পার না হইতে পারিলে কুলটার বৈকুণ্ঠ মিলিবে না! স্বামি, আমার জন্য একবার চক্ষের জল ফেলিও।

তোমার বিষয় সম্পত্তি সকলই তোমার জন্য সুলোচনাকে দিলাম। সুলোচনা তোমারই জন্য প্রাণ ধরিয়া আছে! সুলোচনা স্বর্গের পরী,—আমি তাঁহার পায়েরও অনুপযুক্ত। সুলোচনা তোমারই যোগ্য, তোমারই উপযুক্ত।

এতদিন পরে বুঝিয়াছি, সুলোচনাই প্রকৃত সতী! আর আমি?—আমি কুলটা, ব্যভিচারিণী। আমার নাম তুমি আর মুখেও আনিও না। এক বিন্দু অশ্রু ফেলিও, তারপর পাপীয়সীর নামও আর মুখে আনিও না। পবিত্র হিন্দু পরিবারে আমি পিশাচিনী বাস করিতেছিলাম;—গৃহকে কলঙ্কিত করিয়াছিলাম। আমি আজ সকলই বুঝিয়াছি, আমার মৃত্যু ভিন্ন এ পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। তাই মরণের কোলে, অনন্ত কালের জন্য, আশ্রয় লইলাম। আশ্রয় লইয়া প্রকৃত সতীর পথ পরিষ্কার করিলাম। আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি সুলোচনাকে আপন হৃদয়ে স্থান দিও। তোমারই জন্যই সে প্রাণ ধারণ করিতেছে।

আমি তোমাকে আর কি দিব? দুটী ধুতরা ফুল তোমার জন্য রাখিলাম, তুমি কাণে পরিও;—যখন তুমি মহেশ্বরের ধ্যানে বসিবে, তখন কাণে পরিও। তুমি সতীর স্বামী, মায়ের ভক্ত-সন্তান, সতী ও মায়ের চরণ পূজায় রত থাকিও। মাতৃপ্রেম সতত মনে রাখিও।

আর একটী অনুরোধ। কাঙ্গালিনীর লোকনাথপুর—শান্তিময়ীর শান্তির রাজ্য, কৃপাময়ীর কৃপা-বিস্তারের ক্ষেত্রকে তুমি কৃপার চক্ষে দেখিও। আমার জন্য একটুও যদি তোমার মমতা থাকে, তবে এই ক্ষুদ্ররাজ্যে সে মমতা ঢালিয়া দিও। তোমার এক বিন্দু স্নেহ মমতায় লোকনাথপুর কৃতার্থ হইবে।

আমার একটী খেদ রহিল! তোমার ভালবাসা, তোমার রূপ, তোমার গুণ আমি ভুলিতে পারিলাম না। সুলোচনার হাতে তোমাকে উপহার দিলাম বটে, কিন্তু আমি সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারিলাম না, তোমার আসক্তি-দড়ি ছিঁড়িতে পারিলাম না। জীবনে মরণে তোমার রূপ আমার সম্বল রহিল। আর কি বলিব?—সকল কথা শেষ হয়, তবুও হৃদয়ের ভাব প্রকাশ হয় না। তুমি আসক্তময়ীর আসক্তি ছিন্ন করিয়া, আমার সকল ভাব যে বুঝিয়াছ, তাহার দৃষ্টান্ত রাখিবে। আজ বিদায় হইলাম, চিরকালের মত এই শেষ বিদায়।" তোমার হতভাগিনী—কুলটা—শান্তিময়ী।

এণ্ডারসনের পত্র-পাঠ সমাপ্ত হইল। বিনোদ এতক্ষণ স্তব্ধ স্থির ভাবে ছিলেন, যাই পত্র শেষ হইল, অমনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। সকলে সেই গভীর শোকের মধ্যে আকাশ কাঁপাইয়া হর-গৌরীর গুণ কীর্ত্তনে নিমগ্ন হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নবলীলা।

সময়ে সকলে সুস্থির হইলেন। যোগানন্দস্বামী, এণ্ডারসন, জেনী, বিনোদ, সুলোচনা এবং কুলকামিনী, সেই নির্ব্বাণ-অরণ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, আশ্রম স্থাপন করিলেন। ইহাকে মিলনের কথা বলিতে চাও, বল। সকলেই এমন এক অবস্থায় আসিয়াছেন, যে সকলেই যেন একাত্মক হইয়া গিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন পথে ভ্রমণ করিয়া শেষে এক মহাযোগে সকলে মিলিত হইয়াছেন। কিন্তু তোমরা এক চিত্রকে অন্য চিত্র বলিয়া ভুল করিও না। এণ্ডারসন আর জেনী এখন আর স্বামী স্ত্রী নন,—পূর্ব্বের সে সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যত দিন বিশ্বপ্রেম হৃদয়ে উদিত না হইয়াছিল, ততদিন সীমাবদ্ধ সম্বন্ধ—স্বামী স্ত্রী ভাব ছিল। মহাজ্ঞান, মহাপ্রেমে—বিশ্বপ্রেমে যখন মগ্ন হইল, তখন আর সঙ্কীর্ণ সম্বন্ধ রহিল না। জেনীর নিকট, বিনোদ, সুলোচনা, এণ্ডারসন, কুলকামিনী ও যোগানন্দস্বামী, সকলই সমান। সম্বন্ধের তারতম্য নাই, স্ত্রী পুরুষের ভেদাভেদ নাই। আপনাপন সাধনায় সকলেই যখন সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তখন সকলেই সমান। সকলেই সকলের বন্ধু, সকলেই সকলের গুরু, সকলেই সকলের স্বামী, সকলেই সকলের উপদেষ্টা, সকলেই সকলের ভাই, সকলেই সকলের পিতা

যাঁহা। এইরূপ সাধনা আরম্ভ হইল; অতৈক্যব্রহ্ম-লাভের জন্য, এইরূপ কঠোর সাধনা আরম্ভ হইল। সুলোচনা আর বিনোদও মিশিয়াছেন, কিন্তু কে স্বামী, কে স্ত্রী, কেহই জানেন না। বিনোদ ভাবেন, সুলোচনাই স্বামী,—গুরু, উপদেষ্টা; আর সুলোচনা ভাবেন, বিনোদই প্রেমময়ী, প্রেমরূপিণী সতী। সংসারের সম্বন্ধ সেখানে নাই,—রিপুর গঞ্জনা নাই,—স্বার্থের কোলাহল নাই;—শরীর-সেবার উপকরণ কিছুই নাই। সকলেই সকলের স্বামী, সকলেই সকলের স্ত্রী। মিলনে যদি পুণ্য থাকে, তবে সে পুণ্যাশ্রমে তাহা ছিল, আর মিলনে যদি পাপ-রিপু থাকে, তবে তাহা সেখানে ছিল না। একতায় যদি শান্তি থাকে, তবে তাহা সেখানে ছিল; কিন্তু একতায় যদি বিবাদ বিসম্বাদ থাকে, তবে তাহা সেখানে ছিল না। ইংরাজ আর বাঙ্গালী, পুরুষ আর রমণী, প্রভু আর দাসী, ব্রাহ্মণ আর কায়স্থ একত্রে মিলিয়াছেন। অথবা জ্ঞান আর প্রেম, বল আর বুদ্ধি, যোগ আর কর্ম্ম, আসক্তি আর বৈরাগ্য একত্রে মিলিয়াছে। মহাতীর্থ, মহাধর্ম্ম, মহাশাস্ত্র নির্ব্বাণ-অরণ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই তীর্থে আগমন করিয়া শত সহস্র লোক নব-জীবন লাভ করিতে লাগিল। সেই তীর্থের সংস্পর্শে জ্ঞানী প্রেম পাইল, যোগী কর্ম্ম শিখিল, ভক্ত যোগে মাতিল, সংসারী বৈরাগ্য পাইল। সেই সামান্য নির্ব্বাণ-অরণ্যের সাধনার বলে লোকনাথপুর পবিত্র হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ ফকীর সেই আকর্ষণে পড়িল,—সেও দলে মিশিল। সেই মহা সাধনার ফল সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল; সকলেই তাহাতে আকৃষ্ট হইল। বিশ্বাসীর অবিশ্বাস, অপ্রেমিকের অপ্রেম, কুজ্ঞানীর কুজ্ঞান, তার্কিকের তর্ক, সকল সে জীবন্ত শ্মশানে ভস্মীভূত হইল। সাম্য এবং শান্তি, নীতি এবং পুণ্য, বিশ্বাস এবং প্রেম, জ্ঞান এবং কর্ম্ম অল্পে অল্পে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। কিন্তু পৃথিবীর লোকেরা আজও জানিতে পারে নাই যে, ভারতের সেই বিন্দু পরিমাণ স্থানে "নবলীলা" বা "নব-ধর্ম্ম" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশ উদ্ধারের বীজ-মন্ত্র, সাম্যবাদের জীবন্ত-শাস্ত্র, মুক্তির অভ্রান্ত বেদবেদান্ত সেই নির্ব্বাণ-অরণ্যে যে রচিত হইয়াছে, আজও দূরের লোকেরা কেহই তাহা জানিতে পারে নাই। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মকে কে প্রচ্ছন্ন রাখিবে?—প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাকে কে থামাইয়া রাখিবে?—যখন সময় আসিবে, তখন "নবলীলার" নবতত্ত্ব দুয়ার দুয়ারে প্রচারিত হইবে;—যখন দিন ফিরিবে, তখন মহামিলনের মহাগীতি ঘরে ঘরে অধীত হইবে;—তখন গৃহে গৃহে নবলীলা অভিনীত হইবে।

[illegible]

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ডাকাতের মাঠে।

অনাথনগরের নীচে একটী ক্ষুদ্র নদী। সুন্দর বনের অপ্রশস্ত নদী,—স্রোত অতি প্রবল। জোয়ারে তীরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া স্রোত কৃষকের ধান-ক্ষেতে প্রবাহিত হয়। ধান ক্ষেতের একধারে নদী, একধারে অনাথনগরের নিবিড় অরণ্য। অরণ্যের পশ্চিমে অনাথ নগর। ঐ অরণ্যের নীচেই প্রবল স্রোত ধান-ক্ষেতে প্রবাহিত। ধান গাছের গলায় গলায় স্রোত। স্রোতের কলকল রবে নিত্য অরণ্য পুলকিত। ধানগাছের সহিত স্রোতের কতই কোলাকুলি—কতই রঙ্গ—কতই ভাব। এদৃশ্য দেখে, অনিমেষ নয়নে নিস্তব্ধ অরণ্যের বৃক্ষরাজি, আর দেখে, অরণ্যের পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ। আর কে দেখে, পাঠক তুমি শুনিবে? স্থির হও, বলিব।

সায়ংকাল উপস্থিত—অরণ্যের পশু পক্ষী বন কাঁপাইয়া ডাকিতেছে :—যেন প্রলয় উপস্থিত! এক শ্রেণীর ডাকের পশ্চাতে আর এক শ্রেণীর ডাক, তাহার পশ্চাতে আর শ্রেণীর ডাক—সকল ডাকের মিলিত স্বর নীলিমাময় সায়ং সান্ধ্য-গগনে উঠিয়া কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে! সকল পরিশ্রম আকাশে বিলীন হইতেছে! ডাকিয়া ডাকিয়া হিংস্রজন্তুগুলি বন ছাড়িয়া গ্রামেরদিকে ছুটিতেছে, গ্রাম হইতে পক্ষীগুলি উড়িয়া উড়িয়া বনে আশ্রয় লইতেছে। সূর্য্যের রশ্মি নিবিয়া গিয়াছে—দূর দূরান্তর হইতে গাঢ় অন্ধকার কোল প্রসারিত করিয়া আসিতেছে। সেই আঁধার দেখিয়াই পশুপক্ষী যেন ভয়ে ডাকিতেছে। আঁধারে সব একাকার করিতেছে, সকলের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া আপন ক্রোড়ে করিতেছে, সীমাবদ্ধ ভাবকে অসীম করিতেছে,—বিশেষত্বকে ডুবাইয়া একত্বে পরিণত করিতেছে—বৃক্ষ ফল ফুল, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, নরনারী সেই আঁধারে সব একাকার। এ দৃশ দেখিতেছে,

আকাশ হইতে ক্ষীণালোক বিস্তার করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রমণ্ডলী, আর ঐ অরণ্যের মধ্য হইতে কে দেখিতেছে, পাঠক, শুনিবে? স্থির হও, বলিব।

ঐ নদীর অপর পারে ডাকাতের বিস্তৃত মাঠ। মাঠে বৃক্ষ নাই, বসতি নাই, সব পরিষ্কার। মাঠের একদিকে নদী, আর অনেক দূরে লোকের বসতি। মাঠের শব্দ মাঠেই লয় পায়, গ্রামে যায় না, গ্রামের শব্দ মাঠ পার হয় না। দিবসে এই মাঠে খেলে রৌদ্র, রাত্রে খেলে অন্ধকার বা জ্যোৎস্না, —যখন যাহার পালা, সেই তখন খুব খেলে। দুপ্রহরের সময় কাহার সাধ্য এই মাঠের রৌদ্র ভেদ করিয়া গমন করে, রাত্রেই বা কাহার সাধ্য এই জনপ্রাণীহীন নীরব প্রান্তরের আঁধার ভেদ করে। অতি প্রত্যূষে ভিন্ন রৌদ্রের ভয়ে মাঠে কেহ পাড়ী ধরে না, সন্ধ্যার সময় কেহ এমাঠে হাটে না। আজ হঠাৎ সন্ধ্যার সময়ে দুই জন লোক এই মাঠের মধ্যে পড়িয়াছে। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, এ সময়ে এমাঠে প্রায়ই ডাকাতি হইত। দুই জন লোকের একজন স্ত্রীলোক, একজন পুরুষ। স্ত্রীলোকটী মাঠের সকলই জ্ঞাত ছিল, তাঁহার ধারণা ছিল, বেলাবেলি মাঠ পার হওয়া যাইবে, খেয়া মিলিবে; কিন্তু শরীরের অবসন্নতা প্রযুক্ত তেমন হাটা হয় নাই, তাই মাঠের মধ্যেই সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। স্ত্রী লোকের মনে হইতেছে, যদি দস্যুর হাতে প্রাণ বাঁচে তবুও খেয়া মিলিবে না, সুতরাং রাত্রে শীতে বা বন্য জন্তুতে প্রাণ লইবে। অত্যন্ত ভয়ে জড়সড় হইয়া স্ত্রীলোকটী ছুটিতেছে। ছুটিতেছে কিন্তু পা চলিতেছে না, পশ্চাৎদিক হইতে কে যেন গতিরোধ করিতেছে। স্ত্রীলোকটী ফিরিয়া চাহিল, দেখিল ঘোর আঁধার চতুর্দ্দিক গ্রাস করিতেছে; পশ্চাতের দিকে চাহিয়া প্রাণ উড়িয়া গেল। স্ত্রীলোকের চলিবার শক্তি রহিত হইল, ক্ষণকাল বসিল। প্রায় অর্দ্ধদণ্ডের পর স্ত্রীলোকের প্রাণে একটু সাহস জন্মিল, মনে হইল, কে যেন সঙ্গে আছেন, কে যেন রক্ষা করিবেন। স্ত্রীলোকটী সাহসে ভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল পরে বুঝিল, কে যেন অতি নিকটে। একটী পুরুষ বেলা থাকিতে মাঠের মধ্যে দূর হইতে লোক দেখিয়া,মাঠে পাড়ী ধরিয়াছিল,সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লোক দেখিয়া চলিতেছিল, সন্ধ্যার পরে আর কিছুই দেখিতে না পাইয়া ত্রস্ত হইয়া ছুটিয়া যাইতেছিল। নিকটে আসিলে স্ত্রীলোকটী বুঝিল, এক জন মনুষ্য, পুরুষটীও বুঝিল এক জন মনুষ্য ধরিয়াছি। কিন্তু এমনি অন্ধকার, কে পুরুষ, কে

স্ত্রীলোক, উভয় কে তাহা জানে না। কাছে আসিলে স্ত্রীলোকটী অগ্রে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে?

পুরুষ উত্তর করিল, আমি বিদেশীলোক নাম বলিলে চিনিবে না।

স্ত্রীলোক।—কোথায় যাইবে?

পুরুষ।—অনাথপুরে।

স্ত্রীলোক।—কোথা হইতে আসিয়াছ?

পুরুষ।—অনেক দূর হইতে,—তুমি চিনিবে না। তুমি কে?

স্ত্রীলোক।—আমি এদেশী স্ত্রীলোক, তুমি বিদেশী লোক নাম বলিলে চিনিবে কেন?

পুরুষ বলিল, নাম শুনিব, না চিনি তবুও বল তোমার নাম কি?

স্ত্রীলোকটী একটু ভাবিয়াই বলিল, আমার নাম করালী, কেমন সুখী হইয়াছ?

পুরুষ বলিল, করালী নাম আমি শুনিয়াছি, তুমিই কি 'করালী'?

করালী কি ভাবিয়া মনে মনে হাসিল; পরে বলিল, আমিই করালী,কিন্তু তোমার কোন ভয় নাই।

পুরুষ বলিল, করালীকেও আমি ভয় করি না, আমরা পৃথিবীতে কাহা-কেও ভয় করি না।

স্ত্রীলোকটী লোকের সাহস দেখিয়া বিস্মিত হইল, কারণ করালীকে ভয় করিত না অনাথপুরের দুই তিন দিন নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে এমন লোক ছিল না, বলিল, তুমি কোন দেশ হইতে আসিয়াছ?

পুরুষ বলিল, তাহা বলিব না।

স্ত্রীলোকটী বিস্মিত ভাবে বলিল, করালীকে ভয় করিতেছ না? এখনই তোমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইব,পরে নাক কাণ কাটিয়া এই মাঠে ছাড়িয়া দিব।

পুরুষ।—তাহা পারিবে না, ক্ষমতা থাকে, কাছে এস।

করালী অপ্রতিভ হইল, বলিল, তোমার খুব সাহস, তবে তুমি অগ্রে চলিয়া যাও না কেন?

পুরুষ এবার বিপদ গণিল, কারণ সে পথ চিনিত না; বলিল, যখন ইচ্ছা হইবে তখনই যাইব।

স্ত্রীলোক বলিল, স্ত্রীলোকের নিকটে ইচ্ছা করিয়া যে পুরুষ দাঁড়ায়, সে পাষণ্ড! তুমি চলিয়া যাও।

পুরুষ এবার অপ্রতিভ হইল, বলিল, তোমাদের দেশে এ প্রকার পাষণ্ড নাই?

স্ত্রীলোক।—অনেক আছে। কিন্তু তাতে তোমার কি? তুমি ত আর এদেশী লোক নহ? তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে যে, তুমি সাহেব, শুনেছি সাহেবেরা স্ত্রীলোকদের খুব সম্মান করে, তাই বলিলাম।

পুরুষ।—আমি এখনই যাইতাম, কিন্তু আমি নিরুপায়, এই প্রদেশ আমার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাই একা যাইতে পারি না। তোমাকে অনাথপুরের যাত্রী বলিয়া শুনিয়াই তোমার পশ্চাৎ আসিয়াছি, তোমার সঙ্গ ধরিয়াই এতদূর আসিয়াছি। এক্ষণ যদি পথহারা পথিককে পথ না দেখাও, তোমার অধর্ম্ম হইবে।

স্ত্রীলোক।—যদি ধর্ম্মকে আমি মানিয়া না চলি?

পুরুষ।—ধর্ম্ম না মানিতে পার, কিন্তু দয়াকে না মানিয়া পার না। পথ দেখাইতে হইবে, কারণ আমি কৃপাপ্রার্থী নিরাশ্রয়।

স্ত্রীলোকটী নত হইল, বলিল, তবে তুমি আমার সহিত এস, খেয়াঘাটে নৌকা পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ; যদি নৌকা না পাওয়া যায়, তবে উভয়ে একত্রে নদীতীরে থাকিব। এ মাটে বড় ভয়।

পুরুষ বলিল, আজ নদীতীরে থাকিতে ইচ্ছা নাই, যে প্রকারে হউক নদী পার হইতেই হইবে, যে প্রকারে হউক অনাথপুরে যাইতেই হইবে, নৌকা না পাই নদী সাঁতরাইব।

করালী মনে মনে পুরুষের সাহসকে ধন্যবাদ দিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল, পুরুষটী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

খেয়াঘাটে—পান্সীতে!

খেয়াঘাটে খেয়া-নৌকা মিলিল না, কিন্তু ঘাটে তিনখানি পান্সী বাঁধা রহিয়াছে, পথিকেরা দেখিল। একখানি নৌকার ছইয়ের ভিতর হইতে মনুষ্যের স্বর বাহির হইতেছিল, পথিকেরা চুপি চুপি পান্সীর ধারে যাইয়া কাণ পাতিয়া কথা শুনিল।

প্রথম আরোহী বলিতেছে, এত পরনিন্দা ভাল নহে, আপন দোষ শোধন করাই মনুষ্যত্ব।

দ্বিতীয়।—নিন্দাই আমার ব্রত, লোককে ভাল করিতে হইলে এ ব্রত অবলম্বন করিতেই হইবে, পথ এক, ভিন্ন দুই নহে।

প্রথম।—তুমি নিজে যে কি পদার্থ, তাহা কি একবারও ভাবিবে না? ভিতরে বিষ পূরিয়া বাহিরে সুধা মাখিয়া কত কাল কাটিবে? একই ভাবে কি চিরকাল যাইবে? ধন মানে, জ্ঞান গৌরবে, বিদ্যা বুদ্ধিতে, শক্তি সামর্থ্যে তোমাপেক্ষা উন্নত লোক কি বাঙ্গালায় আর নাই? তুমি কাহাকেও কেয়ার কর না, কিন্তু তোমাপেক্ষা অধিক শক্তি কি আর কাহারও নাই?

দ্বিতীয়।—"আমি আমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও গণিব না—এই ভাবেই জীবন যাইবে। শক্তি কাহারও থাকে, আমায় সমকক্ষ হউক! বুদ্ধি কাহারও থাকে, আমার চক্রান্ত বুঝিয়া ফেলুক! জ্ঞান কাহারও থাকে, আমাকে চিনিয়া লউক! বল কাহারও থাকে, আমাকে পরাস্ত করুক! কেবলই কল্পনার কথা শুনিয়া ভীত হইব কেন? শক্তির পরীক্ষা আজই হইবে—মানুষ কেহ দেশে থাকে, আমার সমক্ষে আসিয়া জয় লাভ করুক।"

করালী আর সহ্য করিতে পারিল না, বলিল, নৌকা কোথাকার?

মাজী চিৎকার করিয়া বলিল, বিষ্ণুপুরের নৌকা।

করালী পুন বলিল, নৌকা কোথায় যাইবে?

মাজী উত্তর করিতেছিল, এমন সময়ে ছইয়ের ভিতর হইতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—নৌকা আজ রাত্রে এই নদীতেই থাকিবে, পরে যেখানে ইচ্ছা, যাইবে।

করালী বলিল,—আমাদিগকে পার করিতে হইবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হাসিয়া বলিল, তোমরা কে গা?

করালী বলিল,—আমি বিবসনা, সঙ্গে বিদেশী লোক, আমরা উভয়েই অনাথপুরে যাইব, পার করিতেই হইবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—নৌকায় এস, পার করিব।

করালী নির্ভয়ে অগ্রে নৌকায় পা ফেলিল, পরে বিদেশীও নৌকায় উঠিল। নৌকায় উঠিয়া করালী আলোকে, সাহেবকে ভাল করিয়া দেখিল।

সাহেব নৌকায় উঠিল দেখিয়া নৌকার দ্বিতীয় ব্যক্তি ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল—দুজনকে পার করিতে পারিব না, এক জন নামিয়া যাও।

করালী বলিল—তবে আমিই যাই, কারণ বিদেশীকে পার করিতেই হইবে—অতিথিকে অগ্রে সাহায্য করাই ধর্ম্ম। আমি নামিয়া যাইতেছি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি।—তোমাকেই পার করিব, ম্লেচ্ছকে তীরে নামাইয়া রাখিব—পাষণ্ডকে পার করিব না।

সাহেব সঙ্গিনীর মহত্ত্ব স্মরণ করিয়া বিস্মিত হইল, বলিল, ইহাকে কখনই রাখিয়া যাওয়া হইবে না—আমিও থাকিব না, সুতরাং উভয়কেই পার করিতে হইবে।

প্রথম ব্যক্তি বলিল,—যদি পার করিতে হয়, তবে উভয়কেই পার করা যাইবে, কিন্তু বড় ভয়ের কথা। অনাথপুরের ঘাটে আজ রাত্রে নৌকা রাখা বিষম ব্যাপার!

সাহেব বলিল—কোন ভয় করিবেন না, পার করুন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি সাহেবের কর্কশস্বরে উষ্ণ হইয়া উঠিল, বলিল—পার করিব না, ম্লেচ্ছ দূর হ। নৌকা থেকে নাম্।

করালী বলিল, ম্লেচ্ছ দেশের রাজসিংহাসন পাইয়াছে, রাজভক্ত ভারত সাহেবের গোলামী-ব্রত লইয়াছে, ব্রাহ্মণ ব্যবসা ছাড়িয়া মদ্ ধরিয়াছে,—আফিসে কর্ম্ম লইয়াছে,—ইংরাজের পোষাক ইংরাজের ভাষা লইতেছে, আবার সাহেব বলিয়া ঘৃণা? এ ঘৃণা বাহিরের, অন্তরের নহে। যদি ঘৃণা থাকে, মাথার দিব্বি, সাহেবকে নামাইয়া দেও।

দ্বিতীয় ব্যক্তির বেশ পরিবর্ত্তিত ছিল, করালীর বেশও পরিবর্ত্তিত ছিল, নচেৎ উভয়ে হয়ত উভয়কে চিনিতে পারিত। বিপদের সহিত সহবাস করিতে করিতে করালী এত সাহস পাইয়াছে যে, কাহাকেও আর ভয় নাই, কথা বলিবার সময়ে একটুও সঙ্কুচিত হইল না। সদর্পে আত্মাভিমানে বলিল,—শক্তি থাকে সাহেবকে নামাইয়া দেও।

করালীর কথা নৌকা খানিকে যেন তোলপাড় করিয়া তুলিল। কেহ কোন উত্তর করে না দেখিয়া ভিন্ন কামরা হইতে তৃতীয় ব্যক্তি বাহির হইয়া বলিল,—সাহেবও জানি না, বাঙ্গালীও জানি না, উভয়কেই নৌকা হইতে নামাইব। এই বলিয়া ক্রোধে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া মস্তকের কেশগুচ্ছ ধরিয়া সজোরে করালীকে টানিল।

করালী বলিল—মারিবে, মার; যে রাগের অধীন তাহাকে কিছু না বলাই উচিত। মারিতে ইচ্ছা করিয়াছ, মার, কিন্তু নৌকা হইতে নামিব না।

সাহেবের প্রাণে স্ত্রীলোকের অপমান সহ্য হইল না, আপাদমস্তক কম্পিত হইতে লাগিল--চক্ষু ভেদ করিয়া যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল, হস্তোত্তোলন করিয়া তৃতীয় ব্যক্তির নাসিকার উপরে বল পূর্ব্বক বিরাশির ওজনে এক ঘুষি মারিল।

করালী এ দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইল, মনে মনে বিপদ গণনা করিল, পার হইবার পথে বড়ই বিঘ্ন দেখিতে লাগিল; সাহেবের পা ধরিয়া বলিল,-সাহেব, পায়ে পড়ি, ক্ষমা কর, প্রহারে উপকারের প্রত্যাশা নাই, জোর করিয়া কাহারও নিকট হইতে কার্য্য সিদ্ধির আশা করা যায় না। ক্ষান্ত হও, নচেৎ পারের উপায় নাই।

সাহেব বলিল, পারে আমি যাইব না, এমন নরাধমের নৌকায় আমি পার হইব না, এই বলিয়া সাহেব নৌকা হইতে নামিবার উপক্রম করিল।

এই ঘটনা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঘটিল। ঘুষি মারার পরেই ঐ নৌকা হইতে ইঙ্গিত হইল, অমনি নিকটের নৌকা হইতে সশস্ত্র লোক আসিয়া সাহেব ও করালীকে বাঁধিয়া ফেলিল, এবং নৌকা খুলিয়া দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভগ্ন মস্‌জিদে—অনাথিনী!

অনাথপুরের সেই অরণ্যে একটী প্রাচীন মস্‌জিদ্। মস্‌জিদ্‌টীর তিন দিক জঙ্গলে বেষ্টিত, এক দিকে একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। চতুর্দ্দিকই ঘোরতর জঙ্গল --জঙ্গলে ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্য জন্তুর আবাস। দীর্ঘিকার জল অতি গভীর, নীলবর্ণ, তাহাতে পোষা কুম্ভীর বাস করে। মস্‌জিদে একটী ফকীর থাকে, আর একজন স্ত্রীলোক থাকে। ফকীরের ডাকে জলের কুম্ভীর স্থলে উঠে, স্থলের ব্যাঘ্র জলে নামে। ফকীর দিবসে ভিক্ষায় যায়, রাত্রে মস্‌জিদে আগমন করে। মস্‌জিদ্ নির্জ্জন। বন্য পশু পক্ষীর স্বর ভিন্ন আর সেখানে কোন রব শুনা যায় না। মস্‌জিদ্‌টী অতি প্রাচীন--চুন সুরখি খসিয়া পড়িতেছে, স্থানে স্থানে ইষ্টক ও খসিয়াছে। মস্‌জিদের উপরে অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষ, ভিতরে চর্ম্মচটিকা, চড়ুই, আরসুলা, টিকটিকী গিরগিটীর বাসা। চর্ম্মচটিকার দুর্গন্ধে মস্‌জিদ্ পূর্ণ। মস্‌জিদের ভিতরে দিবসে অতি কষ্টে

আলোক যায়; রাত্রের ত কথা নাই। আজ তায় অমাবস্যার রাত্রি। সন্ধ্যার সময়ে অনাথপুরের নদী ও অরণ্যকে যে আঁধার ঘেরিয়াছে, সেই আঁধার ঘনীভূত হইয়াছে! দিগন্তব্যাপিনী করালময়ী আঁধারের কোলে সেই ভগ্ন, জীর্ণ, শীর্ণ, প্রাচীন মস্‌জিদ্ নিস্তব্ধ ভাবে বিরাজিত। মস্‌জিদের ভিতরে একটী ক্ষীণালোক জ্বলিতেছে—তৈলাভাবে মৃদু দীপ মৃদু মৃদু জ্বলিয়া মস্‌জিদের উদাসীনত্ব, প্রাচীনত্ব, জীর্ণত্ব যেন প্রচার করিতেছে,—যেন বলিতেছে—কালের অনন্ত প্রবাহে সব ভাসিয়া যাইতেছে, আমিও যাই-তেছি। যেন বলিতেছে—যাইবার জন্যই যাহার জন্ম, তাহার আর আস-ক্তির দারুণ মর্ম্মদাহ প্রাণে রহিবে কেন?—তাহার প্রাণ আবার সংসার প্রেমে বাঁধা পড়িবে কেন? যেন বলিতেছে—আমি যাই, তোমরাও চল,—অথবা আমি অগ্রে যাই, তোমরা পশ্চাৎবর্ত্তী হও! যেন বলিতেছে,—রূপ দেখিয়া জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিতে মমতা হইতেছে?—মোহ-মায়ার স্বপ্ন দেখিয়া মোহিত হইয়াছ?—এ মোহ ভাঙ্গিবে—এ মমতার জাল এক দিন ছিঁড়িবে!! ক্ষীণ দীপালোকের নিকটে বসিয়া নীরবে এই জীবন্ত উপদেশ শুনিতেছে—একটী স্ত্রীলোক! স্ত্রীলোকটীর নয়নের কোল ভরা জল—সেই জল অজ্ঞাতসারে বুক ভাসাইয়া বহিতেছে! সে মনে মনে ভাবিতেছে,—বিধি যদি সকলই লইবার জন্য সৃজন করিলেন, তবে এ পোড়া হৃদয়ে আজও আসক্তির অঙ্কুর কেন রহিল?—স্ত্রীলোকটীর পরি-ধেয় বস্ত্র অতি মলিন, অতি জীর্ণ,—শরীর বসন অপেক্ষাও মলিন—মাটীর শরীরে মাটীর আধিপত্য! উজ্জ্বলরূপ অপরিষ্কারে মলিন হইয়া গিয়াছে। শরীরের রূপে বাহিরের ময়লা এক পোঁচ দিয়াছে—আর এক পোঁচ দিয়াছে অন্তরের চিন্তা। দারুণ চিন্তা রূপ ডুবাইতে বড়ই মজবুত। শরীরের কান্তি গিয়াছে, তেজ গিয়াছে, কেবল কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট আছে। চুল বাঁধে না, তেল মাখে না, শরীরের ময়লা পরি-ষ্কার করে না—চক্ষের জল পোঁচে না। মাটীতে বসে, মাটীতেই শোয়। তেল জল ও যত্ন ভিন্ন কেশের যে দশা হয়, তাহাই হইয়াছে, অতি রুক্ষ—তায় মধ্যে মধ্যে জটা ধরিয়াছে। যে এতদূর আসক্তি-শূন্য হইয়াছে—সে ক্ষীণ দীপালোকের ধারে, সেই নিস্তব্ধ অরণ্যের ভগ্ন মস্‌জিদে বসিয়া ভাবিতেছে—"আজও আসক্তি রহিল কেন?—মা সর্ব্বমঙ্গলা নিলেন ত সকলই নিলেন না কেন?—আশা রহিল কেন?

সর্ব্বস্ব হারাইয়াও আমি আমিত্ব শূন্য হইয়া তাঁহাতে ডুবিতে পারিলাম না কেন? ফকীর আশ্রয়দাতা—আমার কত উপকারই সে করেছে, এখানেও স্বার্থ!! পর উপকারেও স্বার্থ! মানুষের স্বার্থের চিন্তা ডোবে না কেন?—মা সর্ব্বমঙ্গলা কি আমার জীবন উপহার লইবেন না?—এ শরীর, এ মন, এ হৃদয় তাঁরই শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিব; হৃদয়ে এই সাধ! এই সাধ কি পূরিবে না?—মায়ের পূজা ছেড়ে মহম্মদে কি আমার মতি যাইবে?—ফকীরের চেষ্টাই কি সফল হইবে?—যে শরীরে হিন্দুর রক্ত প্রবাহিত; সেই দেহে মুসলমানত্ব প্রবেশ করিবে?—যবনের প্রতি ঘৃণা হইতেছে?—না ঘৃণা নহে; যবনান্ন গ্রহণে ত আমি কাতর নহি; কিন্তু স্বধর্ম্ম কেন পরিত্যাগ করিব?—পরিত্যাগ করিব,—অত্যাচারে—প্রহারে—ভয়ে? হিন্দুর শোণিতে কি তেজ নাই—হর গৌরী নামের কি মাহাত্ম্য নাই? মা সর্ব্বমঙ্গলার কি শক্তি নাই?—তা কখনই পারিব না। শরীরের প্রতি কেন আসক্তি থাকিবে, শরীর যায় যাক্। মৃত্যু আসে আসুক। পৃথিবীতে চিরকাল কে থাকিবে?—সব যাইবে। আমিও যাইব। মা সর্ব্বমঙ্গলার চরণে আমাকেও আমি ভাসাইব! মায়ের আশীর্ব্বাদ বক্ষে ধরিয়া আগুনে পুড়িয়া মরিব।"

সেই নিস্তব্ধ ভগ্ন মস্‌জিদে উপবিষ্ট হইয়া সেই দীনা আশা-পূর্ণ বিশ্বাসে, বিশ্বাস পূর্ণ আশাতে ভগবতীর নাম জপ করিতে লাগিল। সাশ্রুনয়নে প্রেম-বিহ্বল ভক্তিতে মা সর্ব্বমঙ্গলার চরণ বন্দনা করিল। রাত্রি গভীর হইতে চলিল, ফকীর তখনও মস্‌জিদে ফেরে নাই। অনাথিনী সনাথিনীর চরণকে বিপদের অবলম্বন করিয়া বসিল।

অনাথিনী স্ত্রীলোকটী কে?—পাঠক তাহা পরে জানিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্বার্থের ছায়া।

ক্ষণকাল পরে সেই নিস্তব্ধ নিবিড় অরণ্য ভেদ করিয়া ফকীর মস্‌জিদে ফিরিয়া আসিল। ফকীর সকল চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়াছে; সে বলিত, সে ভবিষ্যৎ-বক্তা। ভবিষ্যৎবক্তা কি না, তাহা জানি না, কিন্তু অদ্যকার

সকল চক্রান্ত সে বুঝিয়াছে। ফকীরের পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র, গলায় বাসুকীর মালা;—দীর্ঘাকৃতি পুরুষ—মস্তকের কেশ পাকিয়াছে,—পাকিয়া কতক পড়িয়া গিয়াছে, কতক আছে। আকৃতি দীর্ঘ, কিন্তু শরীর বলিষ্ঠ নহে। ফকীর দরজা খুলিয়া মস্‌জিদে প্রবেশ করিল। অনাথিনী পায়ের শব্দেই বুঝিয়াছিল, ফকীর আসিয়াছে; সে ধীরে ধীরে উঠিয়া ফকীরের পাদ-বন্দনা করিল। ফকীর বলিল, আজ কি লোকনাথপুর হইতে কোন লোক এসেছিল?

অতি মৃদুস্বরে অনাথিনী বলিল,—'কিছুই জানি না। একাকিনী সমস্ত দিন মস্‌জিদেই ছিলাম।'

ফকীর।—আর কোন দিন লোক এসেছিল?

অনাথিনীর শরীর সিহরিয়া উঠিল, নির্ভয়ে বলিল,—লোকনাথপুরের রাণীর পরিচারিকা করালী একদিন এসেছিল।

ফকীর।—কেন আসিয়াছিল, তা জান?

অনাথিনী।—জানি। আমার অনুসন্ধান লইতে এসেছিল।

ফকীর।—তোমার কথা তাহারা কেমনে জানিল?

অনাথিনী।—তাহা কিছুই জানি না।

ফকীর।—করালী তোমাকে কি বলিয়াছিল?

অনাথিনী সে কথা বলিবার সময়ে একটু ভাবিল, পরে যা কপালে থাকে ঘটিবে, মনে করিয়া বলিল—"বলিয়াছে আমার—ইচ্ছা হইলে লোকনাথ-পুরের রাণী কৃপাময়ী আমাকে এই স্থান হইতে উদ্ধার করিতে প্রস্তুত আছেন!

ফকীর অবিচলিত গম্ভীর ভাবে পুন বলিল,—তুমি কি বলিলে?

অনাথিনী বলিল, বলিলাম, ইচ্ছা নাই? আমার প্রতি তাঁহার কৃপা হইলে আমি বাঁচিব!

ফকীরের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, বলিল তোমার ইচ্ছা কি?

অনাথিনী।—ইচ্ছা, প্রাণান্তেও মুসলমানের পাণিগ্রহণ করিব না। আমি বুঝিয়াছি, নিঃস্বার্থ ভাবে পৃথিবীর কোন লোকই পরোপকার করিতে পারে না।

ফকীর।—যদি তাহাই বুঝিয়াছ, তবে আবার লোকনাথপুরের রাণীর শরণ লইবে কেন? তাহার হাতেও ত তোমার অমঙ্গল ঘটিতে পারে!

অনাথিনী।—পারে, সেকথা সত্য! কিন্তু সে ভবিষ্যতের কথা। যখন অমঙ্গলের সম্ভাবনা দেখিব, তখন তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিব; এখন তোমার হাত হইতে রক্ষা পাইলেই বাঁচি।

ক্রোধে ফকীরের শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, বলিল, আমার নিকট হইতে তুই যে উপকার পাইয়াছিস্, তাহা কি পরিশোধ করিবি না? যদি না করিস, তবে আবার সেই বিপদে ফেলিব।

অনাথিনী।—তুমি সকলই পার। উপকার করিয়া যে তাহা প্রতিগ্রহণ করিতে চায়, তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। কিন্তু সে কথা আজ থাকুক। এক্ষণ তুমি কি চাও?

ফকীর একটু স্থিরভাবে বলিল,—তুমি এই কোরাণের স্মরণ লও, এই ইচ্ছা; ইহাই চাই।

অনাথিনী।—তাহা প্রাণান্তেও পারিব না। ইহা ভিন্ন আর কি চাও? —আমার শক্তিতে আর যাহা দিবার থাকে, দিব।

ফকীর।—তুমি একাকিনী থাকিবে, ইহা আমার ইচ্ছা নহে, তোমার বিবাহ দিতে চাই।

অনাথিনী।—তাহাও পারিব না। আমার সর্ব্বস্ব তোমাকে দিতে পারি, তবুও ইহা পারি না।

ফকীর।—কেন পারিবে না?

অনাথিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ফকীর, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, সকল কথা তোমাকে বলিব না। যাহাতে সম্মতি দিতে পারিব না, সে কথায় কাজ কি?

ফকীর।—বলপূর্ব্বক তোমার সম্মতি লইব, তুমি কি আমার সহিত বলে পারিবে?

অনাথিনীর চক্ষের জল মাটীতে পড়িল, বলিল, কিছুই করিবার আমার শক্তি নাই। তবে মা সর্ব্বমঙ্গলাকে ডাকিতেছি, তাঁহাকে যদি বৃথাই ডাকা হইয়া থাকে, তবে নয়, অকূল সমুদ্রে ভাসিব। অকূলে ভাসিয়াও নূতন শিক্ষা পাইব। দুঃখ ও কষ্টকে ভয় করিয়া কর্ত্তব্য ভুলিতে পারি না। ভবিষ্যতের অনিষ্টের কথা ভাবিয়া কখনই বিবেক-বিরুদ্ধ কথায় সায় দিতে পারি না।

ফকীর।—তুমি একান্তপক্ষে যদি বিবাহ না কর, তবে যে সর্ব্বস্বের কথা বলিলে, তাহাই আমার নামে লিখিয়া দেও।

অনাথিনী বলিল, আমি দুঃখীর মেয়ে, আমার সর্ব্বস্বের অর্থ টাকা কড়ি নহে, আমার কিছুই নাই ; তোমাকে কি দিব ?

ফকীর।—যদি কিছু থাকে, তবে তাহাই লইব, কিছু না থাকে, পাইব না, সেত আমারই ক্ষতি, তোমার দিতে বাধা কি ?

অনাথিনী।—আচ্ছা আমার যাহা আছে সকলই তোমাকে দিলাম।

ফকীর।—কথায় হইবে না। কোরাণ স্পর্শ করিয়া লিখিয়া দেও।

অনাথিনী কোরাণকে তুচ্ছ করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া কলম ধরিয়া লিখিল —"অনাথপুরের ফকীরের নামে আমার যাহা কিছু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সম্পত্তি আছে, সকলই দিলাম।" লিখিয়া বলিল, কোরাণকে আমি মানি না ; কিন্তু তাহা স্পর্শ না করিলেও আমার প্রতিজ্ঞার অন্যথা হইবে না, ঠিক জানিবে।

ফকীর মৃদু মৃদু হাসিল, বলিল, এই কঠিন প্রতিজ্ঞা কি তুমি প্রতিপালন করিতে পারিবে ?

অনাথিনী।—মা সর্ব্বমঙ্গলার আশীর্ব্বাদে পারিব।

ফকীর।—মনে মনে আপনাকে দরিদ্র ভাবিতেছ, তাই একটুও কষ্ট হইতেছে না ; বোধ হয়, তোমার সম্পত্তির বিষয় জ্ঞাত থাকিলে কখনই এরূপ করিতে না ; কর্ত্তব্যের বিরুদ্ধে মত দিতে, তবুও সম্পত্তি দিতে না।

অনাথিনী।—তোমার যেমন বিশ্বাস তেমনই থাকুক। মা সর্ব্বমঙ্গলা তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন, ইহাই মঙ্গল। তবে আমি এক্ষণ বিদায় হই। তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে ? তবে আমি যাই ?

ফকীর।—তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার। ইচ্ছা হইয়া থাকে, মস্‌জিদ্ পরিত্যাগ করিয়া যাও।

অনাথিনী সজলনেত্রে ফকীরের পানে চাহিল, সে দৃষ্টিতে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইল, চাহিয়া বলিল, সত্যই যাইতে বলিতেছ ?—প্রসন্নচিত্তে বিদায় দিতেছ ?

ফকীর আর কথা না বলিয়া মসজিদের বাহিরে গেল। অনাথিনী ক্ষণকাল মস্‌জিদে বসিয়া ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিল। পরে নির্ভয়ে সেই গাঢ় রজনীতেই মস্‌জিদ হইতে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া বাহির হইল। বাহিরে যাইয়া ফকীরকে আর দেখিল না ; সুতরাং একাকিনী অরণ্যে প্রবেশ করিল। কেহই দেখিল না, দেখিবার লোক তখন সেখানে ছিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আশার গভীর উত্তেজনায়!

গৌরবিনী নির্ভয়ে মস্‌জিদের বাহিরে আসিল। কাহার আদেশ, কে সহায়, তাহা কিছুই বুঝিল না, তবুও এমনি অবস্থা হইল, মস্‌জিদে থাকা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম,—স্বার্থ, প্রবঞ্চনা, চাতুরী, উপকারীর হৃদয়ে এই সকলের আধিপত্য ও বিস্তৃতি দেখিয়া প্রাণ আকুল হইয়াছে, অধর্ম্মের দুর্গ হইতে বলপূর্ব্বক কে যেন অনাথিনীকে বাহির করিল। ক্ষীণ দেহে নবতেজ, নবস্ফূর্ত্তি চমকিতেছে—মলিনতা ঘুচিয়া গিয়াছে—মাথার রুক্ষকেশগুলিও যেন নির্ভয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে—অবলা অনাথিনী বাহিরে নামিয়া গাঢ় অন্ধকারকে আলিঙ্গন করিল। সুপ্ত পৃথিবী আশায় মাতিয়া অনাথিনীর চতুর্দ্দিকে যেন ঘুরিতে লাগিল। হৃদয়ের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে মনে মনে ভাবিল,—আমি কে যে পাপীকে ঘৃণা করিতেছি?—আঁধার গৃহের চির আঁধারে আমি, আমার মনে কেন ঘৃণা হইতেছে? পাপী পাপীকে ঘৃণা করিবে?—আমার দ্বারা যদি একটী পাপীও উদ্ধার হইত, মা সর্ব্বমঙ্গলার শ্রীপাদপদ্মে সহস্র সহস্র কুসুমাঞ্জলি দিতাম! তবে যাইব না! ফকীরের সহিত তবে কি মিলিব, বিবাহ সূত্রে,—পাপসূত্রে! মা সর্ব্বমঙ্গলা জানেন, আমার দ্বারা তাহা হইবে না! পাপে আমি পাপ মিশাইব না—অধর্ম্মে অধর্ম্ম মিলাইব না! আমিই বা মিলাইতে কে? সর্ব্বমঙ্গলার মঙ্গলের রাজ্যে অধর্ম্ম পাপ থাকিবে না। আমি ত তাঁহারই, এ দাসী ত তাঁহারই! আকাশের নক্ষত্র, অরণ্যের বৃক্ষ, তোমরা সাক্ষী—আমি আমার নহি! যে দিন হইতে দৈববাণী শুনিয়াছি, সেই দিন হইতে আমার এ পরাণি তাঁহাকে দিয়াছি;—তিনিই রাখিয়াছেন, তিনিই রাখিবেন, তিনি ভিন্ন সকলই অসার।—"মা, তবে তুই কাছে আয়! অনাথিনীর হৃদয়রতন—জীবন ধন, তুই প্রাণে আয়, পথ দেখাইয়া তুই আমাকে এই আঁধার পার করিয়া লইয়া চল্। মাতৃহীনার মা, তুই আঁধার পার কর্,—তুই মঙ্গলের পথে, শান্তির পথে, ধর্ম্মের পথে লইয়া চল্। অনাথিনী অশ্রুতে বদন ভাসাইয়া, আঁধারকে লক্ষ্য করিয়া, পাগলের ন্যায় এই প্রকারে কত কথা বলিল। পাগলের ন্যায়, মাতাকে কত তিরস্কার

করিল, কত ভর্ৎসনা করিল। পরে যখন বল পাইল, তখন আঁধারের মধ্যে ঝাঁপ দিল। যে আঁধার বন্য ব্যাঘ্র, বন্য হিংস্র-জন্তুতে পূর্ণ, সেই আঁধারে ঝাঁপ দিল।

ফকীর বাহিরে যাইয়া একবার অরণ্যের দিকে চাহিল, আর একবার চাহিল—আপনার হৃদয়ের পানে,—চাহিয়া চাহিয়া থাকিয়া থাকিয়া মনকে জিজ্ঞাসা করিল—এই খানেই কি বাসনার নিবৃত্তি?—এই খানেই কি আশার পরিসমাপ্তি? আমার পক্ষে পরিসমাপ্তি হইতে পারে—দরিদ্র ফকীর অতুল ঐশ্বর্য্য পাইল, ইহাই যথেষ্ট; কিন্তু অন্য সকল সহযোগী কি ইহাতেই সন্তুষ্ট হইবে?—কাফের বধের আয়োজন ত ব্যর্থ হইবার নহে! ধর্ম্মের আদেশ-বলে, ছলে বা কৌশলে কাফেরকে পরাজিত করিতেই হইবে। ধর্ম্মবীর সহযোগীরা কখনই একথার অন্যথা করিবে না; সুতরাং আমি অবিশ্বাসের কার্য্য করিব না। যে ঐশ্বর্য্য শান্তিতে ভোগ করিতে পারিব না সে ঐশ্বর্য্যের মায়ায় কেন বৃথা অবিশ্বাস ও অধর্ম্ম ক্রয় করিব? এই বলিয়া ধীরে ধীরে ফকীর মস্‌জিদে ফিরিয়া আসিল; আসিয়া দেখিল মস্‌জিদ্ শূন্য। দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, বক্ষে করাঘাত করিল, অদৃষ্টের নিন্দা করিল। এ সকল করিয়াও দারুণ হৃদয়ের জ্বালা নিবৃত্তি হইল না,—দুঃখে ও নিরাশায় হৃদয়ে আরো আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বৃদ্ধের শরীরে তেজ সঞ্চারিত হইল, বীর্য্য উদ্দীপিত হইল। মুসলমানের মস্তিষ্কে ক্রোধ অধিকার বিস্তার করিল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। ফকীর বিষাদপূর্ণ ক্রোধে মস্‌জিদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে তিনবার হুঙ্কার করিল। সে হুঙ্কারে নিস্তব্ধ অরণ্য প্রতিধ্বনিত হইল—বৃক্ষে বৃক্ষে সে ভীষণ হুঙ্কার শব্দিত হইল—পশু-পক্ষী সশঙ্কিত হইয়া জাগিল। হুঙ্কারের পর মুহূর্ত্তে চতুর্দ্দিক হইতে অস্ত্রধারী মুসলমান সম্প্রদায় পঙ্গপালের ন্যায় অরণ্য বেষ্টন করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জটিল পথে জটিল হৃদয়।

আরোহীরা যখন নৌকা খুলিয়া দিল, তখন পথিকেরা বড়ই বিপদ গণনা করিল; সাহেব বুঝিল, কাজটী বড় ভাল হয় নাই। সাহেব আপন

ক্রটী বুঝিয়া আরোহীদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল, বলিল,—তোমাদের পায়ের জুতা আমার মাথায় ছোঁয়াও, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

একজন আরোহী বলিল—পাষণ্ড, কি করিয়াছিস্, এই দ্যাখ্? বলিয়া আহত ব্যক্তিকে ধরিয়া দেখাইল।

সাহেব বলিল,—অন্যায় করিয়া অধর্ম্ম কিনিয়াছি, পাপের ফল ঈশ্বরের নিকট পাইব; তোমাদের পায়ে পড়ি, পার করিয়া দেও, অপরাধীর অপরাধ মার্জ্জনা কর।

অন্য আরোহী সাহেবের সম্মুখীন হইয়া বলিল,—যে ক্ষমা চায়, তাকে ক্ষমা করাই ধর্ম্ম, সুতরাং ক্ষমা করিব। এ দস্যুর নৌকা নহে, এ পাষণ্ডের নৌকা নহে। এই বলিয়া অনাথপুরের ঘাটে নৌকা ভিড়াইতে মাজীদিগেকে বলিল।

প্রথম আরোহী বলিল, তা কখনই হইবে না, প্রতিশোধ না তুলিয়া কখনই পাষণ্ডকে ছাড়িব না; যা হবার, হবে।

কথায় কথায় দুই আরোহীর মধ্যে ক্ষুদ্র বিবাদ বাধিল। প্রথমে মুখামুখী, পরে হাতাহাতি পর্য্যন্ত হইল। নৌকার সমস্ত আরোহী দুইদলে বিভক্ত হইল। একদল পথিকদিগকে ক্ষমা করিয়া পারে পৌঁছাইয়া দিতে চাহে; আর দল তাহা দিতে চাহে না, প্রতিশোধ তুলিতে চায়। দুই দলে বিষম বিবাদ বাধিল।

সাহেব সুফলের আশা করিল। স্বপক্ষ দলের লোকেরা সাহেবের হাতের বন্ধন খুলিয়া দিল। হস্তের বন্ধন মুক্ত হইয়া সাহের আপনার দলে যোগ দিল। যোগ দিয়া পলাসির সমরের ন্যায় এ যুদ্ধে জয়ী হইল। সাহেবের দল জয়ী হইল, নৌকার বিপক্ষ দলের অনেক লোক আহত হইল, কেহ জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বাঁচাইল, কেহ বা মৃতের ন্যায় নৌকা-তলে পড়িয়া প্রাণ রাখিল। মাজীরা জয়ী দলের কথা রাখিতে বাধ্য হইল, ধীরে ধীরে নৌকা বাহিয়া অনাথপুরের পারঘাটায় নৌকা ভিড়াইল। সাহেব ও করালী আরোহীদিগকে ধন্যবাদ দিয়া তীরে নামিল।

তীরে অবতরণ করিয়া সাহেবের হৃদয়ে একটু চিন্তা উঠিল, কারণ পথ অপরিচিত, চতুর্দ্দিক ঘোর আঁধারে ঘেরা। সাহেব জানিত, লক্ষ স্থানে সেই রাত্রে না গেলে চলিবে না, বিষম বিপদ ঘটিবে, সুতরাং চিন্তাতে

একটু ভয় মিশ্রিত হইল। চিন্তাকাতর, ভয়বিহ্বল সাহেবের মুখ মলিন হইল, কিন্তু সে মলিনতা করালী দেখিতে পাইল না। তীরে নামিয়া করালী সাহেবকে বলিল,—তুমি কোন্ পথে যাইবে ?

সাহেব।—আমি পথ চিনি না।

করালী।—তুমি কোথায় যাইবে ?

সাহেব।—আমি অনাথপুরের অরণ্যে যাইব।

করালীর প্রাণ একটু চঞ্চল হইল, বলিল, অরণ্যে কোথায় যাইবে ?—সেখানে কি লোক আছে ?

সাহেব।—আমি সংবাদ পাইয়াছি, সেখানে লোক আছে।

করালী।—কত লোক আছে ?

সাহেব।—মাত্র দুইজন ; একটী স্ত্রীলোক, একটী পুরুষ।

করালীর বিস্ময় ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল, বলিল, তুমি সেখানে কেন যাইবে ? সে অরণ্যে বড় বাঘের ভয়, তুমি এই আঁধার রাত্রে সেখানে যাইবে কেন ?

সাহেব বলিল,—যাইবু, উদ্দেশ্য আছে, কর্ত্তব্য আছে ! আমি বাঘের ভয় করি না। তোমার দ্বারা আজ অনেক উপকার পাইয়াছি, আর এক-বার পথ দেখাইয়া উপকৃত কর।

করালী কি ভাবিয়া পথ দেখাইতে অস্বীকার করিল, সরলভাবে বলিল,—সাহেব, তুমি সেখানে কি জন্য যাইবে না বলিলে আমি তোমাকে পথ দেখাইব না। তোমার এ উপকার আমার দ্বারা হইবে না।

সাহেবের মনে ও একটু সন্দেহ হইল, সাহেব আপন উদ্দেশ্য গোপনেই রাখিল। সুতরাং করালী বিদায় লইয়া আপন পথে চলিল। কপটতাকে আশ্রয় করিয়া সাহেব বিষম বিভ্রাটে পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গগনস্পর্শী ভীষণ হুঙ্কার।

করালী চুপি চুপি অগ্রসর হইয়া আঁধারের কোলের একটী ঝোপের ভিতরে হঠাৎ লুকাইল। লুকাইয়া থাকিয়া বুঝিল, পায়ের শব্দ লক্ষ্য

করিয়া সাহেবও সেই পথেই আসিতেছে। যখন করালী চলিতেছিল, তখন অন্যের পদশব্দ শ্রুত হইতেছিল না, যখন নিজ পায়ের শব্দ থামিল, তখন অন্য পদশব্দ স্পষ্ট শ্রুত হইল। কিন্তু সে শব্দও সহসা নিবিয়া গেল। আর সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই;—সে শব্দও নাই, সে সাহেবের হাটুনিও নাই। করালীও থামিল, কাজেই একটু পরে সাহেবের গতিও রোধ হইল। করালী সকল বুঝিল। সাহেবের সাহস পরীক্ষা করিতে করালীর অত্যন্ত ইচ্ছা হইল; তখনি টিক্ টিক্ করিয়া দুইবার শব্দ করিল। শব্দ করিবামাত্র পার্শ্বের জঙ্গল হইতে দুইজন লোক মশাল জ্বালিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

করালী গম্ভীর ভাবে আদেশ করিল—ঐ ডাকুর শিরচ্ছেদন কর্, দুরভিসন্ধি করিয়া আমার সঙ্গ ধরিয়া পশ্চাতে আসিয়াছে।

লাঠিয়ালেরা হুকুম পাইবামাত্র ঢাল সুল্‌পি লইয়া সাহেবের নিকটবর্ত্তী হইল।

সাহেব নির্ভয়ে বলিল, কি চাও?

লাঠিয়ালেরা গর্জ্জিয়া বলিল, তোর মাথা কাট্‌ব, পাজি, কোন্ সাহসে এই অরণ্যে ঢুকিয়াছিস্?—আজ কাহারও নিস্তার নাই—কালীমায়ীর প্রসাদে আজ ম্লেচ্ছের বংশ ধ্বংশ কর্‌ব। এই বলিয়া উভয়ে অস্ত্রোত্তোলন করিয়া সাহেবের উপরে পড়িল।

সাহেব বলিল, ভীরু, এতই কি কাপুরুষ আমি? এই বলিয়া জামার আস্তিন গুটাইয়া হস্তদ্বারা উভয়ের বেগরক্ষা করিয়া উভয়কে সাপটিয়া ধরিয়া অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া নিমেষের মধ্যে হাটুরতলে ফেলিল; পরে বলিল,—এখনই প্রাণ লইতাম; কিন্তু কি কাজ, হিন্দুর সহিত আমার বিবাদ নাই, মুসলমান ধ্বংশই ব্রত; হিন্দুর উদ্ধারই জীবনের কর্ত্তব্য!

করালী নির্ব্বাক হইয়া সাহেবের বল, সাহস, দয়া, ক্ষমাগুণ সকলই পরীক্ষা করিল। করালী সাহেবের নিকট যাইয়া বলিল, সাহেব, মিনতি করি, তুমি রাত্রে এজঙ্গলে কি করিবে, বল?

সাহেব বলিল, তোমাকে বলিলে তুমি যদি বিশ্বাসঘাতকতা কর?

করালী।—স্বরূপে বলিতেছি, তাহা করিব না, প্রাণ গেলেও বিশ্বাসঘাতকতা করিবনা।

সাহেব।—এদেশী লোকেরা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারে না; তুমি যে পারিবে, বিশ্বাস কি? এ দেশী লোকেরা সাধারণত প্রতারক।

করালীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, বলিল, সাহেব, সাবধান হইয়া কথা বলিও, সমগ্র জাতিকে প্রতারক বলিবার তোমার কি অধিকার?

সাহেব।—যাহা সত্য, তাহা বলিবই, ভয় কাহার?—অবলার ভয়ে সত্য গোপন করিব?—প্রতারণা বাঙ্গালীর চরিত্রের ভূষণ, বাঙ্গালী নরাধম জাতি। তুমিও সেই জাতির একজন, তোমাকে বিশ্বাস কি?

ক্রোধে করালীর সর্ব্ব শরীর যেন জ্বলিতে লাগিল, ঘৃণা, আত্মগ্লানিতে হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল, উচ্চরবে বলিল, সাহেব অপেক্ষাও বাঙ্গালী প্রতারক? প্রচ্ছন্নভাবে গুপ্তবেশে এদেশে প্রবেশ করেছিস্, কোন্ মুখে তুই এই কথা বলিলি?—দেশের প্রতি আমার মমতা থাকে, এখনই তোর প্রতিশোধ দিব। এই বলিয়া করালী আবার ইঙ্গিত করিল। ইঙ্গিত করিবা মাত্র চতুর্দ্দিক হইতে দেখিতে দেখিতে অনেক লাঠিয়াল করালীর সম্মুখে উপস্থিত হইল।

করালী বলিল, এই যে ম্লেচ্ছকে দেখিতেছ, ইহাকে অগ্রে বাঁধিয়া প্রহার কর, পরে অরণ্যের চতুর্দ্দিকে যাইয়া অরণ্যের মধ্যে কেহ প্রবেশ না করিতে পারে, তাহার উপায় বিধান কর। রাণী কৃপাময়ীর এই আজ্ঞা।

লাঠিয়ালেরা বলিল, বনের সর্ব্বত্রই লোক রহিয়াছে, কোন আশঙ্কা নাই। এই বলিয়া সাহেবকে ধরিতে অগ্রসর হইল। সাহেব এবার নিরূপায় হইল। এত লোকের সহিত বৃথা যুদ্ধে জয়ী হইবার আশা ছিল না, সুতরাং কোন চেষ্টাই করিল না। লাঠিয়ালেরা সাহেবকে দৃঢ়তর রূপে বন্ধন করিতে লাগিল। এই সময়ে অরণ্যভেদ করিয়া ফকীরের ভীষণ হুঙ্কার আকাশে উঠিল। সে হুঙ্কারে করালীর প্রাণ চমকিল, লাঠিয়ালশ্রেণীর শরীর কম্পিত হইল।

করালী সাহেবের হাত ধরিল, বলিল, সাহেব, তোমাকে মুক্ত করিয়া দিতেছি, তুমি আমার পক্ষে থাকিবে?

সাহেব বলিল,—তোমার আবার পক্ষ কি?

করালী নির্ভয়ে বলিল, এই যে দল দেখিতেছ, রাণী কৃপাময়ীর আদেশে, মুসলমানের হস্ত হইতে হিন্দুর মেয়েকে উদ্ধার করিতে, ইহারা এই অরণ্যে আসিয়াছে;—আমার অধীনে থাকিয়া ইহারা কার্য্য করিবে। তুমি আমার পক্ষে থাকিবে?

সাহেব বুঝিল, উভয়ের একই উদ্দেশ্য। সাহেব কৃতজ্ঞ হৃদয়ে করা-

নীকে বার বার ধন্যবাদ দিল, পরে বলিল, আমি তোমারই পক্ষে। স্বরূপে বলিতেছি, আমি তোমারই পক্ষে।

এই কথা বলা হইতে না হইতে করালী বুঝিতে পারিল, মুসলমানেরা অরণ্য বেষ্টন করিয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিপদ—ঘনীভূত।

মুসলমানেরা অরণ্য বেষ্টন করিয়া বুঝিল, অরণ্যে অসংখ্য লাঠিয়াল প্রবেশ করিয়াছে। কেমন করিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহা তাহারা ভাবিল না, ভাবিতে সময় পাইল না। না পাউক, তাহারা বুঝিল, আজ আর সকলের দেহে প্রাণ থাকিবে না, বুঝিল—কাফেরের রক্তে আজ অনেক মুসলমানের রক্ত মিশিবে। যে সময়ের কথা, ও যে স্থানের কথা বলা হইতেছে, সে সময়ে সেস্থানে মুসলমানদিগের মধ্যে ভয়ানক বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছিল। রিপুর উত্তেজনা ও ইন্দ্রিয়ের তাড়ণা ছিল, কিন্তু মনে ধর্ম্মের বল, শরীরে তেজ বা বীর্য্য ছিল না। বিলাসিতার চরম অবস্থায় ইংরাজগণ কর্ত্তৃক মুসলমানেরা পরাজিত হইয়াছিল; পরাজিত হইয়াও সুখস্পৃহা কমেনাই—রিপু-চাঞ্চল্য বিদূরিত হয় নাই। মুসলমান বংশ সিরাজের চরিত্রের ছায়ায় যেন প্রতিবিম্বিত ও অনুপ্রাণিত রহিয়াছে। বিলাস যেথানে, সেখানে বল বীর্য্য থাকিতে পারে না,—ধর্ম্মহীনতা যেথানে, সেখানে সাহস ও ধৈর্য্য থাকিতে পারে না। মুসলমানদিগের মধ্যে তখন ভীরুতা, ও দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিয়াছিল। ভীরুতাতে ছিল প্রবঞ্চনা, দুর্ব্বলতাতে ছিল রিপুর উত্তেজনা। তাহারা দেশকে ভীত রাখিত—দস্যুবৃত্তি করিয়া; তাহারা পরাক্রম দেখাইত—দুর্ব্বল সতীর সতীত্ব অপহরণ করিয়া। বাঙ্গালার সেই এক দিন ছিল। মন্দ বলি, আর যাহা বলি, ইংরাজশাসিত বাঙ্গালায় আজ আর এক দিন উপস্থিত। সে কথা এখন থাকুক। মানুষ থাকে, বুঝিবে; পশু থাকে, কেবলই পরনিন্দা করিবে; ভালকেও ভাল বলিবে না। অরণ্য বেষ্টন করিয়া মুসলমানেরা বড়ই বিপদ গণনা করিল। একটী রমণীর জন্য এত প্রাণ যাইবে, একটী কাফেরের জন্য এত মুসলমান

ধ্বংশ হইবে, এই চিন্তা উপস্থিত হইল। চিন্তা হইল—জাতিও যাইবে, পেটও ভরিবে না; কষ্ট যথেষ্ট হইবে, কিন্তু সুখ ঘটিবে না। বিলাস-প্রিয় জাতির চিন্তায় ভীরুতা মিশিল, ভীরুতাতে কাপুরুষতা একত্রিত হইল। মুসলমানেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া অরণ্যে আগুন লাগাইয়া দিল। চৈত্র মাসের অরণ্য—অতি শুষ্ক। বৃক্ষের লতা শুষ্ক হইয়া মাটীতে পড়িয়া স্তুপাকার হইয়া রহিয়াছে;—কত লতা, কত তৃণ, কত ঘাস, যাহা বর্ষা-কালে জন্মিয়াছিল, তাহা এক্ষণ মরিয়া শুকাইয়া রহিয়াছে। সেই সকলে আগুন লাগিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে অরণ্যের ঘনীভূত আঁধারকে ঘনীভূত আলোক পরাজয় করিল,—বন আলোকিত হইল। বনের পশু পক্ষীর প্রাণ আতঙ্কে উড়িয়া গেল, আত্মরক্ষার জন্য সকলে স্থানান্তরে ছুটিতে লাগিল। ছুটিতে ছুটিতে জীব জন্তু দিশে-হারা হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আগুনে পড়িতে লাগিল। ব্যাঘ্র ও হরিণ এক পথে ছুটিল—সর্প ও নকুল এক গর্ত্তেই ঢুকিতে লাগিল।

অরণ্য ভরা মানুষ—আর অরণ্য ভরা আলোক। দাবাগ্নিতে বায়ু ক্রমেই উষ্ণ হইয়া ভয়ে যেন আকাশে উঠিতে লাগিল,—দূরের বায়ু আসিয়া অমনি সখাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। শুষ্ক পত্র পুড়িল, ছোট ছোট শুষ্ক বৃক্ষও পুড়িল, পরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষও পুড়িতে আরম্ভ হইল। কত কালের কত পদার্থ পুড়িয়া ভস্মীভূত হইল,—কত কীট পুড়িল, কত পতঙ্গ পুড়িল, কত পক্ষী পুড়িল, কত পশু পলাইতে না পরিয়া আগুনে ঝাঁপ দিয়া মরিল। সে ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া হিন্দু লাঠিয়াল শ্রেণীর প্রাণ উড়িয়া গেল। যে যে দিকে সুবিধা পাইল, পলায়ন করিল। ধানক্ষেতের হাঁটু জলে নামিয়া অনেকে প্রাণ বাঁচাইল। বোরোধান গাছ তখন গর্ভ-বতী, সে সকলের দুর্দ্দশার আর কিছু বাকী থাকিল না; পদ-মর্দ্দনে অনেক গাছ মরিল। মুসলমানেরা আগুন দিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, সুতরাং তাহাদের কোন অনিষ্ট হইল না।
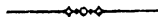
নবম পরিচ্ছেদ।

পাষাণ গলিল।

গভীর গর্জ্জন করিয়া ফকীর যখন বুঝিল, স্বপক্ষের লোকেরা অরণ্য বেষ্টন করিয়াছে, তখন আপনি 'মক্কিল আছানের রূপ' ধরিয়া, প্রজ্জ্বলিত দীপ হাতে লইয়া অরণ্যে বাহির হইল। মস্‌জিদ্‌ হইতে বাহির হইলেই তিন দিকে সেই ঘনীভূত অরণ্য, এক দিকে সেই প্রাচীন দীঘী। মস্‌জিদ্‌ হইতে অরণ্যের ভিতরে কোন দিকেই পথ নাই। ফকীর অরণ্য ভেদ করিয়া যাতায়াত করিত বটে—কিন্তু এমনি সঙ্কেতে আসিত যে, কোন প্রকার পদ-চিহ্ন পড়িত না। নূতন লোক মস্‌জিদে আসিলেই অরণ্যে পথ পড়িত। অনাথিনী আর কখনও অরণ্যে যায় নাই। সঙ্কেতও জানিত না, সুতরাং যে দিকে চলিল, সেই দিকেই পথ পড়িল। ছোট ছোট ঘাসের মস্তক ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, পরিষ্কার পথ করিয়া দিল। গাঢ় অন্ধকার, অচেনা পথ; বৃক্ষের পাতায় পাতায়, ডালে ডালে, কণ্টকে কণ্টকে, ঠেসাঠেসি হইয়া ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে। পদে পদে সেই সকল অনাথিনীর শরীরে আঘাত করিতে লাগিল, তবু উৎসাহে মাতিয়া অনাথিনী অতি দ্রুতবেগে ছুটিল। কণ্টক বিঁধিয়া ও হুছটের আঘাতে শরীরের অনেক স্থান হইতে রক্ত বাহির হইল। পায়ের নীচে কাঁটা বিঁধিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, শরীরের স্থানে স্থানে চিড়িয়া রক্ত বাহির হইল। কিন্তু কোন দিকেই অনাথিনীর মন নাই। সর্ব্ব শরীরে রক্তের প্রবাহ ছুটিল! মস্তকের রুক্ষ চুল এলাইয়া পড়িয়াছে—গভীর মুখ, সর্ব্ব শরীর রক্তময়! পরিধেয় বস্ত্র ছিড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গিয়াছে,—যাহা আছে, তাহাও রক্তময়। রুক্ষকেশা, রক্তময়ী, বিবসনা কোথায় চলিয়াছে?—কোন্‌ আশ্রয়ে? আশ্রয় কোথায়? —সহায় কে?—নিজে সে কিছুই জানে না। তবুও দ্রুতবেগে ছুটিতেছে। এমন দ্রুত যাইতেছে যে, বন্য জন্তু সকল ভয়ে পলাইতেছে, অরণ্যের বৃক্ষ সকলের সকল প্রকার চেষ্টা পরাস্ত হইল, কোন রকমেই অনাথিনীর গতি-রোধ হইল না। অরণ্যের যে দিকে নদী, সেই দিকে অরণ্যের পরিসর কিছু অল্প। সৌভাগ্যক্রমে অনাথিনী সেই দিকেই গিয়াছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে, অনাথিনী বারো আনা আন্দাজ অরণ্য উত্তীর্ণ হইয়াছে;

এমন সময়ে, সম্মুখে, কিঞ্চিৎ দূরে একটী ক্ষীণ আলো দেখা গেল। আলো ?—না সুখের স্বপ্ন। অনাথিনীর সর্ব্ব শরীর হইতে ঘর্ম্ম বাহির হইতেছে—আর সেই ঘর্ম্ম রক্তের সহিত মিসিয়া সর্ব্ব শরীরকে প্লাবিত করিয়াছে। সে মূর্ত্তি, দুঃখের জ্বলন্ত ছবি;—সে মূর্ত্তি ধর্ম্মের জীবন্ত প্রতিকৃতি! আলো দেখিয়া অনাথিনী ইষ্টদেবতাকে আবার স্মরণ করিল—চক্ষু হইতে টস্‌টস্‌ করিয়া কয়েক ফোটা জল গড়াইয়া মাটিতে পড়িল! ইহারই মধ্যে হঠাৎ পশ্চাৎ দিক হইতে, আর একটি আলোক-রেখা বৃক্ষের ভিতর দিয়া আসিল। আলোকের সহিত পায়ের শব্দ পৌঁছিল। পায়ের শব্দে বুঝা গেল, কে যেন ছুটিয়া আসিতেছে, অনাথিনী ফিরিয়া দেখিল, কে যেন তাহাকেই ধরিতে আসিতেছে। মনে কোন প্রকার ভয় হইল না। ইচ্ছা করিলে অনাথিনী ছুটিয়া সম্মুখের আলোক পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিত, কিন্তু সে ইচ্ছা হইল না, নির্ভয়ে সেই থানে দাঁড়াইল! সে সাহস কথায় চিত্রিত হয় না, সে মূর্ত্তি তুলিকায়ও অঙ্কিত হয় না! অনাথিনী পশ্চাতে দৃষ্টি করিয়া দেখিল, ফকীর উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছে। ফকীর আর সে ফকীর নাই—উগ্রমূর্ত্তি—ক্রোধাবতার—শরীর ফাটিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছে। অনাথিনী দূর হইতে বলিল,—"তুমি আসিতেছ, আমি দাঁড়ায়েছি, ভয় নাই, এস, পলাইব না। উপকারী বন্ধুর ভয় কি? এস, কখনই পলাইব না।" স্নিগ্ধ স্বর—বিষাদমাখা ভাঙ্গা স্বর,—পরিশ্রান্ত দুঃখিনীর করুণ স্বর, ফকীরের ক্রোধাগুনে যেন জল নিক্ষেপ করিল। অনাথিনীর নির্ভরের কথা, "এস, পলাইব না;" ফকীরের প্রাণে বাজিল। যে প্রাণে গরল, সে প্রাণে সুধার ছিট পড়িল। ফকীর আপনাকে মনে মনে ধিক্কার দিল, ভাবিল, ছি, কেমনে ইহার জন্য হৃদয়ে গরল ধারণ করিতেছি? মুহূর্ত্তের মধ্যে এই ভাব হইল। যখন পরিবর্ত্তন হয়, এমনি করিয়াই হয়। এ পরিবর্ত্তন দুষ্ট প্রবৃত্তির প্রাণে সহিবে কেন? তাহারা যেন জ্বলিয়া উঠিল;—রিপুগুলি ক্ষেপিয়া উঠিল! বেগ কমিল, কিন্তু তবুও উন্মত্ত ফকীর আপনার ক্রোধের লাগাম টানিয়া একেবারে থামাইতে পারিল না। নিবিতে নিবিতে অগ্নিখণ্ড অনাথিনীর কাছে আসিল। আসিয়া পাগলের ন্যায় অনাথিনীর হাত সজোরে ধরিল, বলিল—পাপীয়সি, কোন্ সাহসে চলিয়াছিস? এত দিন পরে আজই তোর সর্ব্বনাশ করিব।

বৃদ্ধ ফকীর দূর হইতে ভাল দেখিতে পায় নাই, নিকটে আসিয়া হাত ধরিয়া এই কথা বলিল, আর অনাথিনীর সেই বেশ, আর সেই দুঃখমাখা রূপ দেখিল।

মানুষের শরীরে বিধাতা রক্ত মাংস দিয়াছেন, আবার হৃদয়ে প্রেমও দিয়াছেন,—রিপু দিয়াছেন, আবার দয়া প্রভৃতি বৃত্তিও দিয়াছেন। সে চিত্র দেখিয়া ফকীরের শরীরের রক্ত মাংস জল হইয়া গেল, হৃদয়-শক্তি প্রবল হইয়া উঠিল। দেখিল—অনাথিনীর সর্ব্বশরীর রক্তে ও ঘর্ম্মে প্লাবিত, কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, পা ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে! গা চিড়িয়া রক্ত পড়িতেছে! কি দৃশ্য! ফকীরের পাষাণ হৃদয় একেবারে গলিয়া গেল। চক্ষু হইতে সহানুভূতি-ব্যঞ্জক অশ্রু ধারাবাহী হইয়া পড়িতে লাগিল।

অনাথিনীর হস্ত যখন ফকীর সজোরে ধরিল, তখন অনাথিনীর জ্ঞান আর রহিল না, অচেতন হইয়া ভূতলশায়িনী হইয়া পড়িল।

ফকীর ইত্যবসরে দেখিল, পশ্চাৎ দিক হইতে আগুন হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আর ভাবিবার সময় না পাইয়া, অনাথিনীকে ক্রোড়ে করিয়া, সম্মুখের আলোকের দিকে চলিল। চক্ষু হইতে অলক্ষিত ভাবে টস্‌টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

অকূলের তরী।

সেই আলোক একখানি ক্ষুদ্র নৌকা হইতে আসিতেছিল। ধান্-ক্ষেতের মধ্যে একখানি পান্সী নৌকাতে দীপ জ্বলিতেছিল। পান্সী নৌকা কোথা হইতে কখন আসিয়াছে, তাহাতে কে আছে, এসকল আর ফকীর ভাবিতে সময় পাইল না। ক্লান্ত কলেবরে, অশ্রু-প্লাবিত বুকে অনাথিনীকে পুরিয়া দ্রুতবেগে সেই নৌকায় উঠিল। নৌকার মাঝীগুলি মুসলমান, ফকীরের বেশ দেখিয়া সেলাম করিয়া বলিল, আপনারা কোথায় যাইবেন?

ফকীরের তখন ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছিল, শ্বাসভাঙ্গা স্বরে বলিল, কোথাও যাইব না, বনে আগুন লাগিয়াছে, তাই তোমাদের নৌকায় প্রাণ

বাঁচাইতে আসিয়াছি। কোন ভয় নাই, স্থান দেও; আমি এই মস্জিদের ফকীর।

মাজীরা ভয়ে জড়সড় হইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া ফকীরকে স্থান দিল।

দেখিতে দেখিতে অনেক লাঠিয়াল প্রাণ বাঁচাইতে ধান ক্ষেতে নামিল। অরণ্যের পশ্চিম দিক অগ্রে পূর্ণ হইল, ক্রমে ক্রমে নৌকা পর্য্যন্ত লোকের ভিড় পৌছিল। নৌকাখানি পূর্ব্ব কোণে ছিল। লোকের গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসিতে, মৃদু স্রোতের ন্যায় লোকপ্রবাহ পূর্ব্বকোণে পৌছিল। সেই ভিড়ের মধ্যেও একজনের জন্য বিস্তৃত স্থান রহিয়াছে। করালী সেই ভিড়ের মধ্যে রাজরাণীর ন্যায় রহিয়াছে, সাহেব পার্শ্বে। এই লোকপ্রবাহের নীচে জল প্রবাহ, উপরে অগ্নি-প্রবাহ। এতলোকের সম্মুখে অরণ্য পুড়িয়া ভস্ম হইতে লাগিল; কেহ বাঁচাইল না। কত কালের উৎপন্ন কত কত বৃক্ষ পুড়িয়া অঙ্গার হইতে লাগিল!

নৌকার মৃত্তিকানির্ম্মিত ক্ষুদ্র দীপ ক্রমে নিবু নিবু বোধ হইতে লাগিল। অরণ্যের বড় বড় বৃক্ষে যখন আগুন লাগিয়া উঠিল, তখন সকল আঁধার বিধৌত হইল। দুর্জ্জয় আলোকরাশি ঘনীভূত আঁধারকে ধৌত করিল —সকল পরিষ্কার হইল,—সকল দিক ফর্‌সা হইয়া উঠিল। সেই আলোক-সাগরের নিকট ক্ষুদ্র দীপালোক আরো ক্ষীণ হইল। চতুর্দ্দিক এমনই হইল, ঠিক যেন দিবসের আলো। সে আলোকে মানুষ মানুষকে চিনিতে পারিল। ফকীর একটু সুস্থ হইয়া দেখিল, নৌকার চতুর্দ্দিকে লোকারণ্য। দেখিল লোকের ভিড়ের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক—অপূর্ব্ব বেশে রহিয়াছে। ফকীর বুঝিল, যাহারা মস্‌জিদ্ লুণ্ঠন করিয়া অনাথিনীকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিল, এ তাহাদেরই দল। ফকীরের হৃদয়ে তখন দয়াস্রোত প্রবাহিত। সে দয়ার নিকট ক্রোধের উদ্দীপনা পরাস্ত হইয়াছে। যে দয়ার অনুরোধে বিপদসাগর হইতে অনাথিনীকে উদ্ধার করিয়াছিল, সেই দয়ার উত্তেজনা উপস্থিত হইয়াছে। সেই একদিন, আর এই একদিন। স্মৃতিপটে সে আলেখ্য আর এ আলেখ্য মিলিল। ঘনীভূত অরণ্যেরধারে আশ্রয়-হীনার সেই জ্যোতি-ভাঙ্গা-রূপ, আর অদ্যকার এই রক্তময় শরীরের বেশ, ফকীরের হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব উপস্থিত করিল। ফকীর স্নেহভরে করালীকে আসিতে ইঙ্গিত করিল, করালী নির্ভয়ে নৌকার ধারে আসিল। ফকীর অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলিয়া বলিল, 'তুমি ধন্য, কারণ তুমি ভগ্নীর উদ্ধারের

জন্য যথেষ্ট করিয়াছ।' করালী চাহিয়া দেখিল, এক অপূর্ব্ব জ্যোতি পাষাণ-হৃদয় ফকীরের সে আলোক-বিধৌত-অশ্রুর ভিতর দিয়া বাহির হইতেছে। দেখিল, ফকীর উপবিষ্ট, তাহার ক্রোড়ে রক্তপ্লাবিত একটী রমণী—অচেতন অবস্থায় শায়িত রহিয়াছে। করালী তাঁহাকে চিনিতে পারিল, এ দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার প্রাণও অস্থির হইল, অজ্ঞাতসারে তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু পড়িতে লাগিল। ফকীর বলিল,—তুমি যথেষ্ট করিয়াছ; পুরুষে যাহা পারে না, তুমি সামান্য স্ত্রীলোক হইয়াও তাহা করিয়াছ! এক ভগ্নীর জন্য তুমি জীবনতুল্য মান সম্ভ্রমকে ও তুচ্ছ করিয়া বিসর্জ্জন দিয়াছ! তোমার নাম চিরকাল ভগ্নি-স্নেহের আদর্শ হইয়া থাকিবে! আপনার সুখকে এমনি করিয়া পরের জন্য উৎসর্গ করিতে অতি অল্প লোকেই পারে! আমি অতি নরাধম, অতি জঘন্য চরিত্রের লোক! আমি এই বৃদ্ধবয়সে রিপুর উত্তেজনায়, ধর্ম্মের নামে যে পাপ ক্রয় করিয়াছি, তাহার আর প্রায়-শ্চিত্ত নাই। আমি চিরকালের জন্য ডুবিয়াছি! তোমার চরিত্রের সংস্পর্শে আমার উদ্ধারের কি উপায় হইবে? ভগ্নিকুলে তুমিই ধন্য, তুমি করালী নহ, তুমি কুলকামিনী। এ জীবনে ওনাম আর ধরিও না। আবার বলিল,—রাণী কৃপাময়ী ও ধন্য। লোকনাথপুরের অধিশ্বরী হইবার তিনিই উপযুক্ত পাত্রী; লোকের কল্যাণের জন্য এমন উদারভাব আর কোথাও দেখি নাই। স্বামীর ইচ্ছা পূর্ণ করিবার মানসে কৃপাময়ী যে ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সমস্ত পূর্ব্ব অপরাধ অপনীত হই-য়াছে; কৃপাময়ী স্ত্রীকুলে ধন্য আমি সকল জানিয়াছি, সকল বুঝি-য়াছি। বুঝিয়াছি, দৈব বিড়ম্বনায় আমার বুদ্ধি, ধর্ম্ম কর্ম্ম, জ্ঞান, লোপ পাইয়াছিল, তাই এমন সোণার পাখীকে আমার হৃদয় কারাগারে আবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম। আমি নরাধম—সুলোচনা স্বর্গের পরী, আকাশের চাঁদ—সতী কুলের আদর্শ? এমন জিনিষকে আমি কোন্ প্রাণে ডুবাইতে চাহিয়াছিলাম? গোরাচাঁদ অপেক্ষাও আমি নরাধম! আর রাখিব না—তোমার জিনিষ তুমিই গ্রহণ কর! তোমার জীবন তোমাকেই দিব, তোমার ধন তোমার কোলেই থাকিবে! তোমার ক্রোড় স্বর্গতুল্য—এ মন্দার-কুসুম তোমার ক্রোড়েরই উপযুক্ত! গ্রহণ কর।

এই বলিয়া ফকীর হৃদয়ের আবেগে অনাথিনীকে করালময়ীর ক্রোড়ে সমর্পণ করিল। ভগ্নীর সে শরীরও নাই, সে রূপও নাই, সকলই গিয়াছে—

জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট আছে। শরীরে যে কিছু রক্ত ছিল, আজ তাহা সেই অস্থি কয়েক খানিকে প্লাবিত করিয়াছে। কুলকামিনী রক্ত-মাখা কঙ্কালময়ী ভগ্নীকে ক্রোড়ে করিল। সে যে কি ভাবের চিত্র,—সে যে ভালবাসার কি মধুময় চিত্র, সে যে স্বার্থ-ত্যাগের কি মনোমোহন মিলন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত হয় না।

কুলকামিনী ভগ্নীকে ক্রোড়ে করিয়া সেই নৌকায় বসিলেন। ভগ্নী-প্রেমের জীবন্ত ছবি, সেই আলোক-প্লাবিত লোক-প্রবাহ দেখিয়া অবাক হইল।

সাহেব দেখিল, করালময়ীর রূপ যেন সহসা পরিবর্ত্তিত হইল। সে বীর্য্য, সে সাহস, সে অধ্যবসায়, সকল যেন নিমেষের মধ্যে নিবিয়া গেল। স্নেহের অপরাজিত মহিমায় করালময়ী কুলকামিনী রূপ ধরিয়া বসিয়াছেন! অশ্রু-প্রবাহে গণ্ডস্থল ভাসিয়া গিয়াছে; বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে! সাহেব সে আদর্শ-চিত্র দেখিয়া মনে মনে ঈশ্বরকে নীরবে ধন্যবাদ দিল।

কুলকামিনীর অনুরোধে, সাহেবও সেই নৌকায় উঠিল, এবং আর যত লোক ধরিল, তত লোক উঠিল। কুলকামিনীর আদেশে নৌকা লোক-নাথপুরের উদ্দেশে খুলিয়া দেওয়া হইল। নৌকা ধীরে ধীরে চলিল। নৌকার পশ্চাৎ দিকে নিশানে লেখা ছিল, "রাণী কৃপাময়ীর কৃপাতরী।" সেই নিশান জ্যোতিমাখা পবন-তাড়নে মৃদু মৃদু দুলিয়া দুলিয়া উড়িতে লাগিল, নৌকা ধীরে ধীরে নদীতে পাড়ী ধরিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নর- পিশাচের কার্য্য!

সেই দ্বি-প্রহরা গভীর রজনীতে কালীর মন্দিরের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইয়া নিরাশ অন্তরে গোরাচাঁদ ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করিল;—গরলের উপরে আরো গরল ঢালিল,—হিংসার উপরে আরো হিংসার মাত্রা চড়াইল,—ক্রোধের উপরে আরো ক্রোধাগুন জ্বালিল। গোরাচাঁদ ধনীর সন্তান,—টাকা ও বিলাসের পুত্র। টাকাতে ও মান সম্ভ্রমে গোপালপুরে সর্ব্বজন পূজিত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা টাকার প্রলোভনে গোরাচাঁদের মন যোগাইয়া

চলে; ইয়ারেরা দুষ্টাভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার উপায় জানিয়া, গোরাচাঁদকে খোসামুদী করে। গোরাচাঁদের দল সামান্য নহে; গোরাচাঁদের দলের ভয়ে গোপালপুরের সকলে কাঁপিত। গোরাচাঁদের ভয়ে কাঁপিত, কিন্তু গোরাচাঁদ কাঁপিত; কমলমণির ভয়ে। গোরাচাঁদ কমলমণির প্রণয়াসক্ত। কমলমণি রাণী, গোরাচাঁদ তাহার পদানত! গোরাচাঁদ কি তবে সুলোচনার পিতা? গোরাচাঁদ মনুষ্যাকারে পশু,—গোরাচাঁদ নর-পিশাচ। কমলমণির যৌবনে ভাটা পড়িয়াছে, গোরাচাঁদের দুর্দ্দম্য পিপাসা আর নিবৃত্তি হয় না। শিশুর কোমলরক্ত পিপাসায় পাষণ্ড মাতিয়াছে। সে সকল কথা লিখিতে ঘৃণা হয়। সুলোচনার পিতা মাতাকে, মানুষ, তবে একবার দেখ। গোরাচাঁদ পিতা, কমলমণি মাতা। গোরাচাঁদ দুহিতার প্রণয়-ভিখারী! মানুষে ও পশুতে কি কিছু বিভিন্নতা আছে? পশুতে যাহা পারে না, মানুষে তাহাও পারে! মানুষ লিপ্ত হইতে পারে না, মজিতে পারে না, পৃথিবীতে এমন পাপ অতি অল্পই আছে। গোরাচাঁদের দারুণ বাসনার তাড়নে, কমলমণি সুলোচনাকে তাঁহার চরণে বাঁধিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছে! সুলোচনা রমণীকুলে দেবীবিশেষ, কখনই তাহা সহিতে পারেন না, সম্বল-হীনা একমাত্র প্রাণকে লইয়া বিপদের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুলোচনার প্রাপ্তির আশায়, গোরাচাঁদের প্রাণ বিভোর। সেই সুলোচনাকে যখন মিলিল না, তখন গোরাচাঁদ উন্মত্তের ন্যায় হইল। দেখিল, কমলমণিও ফাঁকী দিয়া গিয়াছে। বুঝিল মেয়ের মমতায় মায়ের প্রাণ মজিয়াছে।

গোরাচাঁদ হিতাহিত-জ্ঞান শূন্য হইল। সেই গভীর রাত্রে, দলের সহিত বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। বিনোদ বাবুর প্রতি বড়ই বিরক্ত হইল, বুঝিল, সকল চক্রান্তের মূলে বিনোদ। প্রথমে বিনোদকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু চেষ্টায় বিনোদকে পাওয়া গেল না। বিনোদের অবর্ত্তমানে বিনোদের আত্মীয় স্বজনদিগের উপর গোরাচাঁদের নয়ন পড়িল। টাকা, মান, সম্ভ্রম, ও পাশব-বল একত্রিত হইয়া সুরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধে লাগিল। মাম্‌লার উপর মাম্‌লায় সুরেশ একেবারে জেরবার হইয়া পড়িলেন। অবশেষে গোপালপুরে সুরেশচন্দ্র আর টিকিতে পারিলেন না। অনন্ত-দেবী ইত্যবসরে বিনোদের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া রোগকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। বৃদ্ধার শরীর, রোগের ঘর; রোগ-

সহচরগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়া অনন্তদেবীকে একেবারে জীর্ণশীর্ণ করিয়া ফেলিল; সকল সম্পত্তি, সকল শক্তিকে আপন ক্রোড়ে পূরিল। অনন্তদেবী ঔষধ মুখে তুলিলেন না; তাঁহার বাঁচিতে আর ইচ্ছা ছিল না। মরিবার পূর্ব্বে গুপ্ত ধনের কতক ব্যয় করিয়া কন্যাদের বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, আর অবশিষ্ট ধন, বিনোদের স্ত্রী শান্তময়ীকে দিলেন। শান্তময়ীর প্রতি তাঁহার বড় ভাল ভাব ছিল না। কিন্তু বিনোদের সম্পত্তি অন্যকে দিয়া মৃত্যু-সময়ে অধর্ম্ম ক্রয় করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। স্বামীর আদেশ পালন করিবার জন্য, অনন্ত-দেবী আপন বাসনাকে বলি দিয়া, সমস্ত ঐশ্বর্য্য শান্তময়ীকে দান করিলেন এবং তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন;—বলিলেন; "মা, স্বামীর মতের বিরুদ্ধে আর কখনও চলি ও না, বিনোদের মত স্বামী কয় জন পায়? তুমি আমার হৃদয়ের ধনকে যত্ন করিও।" মেয়েদের বিবাহ ভাল পাত্রে হইল না, দলাদলিতে, গোরাচাঁদের চক্রান্তে সকল পাত্র যখন ফিরিল, তখন অগত্যা বিনোদের অনুরোধকে অবহেলা করিয়া, অনন্তদেবী, অপাত্রে কন্যাদিগকে সমর্পণ করিলেন। সে কষ্ট প্রাণে বড়ই বাজিল, সে কষ্ট রোগের সহায়তা করিল। এই উভয়বিধ কষ্টে, অনন্তদেবী, অনন্ত রাজ্যের উদ্দেশে, অল্প দিনের মধ্যেই ইহ সংসার পরিত্যাগ করিলেন। বিনোদের ভালবাসার মধ্যবিন্দু এতদিনে তিরোহিত হইল। মাতৃক্রোড় প্রেম শিক্ষার প্রথম সোপান এতদিনে বিনোদকে ফাঁকী দিল! বিনোদ কিছুই জানিল না। কি অমূল্য রত্ন পলায়ন করিল, বিনোদ তাহা জানিতে পারিল না। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। অনন্তদেবীর মৃত্যুর পর গোরাচাঁদ সাহসে আরো উদ্দীপ্ত হইল। অনন্তদেবীর স্বভাবের গুণে অনেকেই, বাহিরে না হউক, মনে মনে ভয়-বিহ্বল ছিল; মনে মনে অনেকেই জ্বলন্ত ধর্ম্মভাবপূর্ণ জননীকে পূজা করিত। এক অনন্তদেবীর জীবন ধারণে, অনেকে পাপ কর্ম্ম করিবার সময়ে ভয়ে কাঁপিত। সেই জননী অনন্তদেবী যখন সংসার বন্ধন কাটিয়া মুক্ত হইলেন, তখন গোরাচাঁদের দলে, প্রকাশ্যে,অপ্রকাশ্যে সকলে একপ্রাণ এক মনে যোগ দিল। সুরেশচন্দ্রের স্বভাব চরিত্র বড় ভাল ছিল না, সকলেই ঘৃণার চক্ষে তাহাকে দেখিত। অত্যাচারিত প্রজারা পর্য্যন্ত গোরাচাঁদের দলে যোগ দিল। অনন্তদেবী যে প্রজা বিদ্রোহ দেখিয়া জীবনত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই বিদ্রোহ, মৃত্যুর পরে, ভীষণাকার ধারণ করিল।

সুরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধে গোপালপুর ক্ষেপিয়া উঠিল। গোরাচাঁদের ইঙ্গিতে সুরেশচন্দ্র অল্প দিনের মধ্যে সপরিবারে ধনে প্রাণে নিহত হইলেন। দস্যুরা বাড়ী লুটিল, সুরেশচন্দ্রকে সপরিবারে প্রাণে মারিয়া মাটিতে মিশাইল। সুরেশচন্দ্রের বাড়ী ঘর ক্রমে ক্রমে আবর্জ্জনায় পূর্ণ হইয়া পড়িল। যে যাহা পাইল, লইয়া গেল। জানালা দরজা, গৃহের ইট পর্য্যন্ত খসাইয়া, লোকেরা চুরি করিল। কালক্রমে বিনোদের বাড়ী জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইল! ক্রমে বিনোদের পিতার সাধের ভবন, সর্প প্রভৃতির আবাসস্থান হইয়া উঠিল। স্মৃতিময় সকল চিহ্ন, ক্রমে বিস্মৃতি-আঁধারে ডুবিতে লাগিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে গোরাচাঁদের চক্রান্তে, বিনোদ বাবুর গোপালপুরের বাড়ী আঁধারে মগ্ন হইল। হিংসা ও ক্রোধের বিজয় নিশান, বিনোদের ভগ্ন-পুরীর ইষ্টকে ইষ্টকে প্রোথিত হইয়া উড়িতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিপদের আশ্রয়।

বৃষ্টির জলে বস্ত্র ভিজিয়া গিয়াছে, শরীর কাঁপিতেছে, স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, তবুও সুলোচনার গতি থামিল না। 'আমার সহিত আইস'—বিনোদের এই কথাকে সুলোচনা বেদবাক্য মনে করিল। ভাবিল, কষ্ট পাইয়াছি বলিয়া কি জীবনকে পাপে ডুবাইব? দুঃখ পাইব বলিয়া কি 'আত্ম' রত্নকে ভাসাইয়া দিব? তা কখনই পারিব না। এই প্রতিজ্ঞাকে বুকে বাঁধিয়া সুলোচনা চলিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি চলিলেন, কিন্তু তবুও অরণ্য অতিক্রম করিতে পারিলেন না। বাস্তবিক পথ অধিক হাটা হয় নাই, সুলোচনা সমস্ত রাত্রি কতকটা স্থানে ঘুরিয়াছেন। রজনী অবসান হইয়া আসিল, পাখী কুলায় ছাড়িয়া আকাশে উড়িল। উড়িয়া উড়িয়া ডাকিতে ডাকিতে, ক্লান্ত হইয়া আবার বৃক্ষে বসিতে লাগিল। বৃক্ষে বসিয়া ডাকিয়া যখন ক্লান্ত হয়, তখন শূন্যে উঠে, শূন্যে ডাকিয়া ক্লান্ত হইয়া আবার বৃক্ষে বসে। এমনি করিয়া, যে আঁধার টুকু ছিল, তাহাকে সকলে মিলিয়া চিৎকার করিয়া তাড়াইল। প্রত্যুষ, সে চেঁচামেচি শুনিয়া বিস্ময়ে উপস্থিত হইল—বৃক্ষের ভিতর দিয়া আলোক দেখা যাইতে লাগিল। সুলোচনা

আলোক ধরিয়া অরণ্যের বাহির হইলেন। বাহির হইয়া দেখিলেন, কৃষকেরা ক্ষেত্রের ধারে, ছোট ছোট ছাউনির বাহিরে বসিয়া তামাকু খাইয়া, নিদ্রান্বিত শক্তি সকলকে উদ্দীপিত করিতেছে। অরণ্যের সে ধারে প্রকাণ্ড মাঠ,অরণ্যের গায়ে গায়ে কৃষকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাউনি। ছাউনি সকলের দরিদ্র বেশ দেখিয়া বোধ হয়, বারমাস সেখানে কেহই থাকে না, চাষের সময়ে কৃষকেরা আসিয়া জঙ্গলের বৃক্ষ পত্র দিয়া এই সকল কুঁড়ে প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অতিকষ্টে মাথা রাখে। স্ত্রী পরিবার কেহই নাই—কেবল পুরুষশ্রেণী। কৃষকেরা সকলেই মুসলমান,—পরিধানে নেংটী, মুখে দাড়ি, হাতে হুকা। কৃষ্ণকায় পুরুষশ্রেণী,দরমা এবং ছোট ছোট বস্তা পাতিয়া,হাঁটুর উপর বসিয়া গিয়াছে। একের হুকা অন্যে ধরিতেছে, অন্যের হুকা অপরে টানিতেছে। কত সাধ পূরিতেছে। মধ্যে মধ্যে হুকা লইয়া একটু একটু কথা কাটাকাটীও হইতেছে। পিতার হাতের হুকা শিশু জোর করিয়া কাড়িয়া লইতেছে, শিশুর হুকা পিতা কাড়িতেছে। দেখিতে সকলেই প্রায় একরূপ, কাহারও দাড়ি ছোট, কাহারও বড়, এই মাত্র প্রভেদ। রৌদ্র, শরীরের কান্তিকে একেবারে কালির ন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাতে আবার ময়লা চিরকালের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বসতি করিতেছে। জল বিহীন স্থানে তাহা ধৌত হয় না, তেল খাইয়া খাইয়া আসনকে আরো দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিতেছে। কত কালের কত মৃত্তিকা, তৈলাসক্ত হইয়া, সে সকল কৃষকের শরীরে আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তৈলসিক্ত মাটী ঘর্ম্মের সহিত নেংটীর বস্ত্রে মিশিয়া শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। রূপের সহিত দুর্গন্ধ ও বাড়িতেছে! ইহাতেই কৃষকদের কত আনন্দ। এত অল্প সুখের প্রত্যাশী বাঙ্গালার কৃষকদের ও নাকি পেট ভরে না। সুলোচনা তাহাই দেখিলেন। তামাকু খাইয়া কৃষকেরা হাঁড়ি হইতে পান্ত ভাত বাহির করিয়া মৃত্তিকা নির্ম্মিত বাসনে ভাগে ভাগে রাখিল। কোন পাত্রে এক ছটাক, কোন পাত্রে আধপোয়া চাউলের ভাত পড়িল। তাহাই, দলে দলে বসিয়া, কৃষকেরা খাইতে লাগিল। কেবল ভাত আর লবণ; মধ্যে মধ্যে এক একটী লঙ্কা দেখা গেল। কৃষকদের কষ্ট দেখিয়া সুলোচনার চক্ষে জল পড়িল, আপন কষ্ট যন্ত্রণা সকলই চলিয়া গেল। এক জনের ধারে যাইয়া কাতর স্বরে সুলোচনা বলিলেন, তোমরা শুধু ভাত কেমন করিয়া খাইতেছ?

কৃষক।—মা, শুধু ভাতই বা পেট ভরিয়া পাই কই ?

সুলোচনা বলিলেন, তোমরা ক্ষেতে যে ধান পাও, তাতে পেটের ভাত হয় না ?

কৃষক।—'তা হয় না, ফকীরের খাজনা দিতে, কর্জ্জ টাকার সুদ দিতে আবার জমীদারের নায়েব গোমস্তার পার্ব্বনী দিতেই প্রায় সকল যায়, যাহা থাকে, তাহাতে সমস্ত বৎসর কুলায় না।' ফকীরের কথা চুপি চুপি বলিল বোধ হইল, ফকীর নিকটেই ছিল। সুলোচনা পূর্ব্ব দিন কিছুই আহার করেন নাই, তাহাতেই কত কাতর হইয়াছেন, ইহারা বারমাস উদরান্নের জন্য এত লালায়িত। অর্দ্ধাহারেই ইহারা পরিতুষ্ট, আপনার সহিত ইহাদের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন, আর সুলোচনার হৃদয়ে ঘন ঘন আঘাত লাগিতে লাগিল। কৃষকেরা সুলোচনার ভাব দেখিয়া চমকিত হইল, গোপনে গোপনে নানা কথা কাণাকাণি করিয়া পরস্পরে বলিতে লাগিল।

সুলোচনা বলিলেন, আমি তোমাদের পাতের দুটী ভাত খাইব, দিবে কি ?

গুরুলোকের পাতের উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইলে পুণ্য সঞ্চয় হয়। সুলোচনা কৃষকদের নিকটে এক মহা শিক্ষা পাইয়াছেন, উচ্ছিষ্ট অন্নাহার করিয়া কৃতার্থ হইতে ইচ্ছা হইল।

কৃষকেরা বলিল, আমরা মুসলমান, নিকৃষ্ট জাতি, আমাদের পাতের ভাত খাইলে আপনার জাত যাবে।

সুলোচনা।—আমার জাত গিয়াছে; তোমাদের পাতের ভাত খাইয়া তোমাদের জাতেই উঠিব। এই বলিয়া সুলোচনা পাতের নীচে যে দুই একটী ভাত পড়িয়াছিল, তাহা তুলিয়া মুখে দিলেন। কৃষকেরা দেখিয়া অবাক হইল। লজ্জা পাইয়া কৃষকেরা যার ঘরে যত ভাল দ্রব্য ছিল, আনিয়া সুলোচনাকে উপহার দিল। সুলোচনা সকল পাত্র হইতে একটু একটু লইয়া আহার করিলেন। কৃষকেরা সুলোচনার অমায়িক ভাব দেখিয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিল। যথা সময়ে সকলে মাঠে চলিয়া গেল, কিন্তু একটী বৃদ্ধ আসিয়া সুলোচনার নিকটে বসিল। কৃষকেরা সকলে পরামর্শ করিয়া বৃদ্ধকে রাখিয়া মাঠে গেল। বৃদ্ধ সুলোচনার সহিত সরল ভাষায় অনেক আলাপ করিল। সুলোচনা সরল প্রাণে বৃদ্ধ মুসলমানের

নিকট অনেক কথা বলিলেন। বৃদ্ধ সকল কথা শুনিয়া বলিল, আমি তোমাকে এমন এক স্থানে লইয়া যাইব, সেখানে কোন ভয়ের কারণ নাই।

সুলোচনা তাহা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। কৃষকেরা সকলে যখন মাঠে চলিয়া গিয়াছে, তখন কমলমণি আর সেই পুরোহিত, হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া সুলোচনার শরীর শিহরিয়া উঠিল, সর্ব্ব শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। সুলোচনা মৃদুস্বরে বলিলেন, মা, এখানেও তুই? কমলমণির শরীরে ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল, চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল, বলিল, রাক্ষসি, জাত, মান সব ডুবালি, তবুও আমার কথা শুনিলি না? দেখিব আজ তোকে কে রাখে? এই বলিয়া কমলমণি সুলোচনার মাথার চুল ধরিল। পুরোহিত ইত্যবসরে সুলোচনার হাত ধরিল, এবং উভয়ে সুলোচনাকে টানিয়া লইয়া চলিল। কর্ষিত ভূমির উপর দিয়া সুলোচনাকে যখন টানিয়া লইয়া চলিল, তখন বৃদ্ধ, দুঃখের মর্ম্মদাহে, এক গভীর হুঙ্কার ছাড়িল। হুঙ্কারে সমস্ত মাঠ প্রতিধ্বনিত হইল। দেখিতে দেখিতে মাঠের অসংখ্য কৃষক উপস্থিত হইল। হুঙ্কার ছাড়িয়াই বৃদ্ধ কমলমণির চুল ধরিল, ক্রোধে বলিল, এতই তেজ? এখনই দেখাব।

চারিদিক হইতে যখন অসংখ্য কৃষক আসিতে লাগিল, তখন কমলমণি অপ্রতিভ হইল, হইয়া, ক্ষমা চাহিল। সুলোচনা বৃদ্ধের পা ধরিয়া বলিল ইনি আমার মা, ইহাকে কিছু বলিও না।

বৃদ্ধ মুসলমান বলিল, তোমার মা নহেন, পিশাচিনী, এর জন্য আবার মায়া কি?

সুলোচনা পুন বলিলেন, আমার মা! আমার মা! আমার মা!

কৃষকেরা সে কথা শুনিল না। বৃদ্ধের আদেশে কমলমণিকে, যতদূর পারিল, কৃষকেরা অপমান করিল। পুরোহিতের কাণ কাটিয়া, এবং কমলমণির নাক কাটিয়া অবশেষে ছাড়িয়া দিল। কমলমণি অপমানে, লজ্জায় ও কষ্টে মৃতবৎ হইয়া আবার অরণ্যের ভিতরে চলিল। জীবনের অবশিষ্ট দিন লোকের সেবা করিয়া কাটাইবে ভাবিয়া দেশান্তরে চলিল। সেই হইতে গোরাচাঁদের মুখ আর দেখিল না; সেই হইতে গোপালপুরে আর ফিরিল না। কমলমণির হস্ত হইতে এই প্রকারে উদ্ধার করিয়া, সেই বৃদ্ধ

মুসলমান নিরাপদ স্থানে সুলোচনাকে লইয়া চলিল। এই নিরাপদ স্থান, সেই ভগ্ন মস্‌জীদ্‌। এই বৃদ্ধ মুসলমান—সেই ফকীর।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নব ব্রত।

সুরেশচন্দ্র ও জননী অনন্তদেবীর পরলোক গমনের পর, গোরাচাঁদের রক্ত একটু শীতল হইল; গোরাচাঁদ একটু সুস্থির হইল। গোপালপুরের দলাদলি এক্ষণ একটু থামিয়াছে,—একটু শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। গোরাচাঁদ সুলোচনার সকল সংবাদ পাইয়াছে। গোরাচাঁদ দলাদলি ভুলিয়াছে, সুরেশচন্দ্রের কথা ভুলিতে পারিয়াছে, কিন্তু সুলোচনার কথা ভুলিতে পারে নাই। গোরাচাঁদ আজ কাল সুলোচনার উদ্ধারের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। দুর্দ্দমনীয় রিপুর উত্তেজনায় পাষণ্ড নদীতে নদীতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে!

অনন্তদেবীর মৃত্যুর পর, শান্তিময়ী স্বামীর ধন লইয়া পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলেন। লোকের চক্রান্তে ভুলিয়া, আপনার যে মহৎ অনিষ্ট করিয়াছেন, তাহা কিছুকাল পরেই উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন! বিনোদের ন্যায় স্বামী পাওয়া বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, হতভাগিনী এতদিন পরে উত্তমরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন। বুঝিয়াছেন,—কিন্তু বড় বিলম্বে। সোণার সংসার ছারখার হইয়া গিয়াছে,—সোণার পাখী পিঁজরা ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়াছে! শাশুড়ীর মৃত্যুর পর, তাঁহার জীবনগত মহত্ত্বও শান্তময়ী বুঝিতে পারিলেন। হতভাগিনী অতুল ঐশ্বর্য্য লইয়া পিত্রালয়ে আসিলেন বটে, কিন্তু অনুতাপে হৃদয় মন জর্জ্জরিত হইল। অনুতাপ না থাকিলে, মানুষ বুঝি বা সুখ স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। অনুতাপের মর্ম্মদাহ মানব প্রাণকে ক্ষত বিক্ষত করিতে না আসিলে, বুঝি বা মানুষ নিরাপত্তিতে সংসারের সুখ ভোগ করিতে পারিত। কিন্তু মানবের সে ইচ্ছা, সে সাধ পূর্ণ হয় না। পাপ করিলেই অনুতাপ! শান্তিময়ী ঐশ্বর্য্য পাইলেন বটে, কিন্তু সুখ বিদায় লইল, দারুণ চিন্তা হতভাগিনীকে বড়ই মলিন করিয়া ফেলিল। হতভাগিনী কুপ্রবৃত্তিকে আর জীবনে প্রতিপোষণ করিতে পারিল না; লুকাইয়া যে জঘন্য কার্য্য করিয়া সুখ পাইয়া-

ছিল, স্বাধীন হইয়া আর সে কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইল না। ধন পাইয়া লোক অহঙ্কারে স্ফীত হয়, আসক্তিতে মগ্ন হয়, সুখ আশায় বিভোর হয় বটে, কিন্তু শান্তিময়ী ঐশ্বর্য্য পাইয়া দরিদ্র হইল, মনে দারুণ বৈরাগ্য-ভাব উপস্থিত হইল। বিনোদের অর্থ—স্বর্গের জিনিষ, আমি নরকের কীট, তাহা স্পর্শ করিব কেন? বিনোদ দেবতা, আমি পিশাচিনী। আমি দেবতার পূজা করিতে পারিলামনা ত রহিলাম কেন? দেবতাকে প্রাণে পাইয়াও যে তাহার পূজা না করিল, তাহার ন্যায় মূর্খ আর কে? শান্তিময়ী এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিয়া বুঝিলেন—বিনোদ পরের চিন্তায় বিভোর—আপন স্বার্থ বিবর্জ্জিত; আর আমি আপনার লই-য়াই ব্যস্ত! সুলোচনা—আর স্বর্গের কুসুম, একই জিনিষ! এমন মেয়ে আর ত দেখি নাই! আমার সুখের জন্য, অম্লান চিত্তে বিপদসাগরে ঝাঁপ দিল! উঃ, মানুষে যাহা পারে না, আমি তাহা করিয়াছি! আমার ন্যায় নর-পিশাচিনী আর কোথায় আছে? আমার নরকেও স্থান নাই! এই প্রকার চিন্তায় শান্তিময়ীর প্রাণ অস্থির হইল, মুখ মলিন হইল। সুলো-চনাকে উদ্ধার করিতে পারিলে জীবন সার্থক হইবে, মনে হইল। শান্তিময়ী, শাশুড়ীর কথাকে জীবনের মূল মন্ত্র করিলেন। সুলোচনাকে উদ্ধার করি-বার জন্য কৃত সঙ্কল্প হইলেন। এই অবস্থায় তিনি পিত্রালয়ে আসিলেন। শান্তিময়ী, পিতামাতার একমাত্র সন্তান। পিতা, ঐশ্বর্য্যবান্ লোক। তনয়া যখন বাড়ীতে আসিল, তখন পিতামাতার মনে অপার আনন্দ হইল। তনয়ার ইচ্ছায় তাঁহাদের ইচ্ছা মিশিল। তনয়ার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে তাঁহারা ব্রতী হইলেন। কিন্তু অধিক দিন তাঁহারা থাকিতে পারিলেন না। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা উভয়ে পরলোকে গমন করিলেন। তাঁহাদের উইলানুসারে শান্তিময়ীই সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইলেন। শান্তি-ময়ী জীবনের অবশিষ্ট দিন, স্বামীর মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্যই, দিবারাত্রি ব্যস্ত রহিলেন। শান্তিময়ী পিতামাতার ঐশ্বর্য্য লইয়া, লোক-নাথপুরের কৃপাময়ী নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গোরাচাঁদের আশা—নির্ব্বাণ।

রাণী কৃপাময়ীর কৃপাতরীতে,—ভগ্নীর কোলে, ভগ্নী—কুলকামিনীর কোলে সুলোচনা, বিশ্বাসের কোলে নির্ভয়,—শক্তির কোলে মুক্তি,—ভক্তির কোলে প্রেম। সাহেব ফকীরের কথায় উভয়কে চিনিয়াছেন,—সেই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইলেন। যাহা কখনও দেখা হয় নাই, যাহা অন্য কোন দেশে দেখা যায় নাই, সাহেব কৃপাতরীতে, সে অপরূপ মনোহর চিত্র দেখিলেন। যাহার মায়ায়, শ্মশানবাসী শিব গৃহী, তাহা সাহেব অনিমেষ নয়নে দেখিলেন। যে আসক্তিতে বিনোদ উদাসীন—সংসার-বিরাগী, এত দিন পরে, এণ্ডার্‌সন্ সে আসক্তিকে চিনিলেন। যাহার জন্য গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, পথে পথে, বনে বনে, কত কষ্ট সহ্য করিয়া এণ্ডার্‌সন্ অনাথপুরে আসিয়াছিলেন, এতদিনে সে অমূল্য ধন মিলিল। এণ্ডার্‌সনের সকল পরিশ্রম আজ সফল হইল! গঙ্গা-যমুনা একত্রে মিলিল। এণ্ডার্‌সনের চক্ষু সে দৃশ্য দেখিয়া তৃপ্ত হইল; জীবনধারণ সার্থক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এণ্ডার্‌সন্ বিনোদের নিকট সবিশেষ সংবাদ লইয়াছিলেন, কিন্তু গোপালপুরে পৌঁছিয়া যখন শুনিলেন, বিনোদের বাড়ী ঘর সকলই ধূলিসাৎ হইয়াছে, সুরেশচন্দ্র ও অনন্তদেবী, দুঃখের সংসার হইতে পলায়ন করিয়াছেন, তখন প্রাণে যেন দগ্ধ শলাকা বিদ্ধ হইতে লাগিল। গোপালপুরে সুলোচনার কোন সংবাদ না পাইয়া বিনোদের শ্বশুর বাড়ী গমন করিলেন। শান্তিময়ী তখন প্রাণের গরল ঢালিয়া ফেলিয়া, স্বামীর মনোরথ পূর্ণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বের কুস্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, শান্তিময়ীর যথেষ্ট প্রশংসা শুনিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখদর্শন করিতেও এণ্ডার্‌সনের ইচ্ছা হইল না। তিনি নানা জনের নিকট সুলোচনার তত্ত্ব বিশেষরূপ অবগত হইলেন, এবং তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য একাকী ব্রতী হইলেন। যে রজনীতে সেই নির্জ্জন মাঠে, করালীর সহিত এণ্ডার্‌সনের সাক্ষাৎ হয়, সেই রাত্রিতে সুলোচনার বিবাহ হইবে, এরূপ কথা ছিল। উভয়েরই প্রতিজ্ঞা ছিল, যে প্রকারেই হউক, সেই রাত্রেই সুলোচনাকে

উদ্ধার করিবে। সে সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে! উভয়ের ইচ্ছা মিলিয়া উদ্ধারের কার্য্য সমাধা করিয়াছে। এখন ভগ্নীর কোলে, বিষাদমাখা ভগ্নী-দেহ, এণ্ডার্‌সন্‌ দেখিলেন। জীবনের সকল কষ্ট, মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন তিরোহিত হইল।

যথা সময়ে কৃপাময়ীর কৃপাতরী, লোকনাথপুরের ঘাটে পৌঁছিল। কৃপা-ময়ীর নিকট সুলোচনার উদ্ধারের সংবাদ পৌঁছিল। কৃপাময়ীর আনন্দের সীমা রহিল না। চতুর্দ্দিকে মহোল্লাসের স্রোত পড়িয়া গেল, চতুর্দ্দিকে মঙ্গল-বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সুলোচনার দেহ কৃপাময়ীর আশ্রয়ে নীত হইতে লাগিল! এত দিন পরে কুলকামিনীর প্রাণে যেন শান্তির উৎস প্রবাহিত হইল।

এদিকে হঠাৎ, লোকনাথপুরের সেই বিস্তৃত ময়দান ভেদ করিয়া, ক্রমা-গত লোক আসিতে লাগিল। এণ্ডার্‌সন্‌ পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, আজিও গোরাচাঁদ সুলোচনাকে আত্মাধীনে আনয়ন করিবার জন্য বিষম ষড়যন্ত্রে নিযুক্ত আছে, পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, আজও প্রভূত অর্থরাশি হতভাগ্য এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করিতেছে। লোক-প্রবাহ দেখিয়া, হঠাৎ তাহার মনে গোরা-চাঁদের কথা জাগিল। করালীও এতক্ষণ পরে সেই পান্সী নৌকার অভি-সন্ধি বুঝিল! এতক্ষণ পরে বুঝিল, সেই নৌকাতেই গোরাচাঁদের দলবল লুক্কায়িত ছিল। করালী আর ভাবিবার সময় পাইল না, এণ্ডার্‌সন্‌ও আর চিন্তার সময় পাইলেন না। সুলোচনাকে কৃপাময়ীর বাড়ীতে তুলিয়া রাখি-য়াই, করালী আবার বাহিরে আসিল। কৃপাময়ীর সমস্ত লাঠিয়াল তখনও অনাথপুর হইতে ফিরিয়া আসিতে পারে নাই, তখনও সমস্ত দলের লোক একত্রিত হয় নাই। এমন সময়ে, গোরাচাঁদের দল, লোকনাথ-পুরে পৌঁছিয়া আকাশ কাঁপাইয়া হুঙ্কার করিল। কুলকামিনী আবার করালময়ীর রূপ ধরিলেন; শান্তিময়ী আবার কৃপাময়ীর রূপ ধরিয়া, অবশিষ্ট লোকদিগকে গোরাচাঁদের দলের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। উভয় দলে, সেই গভীর রাত্রে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। লাঠিতে লাঠিতে আঘাত লাগিয়া ভীষণ শব্দ নৈশগগনকে পরিপূর্ণ করিল। উভয় দলের হুঙ্কারে সমস্ত গ্রামের লোক জাগিয়া উঠিল। পশুপক্ষী বিপদ গণনা করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। সে সংগ্রামে অনেক লোক মরিল, অনেক লোক আহত হইল। যখন ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে, কোন

পক্ষের জয় পরাজয় বুঝা যাইতেছে না, এমন সময়ে গ্রামের লোকেরা থানায় সংবাদ পাঠাইল। থানার লোকেরা যথা সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু এত লোককে গ্রেপ্তার করিতে পুলিস ভীত হইল, অসমর্থ হইল। এদিকে রাত্রি অবসান হইয়া আসিতে লাগিল, গোরাচাঁদের দল অধর্ম্ম যুদ্ধে ভাঙ্গা মন লইয়া আর যুদ্ধ করিতে পারিল না, গ্রেপ্তার হইবে, ফাটকে যাইবে, এই আশঙ্কায় অনেক লোক পলায়ন-তৎপর হইল। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে দেখা গেল, গোরাচাঁদের পক্ষের দল প্রায় শূন্য হইয়াছে। এই অবসরে, পুলিস সময় বুঝিয়া, আপন পরাক্রমে গোরাচাঁদকে গ্রেপ্তার করিল। কৃপাময়ীর লোকেরা আত্ম-রক্ষা করিয়াছে, এই জন্য তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল না। শুনা যায়, পুলিস এই ব্যাপারে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিল। গোরাচাঁদ যখন গ্রেপ্তার হইয়া চলিল, তখন জয় জয় রবে লোকনাথপুরের আকাশ পূর্ণ হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেশত্যাগের একটী কারণ।

বিনোদ বাবু যখন স্কুলে পড়িতেন, তখন হইতেই দেশ-ভ্রমণের প্রবল বাসনা হৃদয়ের এক কোণে মিটিমিটি জ্বলিতেছিল। বয়োবৃদ্ধির সহিত সেই বাসনা ক্রমে ক্রমে হৃদয়ের সকল স্থান অধিকার করিয়া ফেলিল। বয়স বাড়িল, সেই সঙ্গে সঙ্গে বাসনাও বাড়িল। যশমান সঞ্চয় করিব, ধনী হইব, বিদ্বান হইব, বিনোদ বাবুর সে ইচ্ছা বড় একটা ছিল না; কিন্তু তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রে ভাসিব, গগনস্পর্শী মেঘের লীলাভূমি পর্ব্বতে উঠিব, গহন অরণ্যে যাইব, সে ইচ্ছাটী বিনোদ বাবুকে ক্রমেই জাগাইয়া তুলিল। ক্রমে ক্রমে সকলে জানিল। প্রতিবন্ধকও জুটিল। অনন্তদেবী ভালবাসার অনন্তফাঁদ পাতিয়া বিনোদ বাবুকে বাঁধিলেন। বিনোদের স্কুলের পড়া বন্ধ করিলেন, বাড়ীতে আনিয়া বিবাহ দিলেন। বিবাহ দিলে বালকেরা সংযত হয়, এই জন্য, প্রায় বালকেরই বাল্যকালে বিবাহ হয়। বিবাহ হইলেও তাহাতে বিনোদের মন বসিল না। বিনোদের বিবাহে মন ছিল না, সুতরাং স্ত্রীকে তেমন ভালবাসিতে পারিলেন না। অনন্তদেবী অমৃতের আশায় গৃহে গরল তুলিলেন। নব স্বামীকে নবাগত স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত করিতে অনেক চেষ্টা হইল। কিন্তু তাহার ফল বড় ভাল হইল না। তারপর আরো চেষ্টা হইল। সে সকল কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না। ক্রমে ক্রমে কুসংসর্গ বিনোদকে ঘেরিয়া ফেলিল। প্রলোভনের মধুর আকর্ষণ বিনোদকে ধরিল। বিনোদ কয়েক দিনের জন্য একটু কুসংসর্গ-প্রিয় হইয়া উঠিলেন। হাস্য পরিহাসে, তাস পাশা ক্রীড়ায়, ও বৃথা গল্পে সময় যাইতে লাগিল। বিনোদের হৃদয় ভাল ছিল, তবুও মদ ধরিলেন না—রিপু-ক্রীড়ায় মাতিলেন না।

স্ত্রীকে না ভালবাসায় যে কুফল ফলিবার ছিল তাহা ফলিল। যৌবনের প্রারম্ভেই স্ত্রীর হৃদয়ে গাঢ় চিন্তার মেঘ উঠিল। কি প্রকারে ক্রমে বাল্যবিবাহের কুফল ফলিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিব না, বলিতে দুঃখ হয়, কষ্ট হয়।

বিনোদের পশ্চাতে যে সকল লোক লাগিয়াছিল, তাঁহারা ক্রমে বিনোদকে কমলমণিদের বাড়ীতে লইয়া গেল, ক্রমে বিনোদ এতটুকু অগ্রসর হইলেন! সেথানে রূপের সাগর খেলিতেছে, ঢেউয়ের পশ্চাতে ঢেউ তুলিতেছে। সে রূপ-সাগর দেখিয়া বিনোদ মোহিত হইলেন। এমন দ্রব্যে এমন কীট, এমন সৌন্দর্য্যে এমন কদর্য্য কালিমা, তাঁহার প্রাণে সহিল না। তিনি চিন্তিত হইলেন, ভাবিলেন—গোপনে কাঁদিলেন। স্থলোচনা তথন বালিকা, কুলকামিনী তখন যুবতী। স্থলোচনা তখন অস্ফুট কলিকা, কুলকামিনী তখন প্রস্ফুটিত—নব তেজ, নব কান্তি, নবভাব যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। প্রফুল্ল মুখে হাসি ভাসিতেছে,—তাহাতে অমৃত, তাহাতে মধুরতা। স্থলোচনা জড়সড়—বিনয়ে যেন আর সকল গুণ ঢাকা। স্থলোচনার হৃদয়ে তখনই চিন্তা উঠিয়াছে, সে চিন্তা বিনয়ের শৃঙ্খল ভেদ করিয়া মলিন মুখে ভাসিতেছে। বিনীত মুখ চিন্তায় মলিন,—তাহাতে হাসি নাই—তাহাতে স্থখের রেখা মাত্র নাই। প্রথম দিবসেই বিনোদ বাবু স্থলোচনাকে চিনিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—তুমি কি স্কুলে পড়?

বিনীত স্বরে স্থলোচনা বলিল,—স্কুলে পড়িতাম বটে, কিন্তু আর পড়া হবে না, মা বলেছেন আর স্কুলে যেতে দিবেন না।

বিনোদ বাবু বলিলেন—কেন?

স্থলোচনা।—স্কুলে দিতে পূর্ব্বেই মায়ের ইচ্ছা ছিল না, দিদি তখন অনেক বুঝায়ে স্কুলে দিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণ মা ঠিক করেছেন, আর স্কুলে যেতে দিবেন না।

বিনোদ বাবু।—মা কি বলেন?

স্থলোচনা।—মা বলেন, স্কুলে দিলে আমি খ্রীষ্টানি মত শিখিব, আপন ব্যবসা রাখিব না; মেমের চক্রান্তে খারাপ হয়ে যাব।

বিনোদ বাবু—আপন-ব্যবসা কি, তুমি কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছ?

স্থলোচনা মস্তক অবনত করিল, চক্ষু হইতে দুই তিন ফোঁটা জল পড়িল, পরে ধীরে ধীরে বলিল,—সকলই বুঝিতে পারিয়াছি, স্কুলের মেম আমাকে সকল কথা বুঝায়ে দিয়েছেন।

বিনোদ বাবুর চক্ষু হইতেও দুফোঁটা জল পড়িল, ভাবিলেন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকেরা দেশের কি মহৎ উপকার করিতেছেন! পুন বলিলেন—তুমি কি করিবে?

সুলোচনা।—তাহা জানিনা। মেম বলেছেন, তিনি আমাকে উদ্ধার করিবেন। সেই আশায় আছি।

বিনোদ বাবু।—তুমি তাঁহার সহিত যাইবে?

সুলোচনা।—অন্য উপায় যদি না পাই, তবে যাইব। কিন্তু দিদির কয়েকটী বন্ধু বলেছেন, আমাকে দেশান্তরে লইয়া যাইবেন। তাঁহারা যদি কোন উপায় করেন, তবে তাঁহাদের সহিতই যাইব, মেমের পথ ধরিব না।

বিনোদ বাবু।—তুমি কি মনে কর হিন্দুসমাজে কেহ তোমাকে স্থান দিবে?

সুলোচনা।—না দিবারই সম্ভব। কিন্তু তাঁহাদিগের কথা অবিশ্বাস করি না।

বিনোদ বাবু সুলোচনার অবস্থা কতক জ্ঞাত হইয়া বড়ই চিন্তিত হইলেন, হৃদয়ের মধ্যে কেমন একটা ভাব উপস্থিত হইল; তিনি কিয়ৎক্ষণ পরেই বাহিরে আসিলেন। পরদিন হইতে প্রত্যহ সেখানে যাইতে লাগিলেন। কমলমণি গোপনে অনেক টাকা লইতে লাগিল, বাহিরের লোকেরা কেহ কেহ বুঝিল, বিনোদ ফাঁদে পড়িয়াছেন। সুলোচনার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইল বটে, কিন্তু বিনোদ বাবু রীতিমত পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক বৎসর চলিয়া গেল। ক্রমে অনেকে বুঝিল, বিনোদ আর সুলোচার ভালবাসা পঙ্কিল নহে। কিন্তু সকলে তাহা বিশ্বাস করিল না। সুলোচনার সহিত আলাপ পরিচয়ের পর হইতেই বিনোদ কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন, হাসি তামাসা তখন হইতে আর ভাল লাগিত না। কোন প্রকার ক্রীড়ায়ও আর আসক্তি রহিল না। সেই সময়কার বন্ধু বান্ধবেরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিল, কিন্তু তাহাতে বিনোদ ভুলিলেন না। ক্রমে কমলমণি বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিল। বিনোদের চেষ্টায় কুলকামিনী ও তখন ব্যবসা ছাড়িয়াছে। কমলমণি ষড়যন্ত্রের উপর ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল, বিনোদের নিন্দা প্রচার করিতে লাগিল, কিন্তু মেয়েরা তাহাতে ভুলিল না। পরে বিনোদের স্ত্রীকে হাত করিল—তাঁহাকে ডুবাইল। কমলমণির আয় একবারেই কমিয়া গেল। অনন্তদেবী সকলই বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার হৃদয় আহ্লাদে পূর্ণ হইল। বিনোদ সৎপথে থাকিয়াই দেশে রহিল, এ সুখ অনন্তদেবীর হৃদয়ে ধরিল না। বিনোদ যেন একটী নূতন সংসার পাতিলেন, তাহার চিন্তাতেই বিভোর, তাহার চিন্তাতেই মাত্র দেশভ্রমণের ইচ্ছা

তখন নিবিয়া গিয়াছে। অনন্তদেবী সন্তানের হৃদয়ে আরো ভাল ভাব ঢালিতে লাগিলেন, সৎকার্য্যে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। সুলোচনা ও কুলকামিনীর প্রতি তাঁহারও মমতা জন্মিল, তিনি বিনোদের মনরক্ষার্থ ইহাদিগের জন্য গোপনে গোপনে কিছু অর্থ পর্য্যন্ত ব্যয় করিলেন। চেষ্টার পরিণাম কি হইল, তাহা প্রথম খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। বিনোদ বাবু যে দিন সুলোচনাদের অন্বেষণার্থ মাতার নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইলেন, সে দিনও কত আশা ছিল, ইহাদিগকে উদ্ধার করিবেন, কিন্তু তাহা পারিলেন না। বিনোদ বাবু অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু সুলোচনাদের কোন সন্ধান পাইলেন না। এই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে নির্ব্বাপিত দেশ-ভ্রমণের বাসনাটী প্রবল হইয়া উঠিল। সুলোচনাকে উদ্ধার করিতে না পারায় তাঁহার হৃদয়ে একপ্রকার সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, তিনি আর ফিরিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেশ ত্যাগের আর একটী কারণ।

অনন্তদেবীর স্বামী অতুল ঐশ্বর্য্যবান লোক ছিলেন। ঐশ্বর্য্যে বীর্য্য ছিল, বীর্য্যে ধর্ম্মনীতি জড়িত ছিল,—তিনি শৈব ছিলেন। তাঁহার দুর্দ্দান্ত প্রতাপে গোপালপুর কাঁপিত। "বম্‌ভোলানাথ বম্‌ভোলানাথ" সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে মুখে থাকিত। তাঁহার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা শোভা পাইত। সুরেশচন্দ্র পিতার কোন গুণই পান নাই বলিয়া, হরেন্দ্রকিশোর চৌধুরী তাঁহার প্রতি বড়ই বিরক্ত ছিলেন। সুরেশচন্দ্রের চরিত্র বড় ভাল ছিল না,—মদ্ খাইতেন, প্রবঞ্চনা জীবনের ভূষণ ছিল। সুরেশচন্দ্রের একটী গুণ ছিল, ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন। সুরেশ বিনোদকে ভালবাসিতেন, বিনোদের হৃদয় ভালবাসাময়, তিনি সকলকেই ভালবাসিতেন। বিনোদ যখন ছোট, তখন সুরেশ পাপের কীট, সুতরাং ভক্ত হরেন্দ্রকিশোরের পুত্রবাৎসল্য বিনোদের উপরে পড়িল। বিনোদ পিতার বড় ভালবাসার পাত্র হইলেন। বিনোদের কচি কণ্ঠের মধুর স্বরে হরেন্দ্রকিশোর ভোলানাথের নাম শুনিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। পিতৃ আজ্ঞায়

শিশু বিনোদ নাচিতে নাচিতে হরগৌরীর কত গুণ কীর্ত্তন করিত! হরেন্দ্রকিশোর তাহা শুনিতেন, এবং আরো নূতন নূতন গান শিখাইতেন। গৃহের সম্মুখে প্রশান্ত, ধ্যানমগ্ন, নিমীলিত-নেত্র মহাদেবের মূর্ত্তি, শৈশব সময় হইতে সেই মূর্ত্তিকে বিনোদ ভক্তি করিত, পিতার আজ্ঞায় সাষ্টাঙ্গে প্রত্যহ প্রণিপাত করিত। ঐ প্রশান্তমূর্ত্তি বিনোদের বাল্যকালের একটী প্রধান আকর্ষণের বস্তু ছিল। পিতার জলন্ত বিশ্বাস বিনোদের প্রাণে অবতীর্ণ হইল, শিশু ভক্তিকে প্রাণে মাখিয়া সংসারে নামিল। বয়স যতই বাড়িল, ততই সেই ভক্তি ঘনীভূত হইল। হরেন্দ্রকিশোর বিনোদের ভক্তি-ভাব দেখিয়া সুখী হইলেন, প্রাণের সহিত বিনোদকে ভালবাসিতে লাগি-লেন। কিন্তু বিনোদ যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতেই হরেন্দ্রকিশোর ইহসংসার পরিত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর সময়ে বিষয় সম্পত্তি সকলই বিনোদের নামে লিখিয়া দিলেন। বিষয় দিলেন, এবং নগদ সম্পত্তি সমস্ত বিনোদের জন্য অনন্তদেবীর নিকট রাখিলেন। উইলপত্রে লিখিলেন, বিনোদ পিতৃধর্ম্ম ও কুলরক্ষা না করিলে কিছুই পাইবে না। পিতার মৃত্যুর পর অনন্তদেবী বিনোদকে স্কুলে পাঠাইলেন। সুরেশচন্দ্র বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। সুরেশের হাতে বিষয়ের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। নগদ সম্পত্তি অনন্তদেবী গোপনে রাখিলেন। বিনোদ যে ভক্তি বিশ্বাস লইয়া স্কুলে গেল, জ্ঞানলাভের সহিত তাহা ক্রমে হৃদয়ে অটল হইল। কুসংস্কার আর জ্ঞান, এ দুটী পরস্পর চিরশত্রু। জ্ঞানের অভ্যুদয়ে কুসংস্কার ক্রমেই বিনোদের হৃদয় মনকে পরিত্যাগ করিল, বিনোদ মহাদেবের উপা-সকই রহিলেন, কিন্তু তাহা সীমাবদ্ধ স্থানকে অতিক্রম করিল। গৃহের মহাদেব কৈলাস পর্ব্বত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইলেন, কৈলাস পর্ব্বত হইতে অনন্ত আকাশে। পিতার ধর্ম্মের প্রকৃত-তত্ত্ব বিনোদ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করি-লেন,—হর আর গৌরী,—পুরুষ আর প্রকৃতি,—জ্ঞান আর প্রেম,—ধর্ম্ম আর সংসার। হর মহাযোগী—কেবল জ্ঞানোন্মত্ত, কেবল বৈরাগী, কেবল অনাসক্ত; গৌরী প্রেমরূপিনী—কেবল শান্তিময়ী, কেবল অনুরাগিনী, কেবল আসক্তিময়ী। হর লালায়িত—অপার্থিব বস্তুর জন্য; গৌরী অন্নপূর্ণা, ব্যস্ত—কেবলই সংসারের জন্য। মহাযোগী মহাধ্যাননিমগ্ন, মহামায়া মায়া-নিমগ্ন। দুই মিলিয়া পূর্ণধর্ম্ম। সংসার-প্রেমরূপিনীকে বামউরুতে স্থাপন করিয়া মহাযোগী জ্ঞান-স্বর্গকে আকর্ষণ করিতেছেন! কি অপূর্ব্ব ধর্ম্ম!

বিনোদবাবু স্কুলে জ্ঞানলাভ করিয়া পিতার ধর্ম্মের প্রকৃততত্ত্ব উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম করিলেন। পিতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। বিনোদ পিতার ধর্ম্ম লইয়াই সংসারপথে চলিলেন। বিনোদের কুসংস্কার-বর্জ্জিত ধর্ম্মের অনাবিল প্রতিবিম্ব অলক্ষিতভাবে মাতার হৃদয়ে পড়িল। সন্তানের সহিত মাতাও ধর্ম্মসম্বন্ধে উন্নত হইতে লাগিলেন। অনন্তদেবী গুপ্ত সম্পত্তির কথা এই সময়ে বিনোদকে বলিলেন। বিনোদ পিতার উইলের বিষয় পূর্ব্বে কিছুই জানিতেন না, এই সময়ে শুনিলেন। সুলোচনার সহিত যখন আলাপ ঘনীভূত হইল, তখন হইতে বিনোদের একটু ভাবান্তর হয়। কেন ভাবান্তর হয়, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। যাহারা বিনোদের স্বভাবে কলঙ্ক আরোপ করিত, তাহারাও জানে নাই, যাহারা ভাল বলিত তাহারাও জানে নাই। এই সময় হইতে বিনোদ ভাবিতেন, কেন বিবাহ করিয়াছি? যাহার সহিত মন মিলে না, তাহার সহিত কেন মিলিয়াছি! এই চিন্তার সহিত ক্রমে ক্রমে মাতার প্রতি একটু অশ্রদ্ধা জন্মিল। লোকে তাহা জানিত না, লোকেরা তাহা বুঝিত না। মাতা পূজ্য, মাতা আরাধ্য, সেই মাতার প্রতি অশ্রদ্ধার কারণ জন্মিল, ইহা বিনোদের প্রাণে সহিত না। যাহা হইয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না। কর্ত্তব্যের অনুরোধে ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া লোক যতদূর অগ্রসর হইতে পারে, ততদূর বিনোদ অগ্রসর হইয়াছিলেন, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এক বোটায় দুটী ফুল, এক শাখায় দুটী পাখী, এক নদীতে দুটী তরঙ্গ ফুটিতেছিল, খেলিতেছিল, হাসিতেছিল; অসময়ে তাহা বৃন্তচ্যুত হইল, অসময়ে তাহা বিচ্ছিন্ন হইল। মিলনের শাস্ত্র বিনোদ পাইলেন না, বুঝিলেন না, ধরিতে পারিলেন না, তাই তিনি দেশত্যাগী হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুলোচনা ও বিনোদ।

কলঙ্ক আরোপ করিতে চাও, কর। কুসুমে কীট, মৃণালে কণ্টক, অমৃতে বিষ, নিঃস্বার্থে স্বার্থ, এ সকল দুঃখের স্বপ্ন, বিষাদের সঙ্গীত, সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহা সত্য, তাহাকে কে প্রচ্ছন্ন রাখিবে? ধর্ম্মের জটা দৃঢ়রূপে বাঁধিতে

না বাঁধিতে সংসারমায়া সে জটা ভাঙ্গিয়া দিল; চরিত্রের বাঁধ দৃঢ় হইতে না হইতে প্রবল বন্যা সে বাঁধ তুলিয়া ফেলিল। বিনোদবাবুর নিঃস্বার্থ হৃদয়ে স্বার্থচিন্তা ক্রমে ক্রমে জমিল। যে সময় হইতে সুলোচনার চক্ষের জলে বিনোদের চক্ষের জল মিশিতে লাগিল, সেই সময় হইতে এই দারুণ চিন্তা উপস্থিত হইল—সুলোচনাকে উদ্ধার করিতে পারিলেও কি সমাজে ইহার জন্য স্থান পাইব?—এ ফুলের আদর কি সমাজে হইবে?—এ কুসুমকে যত্ন করিয়া কেহ কি হৃদয়ে স্থান দিবে? চিন্তার কত চিন্তা মিশাইল, কিন্তু বিনোদের মন সুস্থ হয় না। একদিকে নিরাশ্রয়া ভগ্নীদিগকে কত উৎসাহের কথা বলিয়া আশ্বস্ত করেন, অন্যদিকে প্রাণের মধ্যে অদম্য চিন্তার স্রোত প্রবাহিত। মুখের কথা মুখে, প্রাণের ভাব প্রাণে, মুখে প্রাণে মিল হয় না। সে কথা জমিবে কেন?—বিনোদ মনে করেন, খুব উৎসাহ দিতেছেন; কিন্তু কাজে কিছুই হয় না। মুখ যে কথা কয়, প্রাণ তাহাতে সায় দেয় না;—প্রাণ চিন্তায় কাতর। এ কপটতায় বিনোদ কিছুদিন দারুণ যাতনা পাইলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া ঊর্দ্ধে স্থান না পাইয়া এক সিঁড়ি নিম্নে নামিলেন, মনে করিলেন, আর কাহাকেও না পাই, আমিই এ ফুলের যত্ন করিব। নির্মল আকাশে স্বার্থ মেঘ জমিল। জমিল—কিন্তু এ স্বার্থেও দোষ মিশিয়া রহিল। বিনোদ বিবাহিত, সে চিন্তা প্রথমে করিলেন না, সে বিবাহকে বিবাহ বলিয়াই পূর্ব্বে স্বীকার করিতেন না, করিলেই বা কি, হিন্দুসমাজে বহুবিবাহ তত দূষণীয় নয়। বিনোদের মুখ ও প্রাণ যখন মিলিয়া এক হইয়া ভগ্নীদিগকে উৎসাহ দিল, তখন সুলোচনা ও কুলকামিনী মাতিয়া উঠিলেন। কত তেজ, কত বল, কত উৎসাহ শুষ্কবৃক্ষে যেন সঞ্চারিত হইল। কয়েক দিবসের মধ্যেই সুলোচনা বিনোদবাবুর মন বুঝিলেন। সুলোচনা এই সময়ে যৌবনে পদার্পণ করিতেছেন। প্রকৃতি রূপভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে, অলক্ষিত গুপ্ত স্থান হইতে কত শোভা, কত সৌন্দর্য্য, কত অমৃত, কত মাধুর্য্য ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। কখন ফুটে, তাহা কেহ জানে না, তাহা কেহ দেখে না, অথচ সুলোচনা কাল যেমন ছিল, আজ আর তেমনটী নয়, ছ মাস পূর্ব্বের সহিত অদ্যকার সুলোচনার তুলনাও হয় না। সুলোচনার রূপ বিনোদের প্রাণে, বিনোদের রূপ সুলোচনার প্রাণে ভাসিল। যে বিনিময় হইল, তাহা অন্য কেহ বুঝিল না, বিনোদের চোক্ মুখ দেখিয়া সুলো-

চনা বুঝিল, সুলোচনার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বিনোদ বুঝিলেন। আচার ব্যবহার তেমনি পূর্ব্ববৎ, কথাবার্ত্তা তেমনই পূর্ব্ববৎ—সকলই পবিত্রতা-ময়। দুই জনই পবিত্র, সুতরাং পদস্খলনের সম্ভাবনা রহিল না। ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রহিল, নীতি অক্ষুণ্ণ রহিল। বিনোদ সুলোচনাকে উদ্ধার করিলেন, আর স্থান না পাইয়া গৃহে আনিলেন। বিনোদের স্ত্রী পূর্ব্বেই বিরক্ত ছিল, এই ঘটনার পর উন্মত্তের ন্যায় হইল, যে উপায় পাইল, সেই উপায়ই ধরিল; শত্রুকে ঘরে আনিল—বিপদকে আহ্বান করিল। সুলোচনা সকলি বুঝিল। সে তখনি বুঝিল—সুধা কেবলই সুধা নহে, তাহা গরল মিশ্রিত। বিনোদের গৃহকে অল্প সময়ের মধ্যেই কণ্টকাকীর্ণ অরণ্য বলিয়া সুলোচনা বুঝিল। তাহার মন ঐ গৃহে বসিল না। বিনোদ পূর্ব্বে তত বুঝিতে পারেন নাই; সেই রজনীতে সকলি বুঝিলেন। কি কষ্ট, কি যাতনা পাইলেন, তাহা পৃথিবীর কোন লোক বুঝিতে পারিল না। যখন জানিলেন, সুলোচনা ও কুলকামিনী গৃহে নাই, তখনই সংসার সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিলেন। কিন্তু আসক্তি সে বৈরাগ্য-উপদেশ শুনিল না, সে বিনোদকে অনুসন্ধানের পথে বাহির করিল। অনুসন্ধানে যখন মিলিল না, তখন হঠাৎ বিনোদের মনে হইল, যাহা হইয়াছে, ভালই হইয়াছে। মনপাখী সংসারশৃঙ্খল কাটিয়া উড়িতে চেষ্টা করিল। এদিকে সংসারে হই-চই পড়িয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিনোদের নূতন সংসার।

মানুষ নিতান্ত অদূরদর্শী, পরিণাম ইহার নিকট গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। অন্ধকারে ঢাকা না থাকিলে, কেহ জীবনপথে চলিতে পারিত না। ভবিষ্যতে যে সকল বিপদকে বুক পাতিয়া আলিঙ্গন করিতে হইবে, তাহা যদি মানুষ পূর্ব্বেই স্থির নিশ্চয়রূপে জানিতে পারিত, তবে তাহার পা ভাঙ্গিয়া পড়িত, সংসার-লীলাখেলা তাহার দ্বারা হইত না। "কার্য্য-কারণ" সূক্ষ্ম-ভাবে আলোচনা করিয়া বিজ্ঞ মানবেরা কিছু কিছু পরিণাম ঠিক করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাও সন্দেহ-মিশ্রিত, ঠিক যাহা ঘটিবে তাহা বলিতে

পারা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। মানুষ যে স্বাধীন, ইহাই তাহার একটী প্রমাণ। মানুষ ভবিষ্যতে কি করিবে, তাহা জানে না। আজ যে পথকে ভাল বুঝিয়া ধরিয়াছি, দশদিন পরে যে ঠিক সেই পথ ধরিয়াই থাকিব, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। মানুষ যখন যাহা ভাল বুঝে, তখন তাহাই করে। মানুষ যাহা সুধা বলিয়া ধরে, তাহাতেও গরল ভাসে; যাহাকে আলো বলিয়া আলিঙ্গন করিতে যায়, তাহাতেও আঁধার ফোটে। নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগে কাহার ইচ্ছা নয়? কিন্তু তাহার অধিকারী কে? মোট কথা, মানুষ ভবিষ্যৎ জানে না, সে তাহা চিন্তাও করে না,—পরিণাম বুঝিয়া মানুষ চলিলে সংসার বাসের অযোগ্য হইত। যখন যাহা ভাল বুঝে, মানুষ তখন তাহাই করে। এই জন্য একজন যাহা করে, অন্যজনের নিকট তাহা ভাল না লাগিলে কখনও সে তাহা করে না। পরিণাম কে ভাবিতে পারে?—তুমি পরিণামদর্শী, সন্তানসন্ততির জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছ; নিশ্চয় কি তুমি বলিতে পার, সঞ্চিত অর্থ তোমার সন্তানের উপকারে আসিবে? নেপোলিয়ন সেণ্টহেলেনায় বন্দী হইলেন, পূর্ব্বে জানেন নাই; সিজর্ বন্ধুর হস্তে মরিবেন, পূর্ব্বে জানেন নাই, যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশে মরিবেন, পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই; বিমল জ্যোৎস্না-মাখা হ্রদ-তরঙ্গ চৈতন্যের প্রাণ কাড়িয়া লইবে, তিনি পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। মানুষের প্রাণের অপূর্ণ পিপাসা মিটিতে না মিটিতে কোন্ লুক্কায়িত স্থান হইতে বিপদ উঠিয়া তাঁহাকে গ্রাস করে, তাহা মানুষ চিন্তা করিতেও অক্ষম। এই জন্য পরমার্থ-চিন্তায় উন্নত জ্ঞানী মানবেরা জীবনের সকল ভার অলক্ষিত প্রকৃতিরাজ্যের গুপ্ত শক্তির উপর সমর্পণ করিয়া বলেন, "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" দুঃখ বুঝি না, সুখও বুঝি না, বিপদও বুঝি না, সম্পদও বুঝি না আলোও বুঝি না, আঁধারও বুঝি না, যাহা ঘটে ঘটুক, অবিচলিতভাবে তাহাকেই আলিঙ্গন করিব।" এই বলিয়া অবিচলিত ভাবে ভ্রূক্ষেপ-বিরহিত হইয়া ভগবানের সংসার স্কুলে মানব শিক্ষা করে, লীলা খেলে।

বিনোদ বাবু ধনীর সন্তান, সুখবিলাসের দাস, মায়ের কত আদরের ধন, যখন বাড়ী হইতে বাহির হইলেন, তখন আর পরিণাম চিন্তা করিলেন না। যাইতে যাইতে, হাটিতে হাটিতে, কষ্টযন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। ইচ্ছা হইল অমনি কুলি আফিসের প্রলোভনে

পড়িলেন। আসামের পার্ব্বত্য প্রদেশের চা-ক্ষেত্রে গেলেন। সাহেবদিগের অনুগ্রহে কুলির কার্য্য অধিক দিন তাঁহাকে করিতে হইল না, কেরাণী হইলেন। কেরাণী অবস্থায় অনেক দিন কাটাইতে হইল। পরে চার কার্য্য ভালরূপ শিখিলেন, বেতন বাড়িল, বন্ধু জুটিল। এ সকল খাটুনি কেন খাটিলেন, তিনিও তাহা জানেন না। ইচ্ছা হয় না, দেশে যান না, ইচ্ছা হয়, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়ান, আর আফিসের কার্য্য করেন। মনের অবস্থা কি প্রকার, কি ভাবেন, তাহা একটী বন্ধু জানে। বিনোদের একটী বন্ধু সেখানে একজন সাহেব, আর একটী বন্ধু, একজন কুলি। বাঙ্গালীর বন্ধু সাহেব, সাহেবের বন্ধু বাঙ্গালী। আজ কাল ইহা চিন্তা করিতেও অনেকে অক্ষম। আজ কাল সাহেবেরা বাঙ্গালীর ঘৃণার জিনিস, বাঙ্গালীরা সাহেবের ঘৃণার জিনিস্। তখন উভয় জাতির মধ্যে এত ঘৃণা বিদ্বেষ ছিল না। তখন সাহেবেরা বাঙ্গালীর সহিত মিশিবার জন্য সময়ে সময়ে বাঙ্গালীর বেশ ধরিত। বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার অনুকরণ করিত। এক্ষণ সাহেব-ঘেঁষা একদল বাঙ্গালী দেখা যায়, তখন বাঙ্গালী-ঘেঁষা সাহেব অনেক দেখা যাইত। কালের পরিবর্ত্তনে এখন সাহেবের নাম ধরিয়া অনেক বাঙ্গালী সাহেব সাজিতে প্রস্তুত হইয়াছে। মোট কথা, তখন বাঙ্গালী সাহেবের বেশ ধরিত না, সাহেবের অনুকরণ করিত না, ঘৃণাও করিত না। যে কুলি বিনোদকে ভালবাসিত, সে কুলির নাম জিতন, জিতন পাহাড়ী। যে সাহেব বিনোদকে ভালবাসিত, তাহার নাম এণ্ডারসন্। জিতন বীরপুরুষ, বলবান, ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী, কোন গুপ্ত উদ্দেশ্যে চা-বাগানে কাজ করিতেছে। জিতন বিনোদকে প্রাণের মত ভালবাসিত, কিয়দ্দিবসের মধ্যে এরূপ ভাব হইয়াছে, জিতন একদিনও বিনোদকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না। জিতন বিনোদকে লইয়া পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াইত,—কত কি দেখাইত, কত কি শুনাইত, কত কি বলিত। জিতন বিনোদকে ভালবাসিত, ভক্তি করিত; বিনোদও জিতনকে স্নেহ করিতেন। পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে বিনোদ যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, জিতন তখন বিনোদকে কোলে করিয়া সুস্থ করিত; সময়ে সময়ে পাহাড়ের ফল পাড়িয়া খাওয়াইত, ঝর্ণার জল পান করাইত। জিতনের প্রাণভরা আকাঙ্ক্ষা, বুক ভরা ভালবাসা। বিনোদের দুটী পরিবার, একটী এণ্ডারসনের, অপরটী, জিতনের; জিতনের স্ত্রী বর্ত্তমান নাই, একটী পালিত

কন্যা আর একটী পুত্র আছে। বিনোদ যে কয়েকটী টাকা পান, তাহা জিতনকে দেন, কারণ জিতনের আয় অল্প, এণ্ডারসন যাহা পান, তাহাতেই বিনোদের চলে। এই প্রকারে আসামের পার্ব্বত্য প্রদেশে বিনোদ বাবু নূতন সংসার পাতিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিনোদ, এণ্ডারসন ও জিতন।

এণ্ডারসন বিনোদের গৃহের সকল কথা জানে। বাঙ্গালী পরিবারের কাহিনী শুনিতে এণ্ডারসন বড়ই ভালবাসিত। এণ্ডারসন বিনোদকে ভালবাসিত, সুতরাং বিনোদের ভালবাসার জিনিষগুলিও এণ্ডারসনের প্রিয়। এই পর্য্যায়েই প্রেম বিস্তৃত হয়। এণ্ডারসন ভালবাসেন বিনোদকে, বিনোদ ভালবাসেন জিতনকে, সুতরাং এণ্ডারসন জিতনকেও ভালবাসেন। এণ্ডারসন বিনোদের বাড়ীর কাহাকেও দেখেন নাই, তবুও অনন্তদেবীকে ভালবাসেন, শান্তিময়ীকে ঘৃণা করেন, সুলোচনার জন্য অশ্রু ফেলেন। কল্পনায় বিনোদের মায়ের ছবি, সুলোচানার ছবি কত সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়া এণ্ডারসন চিন্তা করেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া পূর্ব্বে সুখ পাইতেন, আজকাল সে ভাব গিয়াছে, আজ কাল কেবল চিন্তায় সুখ পান না, বিনোদের দেশে যাইতে সাহেবের বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। এণ্ডারসন বিনোদকে একদিন বলিলেন,—'বিনোদ, চল আমরা বাড়ী যাই, মাকে দেখিব, সুলোচনাকে দেখিব।'

অনেকদিন হইল বিনোদ বিদেশে আসিয়াছেন, কিন্তু দেশের কোন সংবাদ রাখেন না, রাখিতে ইচ্ছাও হয় না।

বিনোদ এণ্ডারসনকে বলিলেন—যেখানে থাকি সেই বাড়ী, যাহাদিগকে ভালবাসি, তাহারাই পরিবার; সঙ্কীর্ণ স্থানে প্রাণকে কেন আবদ্ধ করিয়া রাখিব?

এণ্ডারসন বলিলেন,—সঙ্কীর্ণ স্থানে আরম্ভ না করিলে অনন্তকে মানুষ বুঝিতে পারে না, ক্ষুদ্র মানুষ-সোপান ধরিয়া তবে লোক অনন্ত ঈশ্বরকে বুঝিতে পারে; সীমাবদ্ধ ভাব লইয়াই সংসার,—সমাজ, মানুষ।

বিনোদ।—সঙ্কীর্ণ স্থানে আরম্ভ করিয়াছি; চিরকাল কেন তাহা লইয়াই থাকিব?

এণ্ডারসন।—মানুষের ধর্ম্ম কে অতিক্রম করিতে পারে?

বিনোদ।—চেষ্টা করিলে সকলেই পারে।

এণ্ডারসন।—ভুল কথা! তুমি তোমাকে যেমন ভালবাস, এমন কি আর কাহাকেও ভালবাসিতে পার? তোমার মাকে যে প্রকার ভালবাস, এ প্রকার কি জগতের সকলকে ভালবাসিতে পার?

বিনোদ।—আজও পারিতেছি না বটে, কারণ আজও সাধনায় সিদ্ধ হই নাই, কিন্তু এমন দিন আসিবে, যখন সকলকেই সমভাবে ভালবাসিতে পারিব।

এণ্ডারসন।—যখন পারিবে, তখন তাহাই করিও। এক্ষণ যাহাদিগকে ভালবাসিতেছ, তাহাদিগের ভালবাসা ছিন্ন করিবে কেন?

বিনোদ।—ছিন্ন করি নাই, ছিন্ন করাকে পাপ মনে করি।

এণ্ডারসন।—তবে মাতার কথা ভাবিবে না কেন? তবে সুলোচনার জন্য চিন্তা করিবে না কেন?

বিনোদের মুখ গম্ভীর হইল, বলিলেন, চিন্তা করিব কেন? বাল্যকালে পিতার মুখে শুনেছি—ভক্তের জীবনে কখনও অমঙ্গল ঘটে না।

এণ্ডারসন—একটু স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সুলোচনার সহিত কখনও মিলিবে, বাসনা আছে কি?

বিনোদ।—বাসনা আছে, তাহাও বলি না; নাই, তাহাও ঠিক নহে। এই মাত্র জানি—যাঁহার ইচ্ছায় মানুষ মিলিত হয়, তাঁহার ইচ্ছা হইলে মিলিব।

এই প্রকার প্রশ্নোত্তর প্রায় প্রত্যহই হইত। মন উন্নত বুঝিয়াই এণ্ডারমন বিনোদের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। এণ্ডারসন্ কিছু সংসারী, বিনোদ কিছু কিছু বৈরাগী। সংসারে বৈরাগ্য, বৈরাগ্যে সংসার মিলিয়া উভয়েরই উন্নতির কারণ হইল। উভয়ে উভয়ের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। প্রত্যহ যে সকল কথাবার্ত্তা হইত, উভয়ে তাহাই আবার নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতেন সে চিন্তায় উভয়েই উভয়ের মনের ভাব বুঝিতেন; উভয়ের জীবনের আংশিক সত্য যখন মিলিয়া আসিত, তখন সেই সত্য উভয়েই গ্রহণ করিতেন।

উভয়ের জীবনেরই উন্নতি হইতে লাগিল; কিন্তু দুইজন দুই ভিন্ন পথে চলিতে লাগিলেন। দুটী ঝরণা বহিয়া একটী নদী—সে নদী আবার দুই দিকে চলিল। এক নদী যায় সংসারের দিকে, আর এক নদী যায় বৈরাগ্যের দিকে। এক নদী যায় জ্ঞানের রাজ্যে, আর নদী যায় প্রেমের রাজ্যে। একটী চায়, বহির্দ্দেশ ভ্রমণ করিয়া অপার-জলধিতে মিলিতে; আর একটী চায়, অন্তরের নিগুঢ়তম প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া নীরবে সাগরে মিশিতে। একটী চায়, বাহির দিয়া ভিতরে যাইতে; আর একটী চায়, ভিতর দিয়া বাহিরে যাইতে। স্বীয় স্বীয় পথে ভ্রমণ করিয়া কিয়দ্দিবস পরে উভয়েই উভয়ের বিশেষত্ব বুঝিতে পরিল। দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায়—আর বিনোদের প্রকৃতিতে কেমনই এক আশ্চর্য্য কোমল, মধুর প্রেমের আবরণ পড়ে—সে প্রেম স্বার্থের শৃঙ্খলে আর বদ্ধ থাকিতে চায় না। লোকে বলে,—নদীর জলস্রোতের বৈচিত্র্যময়ী গতিতে স্তরে স্তরে বালুকা রাশি নদী গর্ভে স্থিত হয়। বিনোদের জীবনেও তাহাই হইল। স্তরের উপরে স্তর, তাহার উপরে স্তর, কাল প্রবাহ এই প্রকার স্তর সাজাইয়া বিনোদের পূর্ব্বের প্রকৃতিকে ঢাকিয়া ফেলিল—জ্ঞান ঢাকা পড়িল,—সংসার-বুদ্ধি ঢাকা পড়িল। পূর্ব্বে বিনোদের প্রাণ কাঁদিত মায়ের জন্য, সুলোচনার জন্য;—দ্বিতীয় স্তরে ব্যাকুল হইত জিতন ও এগুারসনের জন্য; এক্ষণ ব্যাকুল-প্রাণ চায় যেন জগৎকে ধরিতে। বিনোদের মুখে যে ভাব, প্রাণেও সেই ভাব—এক প্রেমে জগৎকে ধরিব, এক প্রেমে জগৎকে তুলিব। পূর্ব্বে যেখানে জ্ঞান ছিল, আজ কাল সেখানে কেবলই প্রেমের রাজত্ব,—মহাজ্ঞানকে মহামায়া ধরিয়া বশ করিয়াছে। আসামের পার্ব্বত্য প্রদেশের সুরম্য মন-বিমোহন প্রকৃতি সাজিয়া সাজিয়া কালপ্রবাহের তরঙ্গে তরঙ্গে কত ভাব জমাইয়া দিল। তীর ভাঙ্গিয়া নদীগর্ভে চর পড়ে; অগণিত পাহাড় পর্ব্বত, প্রপাত নির্ঝরিণী, বন উপবন, আকাশ নক্ষত্র, চন্দ্র সূর্য্য এই সকল বুক চিরিয়া ভাব ঢালিল, সেই ভাব রাশি সময়-প্রবাহ জমাট করিয়া বিনোদের প্রাণে স্তর সাজাইল! জড় ভাঙ্গিয়া জড় হয়, এবার জড় ভাঙ্গিয়া অজড় হইল। কলকণ্ঠের মধুর গীত বায়ুতে মিশিল, বায়ু সেই মধুর স্বর লইয়া বৃক্ষপত্র ফুল ফলের সহিত কোলাকুলি করিয়া আসিয়া বিনোদের কর্ণে প্রবেশ করিল,—অমনি সেখানে তাহা জমাট বান্ধিয়া রহিল। পাহাড় পর্ব্বতগুলি বন উপবনকে বুকে করিয়া, সূর্য্যের প্রখর রশ্মিকে শিরে

ধরিয়া, দর্পে দাঁড়াইয়া, যে গম্ভীর, যে নিস্তব্ধ ভাব প্রচার করিল, তাহা বিনোদের প্রাণে জমাট বাঁধিল। ভাব-রাজ্যের দাস, কেবল ভাব লইয়াই রহিলেন। কার্য্য-জগতে, জ্ঞান-জগতে বিনোদের নাম আর রহিল না, সে সকল রাজ্যে বিনোদ মৃত। বিনোদ ক্রমে এমনি হইয়া উঠিলেন, কেবল ভাব লইয়া অলস ভাবে থাকিতে চাহেন। ভাবপ্রবল, অপার্থিব প্রেম-বিহ্বল বিনোদ চায় সকলি, কিন্তু সে জন্য নিজে আর কিছুই করিতে চাহেন না। এণ্ডারসনের এসকল বুঝিতে বাকী নাই। তিনি বিনোদকে জানেন, বিনোদ তাঁহাকে জানেন। উভয়েই জানেন, উভয়ে দুই ভিন্ন সীমায় রহিয়াছেন। অথচ দুইয়েতে মিল রহিয়াছে। মিলন একই রকম রহিল। কি গুপ্তমন্ত্রে উভয়ের প্রতি উভয়ে আকৃষ্ট রহিলেন, সংসারের দর্শন তাহা বুঝিতে পারিল না। সংসার-দর্শন বলে, জ্ঞানে জ্ঞানের মিল, প্রেমে প্রেমের মিল। এস্থলে সে শাস্ত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। উভয়ের সকল অভাব পূরণ করিবার জন্য যেন এক দৈব শক্তিতে উভয়ে আবদ্ধ। এণ্ডারসন জ্ঞান বিজ্ঞান লালায়িত,—কাব্যের উপাসক, কেবল সংসার পূজক। তাঁহার নিকট পাহাড় পর্ব্বত নদ নদী, বন উপবন, পশুপক্ষী সকলে কেবল জ্ঞানের কথাই প্রচার করে; ভাব তিনি কোথাও দেখেন না; সঙ্গীত তাঁহার হৃদয়ে অমৃত ঢালে না, ক্রন্দনে তাহার হৃদয়ে উচ্ছ্বাস খেলে না।

জিতন মধ্যস্থলে। বিনোদের মধ্যে যাহা ভাল, তাহাও জিতন গ্রহণ করে, এণ্ডারসনের যাহা ভাল, তাহাও গ্রহণ করে। জিতন উভয়কেই ভালবাসে। জিতন বিনোদের নিকট পায় প্রেম, এণ্ডারসনের নিকট পায় জ্ঞান। জিতন মধ্যস্থলে জিতন পাহাড়ী তাই বলিয়া, পাঠক, তুমি জিতনকে বোকা ভাবিও না। জিতন পাহাড়ী বলিয়া জিতনকে মূর্খ ভাবিও না। জিতনের হৃদয় আছে, জিতনের মস্তিষ্ক আছে, জিতনের সংসার আছে, জিতনের ধর্ম্ম আছে।

বিনোদ, জিতন এবং এণ্ডারসন তিনে এক হইয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনের গতিই অবিচলিত, তিনের গতিই অলক্ষিত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নীরব নিশীথে !

জিতন পাহাড়ী। পাহাড়ীরা অত্যন্ত স্বাধীনতা প্রিয়। অন্য কেহ তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিবে ইহা তাহাদের অসহ্য। এই জন্য পাহাড়ীরা প্রায়ই পরের চাকুরি করে না। তাহারা চাকুরি করাকে ঘৃণা করে। লোকেরা বলিত, জিতন পেটের দায়ে চাকুরি করে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা সত্য নহে। পাহাড়ীদের সহিত জিতনের ঘনিষ্ঠতা ছিল, মধ্যে মধ্যে তাহারা উচ্চ পর্ব্বত হইতে নামিয়া জিতনের বাড়ীতে আসিত, দুই তিন দিন থাকিয়া আবার চলিয়া যাইত। জিতন ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত সাহেববিদ্বেষী ছিল, দায়ে পড়িয়া এণ্ডারসনকে ভালবাসার চক্ষে দেখিত। বিনোদ বাবু তাহা বুঝিয়াছেন; তিনি জিতনের মনের ভাব ফিরাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। সাহেবেরা ভারতের উপকারী, এ সকল কথা জিতন বুঝিতে চাহে না। বিনোদ বলিতেন, সাহেব দিগের দ্বারা আমা-দের দেশের মহৎ উপকার হইবে। জিতন বলিত, অপকার হইবে। বিনোদ বলিতেন, সাহেবেরা পশুদিগকে মানুষ করিয়া তুলিবে, জিতন বলিত, মানুষদিগকে সাহেবেরা পশু করিবে। তর্ক মীমাংসা হইত না; যাহা হইবার নহে, তাহা কেমনে হইবে? বিনোদ বুঝিয়াছিলেন, জিত-নের প্রাণে অদম্য আশার উত্তেজনা;—বুঝিয়াছিলেন, জিতনের মন চক্রান্তে পূর্ণ। সকল আশাই যে জীবনে পূর্ণ হয় না, বিনোদ তাহা জিতনকে বুঝাইতেন। জিতন তাহা বুঝিত না; সুতরাং জিতন যে এণ্ডারসনকে ভালবাসিত, তাহার অঙ্কুরে কীট লুক্কায়িত ছিল। বিনোদকে আপন মতে দীক্ষিত করিবার জন্য জিতন গুপ্ত মন্ত্র-সাধনায় প্রবৃত্ত ছিল।

দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল, নূতন বৎসর ফিরিল। কালের সীমা নাই, কালের অনন্তত্ব মনের আয়ত্তাধীন হয় না সত্য, কিন্তু ঋতু পরিবর্ত্তনে কালের ভাব কতক হৃদয়ঙ্গম হয়। দক্ষিণে যে সূর্য্য হেলিয়া পড়িয়াছিল সেই সূর্য্য ক্রমে ক্রমে মস্তকের উপরে উঠিল,—যে বৃক্ষে পত্র ছিল না, সে বৃক্ষে পত্র ঝুলিল, যে পক্ষীর কণ্ঠে স্বর ছিল না, সে পক্ষীর কণ্ঠ নবরসে পূর্ণ

হইয়া উঠিল। বৃক্ষে পত্র ও ফুল হাসিল, অনন্ত নীলিমায় বিমল চন্দ্রের জ্যোতি ভাসিল। সেই জ্যোতি বিশালবিস্তৃত শূন্য ভেদ করিয়া পৃথিবীতে নামিয়া ফুল্ল কুসুমকে চুম্বন করিল, নদী তরঙ্গে মিশিল। পৃথিবীর লোক গণনা করিল—বৎসর শেষ হইয়া আসিয়াছে, বসন্ত উপস্থিত। প্রকৃতির নিভৃত কক্ষে কক্ষে আনন্দের বার্ত্তা ধীরে ধীরে প্রচারিত হইল। জ্যোৎস্নামাখা নদীতরঙ্গ কুল কুল করিয়া সৈকতে সৈকতে আনন্দের বার্ত্তা ঘোষণা করিতে করিতে চলিতেছে—কত মণি, কত হীরক খণ্ড, কত ফুল যেন নদী বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছে। জ্যোৎস্না খেলে জলের সহিত, জল খেলে বায়ুর সহিত, তিন মিলিয়া এক ভাবে উন্মত্ত, তিনই নৃত্যে বিভোর।

নব বর্ষের নবানন্দের প্রবাহ যখন চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল; তখন সুস্নিগ্ধ সায়ংকালে বিনোদ বাবু প্রায়ই নদীতটে একাকী ভ্রমণ করিতে যাইতেন। একদা নিশিথে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে বসিয়া বিনোদ বাবু ভাবিতেছিলেন,—সেই ক্ষুদ্র মুখ দেখিব, না বিশাল-বিস্তৃত মানবহৃদয় লইয়া থাকিব! সেই ক্ষুদ্র মুখ, মলিন, চিন্তা-কাতর, কি গম্ভীর ভাবপূর্ণ! বোধ হয় যেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিকৃতি সেখানে প্রতিবিম্বিত! সুলোচনা যে আশায় গৃহের বাহির হইল, তাহার সে আশা অপূর্ণই রহিল! সে মলিন মুখে আর হাসি উঠিল না! সে হৃদয়ে গভীর প্রেম-পিপাসা অপূর্ণ ই রহিল! হতভাগিনী জানিল না—বিশ্ববিস্তৃত প্রেম কি? মহামায়ার মায়া জাল অনন্ত প্রসারিত, তাহা কি মনমোহন! কামাক্ষ্যা তীর্থ স্থান,—সতীর অঙ্গবিশেষ এই স্থানেই পড়িয়াছিল! মহাপুণ্য স্থান! মহাযোগী মহাযোগ পরিত্যাগ করিয়া সতীর জন্য উন্মত্ত হইলেন! কিসের চাকুরি কিসের কি? প্রেমের জন্য মহাদেব পাগল, প্রেমের জন্য আমিও উন্মত্ত হইব। প্রেম কি সতীতে?—না বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে? সতীরূপক শব্দ,—মানবহৃদয়ই সতীত্বের আদর্শ। তাই যদি হয়, তবে শাস্ত্রে কেন এক সতীর কথা? কারণ বোধ হয় আর কিছুই নহে,—অনন্তকে ক্ষুদ্রত্বে পরিণত করা মাত্র। অনন্ত ওখানে সীমাবদ্ধ!—মহাযোগী মহাদেবের মহালীলা! মনুষ্যও সেই ছবিতে চিত্রিত! পুরুষ আর স্ত্রী—বিধাতার সৃষ্টি, বিধাতার খেলা! ঐ পাহাড় এই নদী,—কাঠিন্যে কোমলত্ব, শুষ্কতায় সরসত্ব! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সুলোচনা এসকল কিছুই বুঝিল না, জানিল না,—সে দুকুল

হারাইল! আমি মহাপাতকী,—মহামায়াকে যে ছিন্ন করে সে পাষণ্ড! নদীর আদর করিব, কি পাহাড়ের আদর করিব?—মহাদেবের আদর করিব, কি সতীর আদর করিব?—সুলোচনা কি চায়, আর আমি কি চাই?—সুলোচনা মিলনের শাস্ত্র চায়—সে বলে, "দূরত্ব চাই না, নিকটত্ব চাই, ভিন্নত্ব চাই না, একত্ব চাই।" এ অতি সার কথা—মিলন ভিন্ন মানুষ থাকিতে পারে না। যেখানে পাহাড় সেখানেই ঝরণা, সেখানেই নদী ওতপ্রোত ভাবে মিলিত! পাহাড়ে নদীতে মিল, নদীতে নদীতে মিল, পাহাড়ে পাহাড়ে মিল। জড়ে চৈতন্যের মিল, জড়ে জড়ে মিল, চৈতন্যে চৈতন্যের মিল। মিলন ভিন্ন আর শাস্ত্র নাই। সকলেই সকলের সহিত মিলিবার জন্য ব্যস্ত, সকলেই যেন পরস্পরের বিশেষত্ব গ্রহণে লালায়িত। আমি কি মিলিব না?—সেই নিস্তব্ধ নিশীথ সময়ে বিনোদ বাবু ভাবিলেন—আমি কি মিলিব না—দুই হৃদয় কি এক হইবে না?—বায়ু শব্দ করিল, নদী তরঙ্গ কলকল করিল—চতুর্দ্দিকে সেই কলরব প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল "আমি কি মিলিব না?" বিনোদ বাবু উত্তর না পাইয়া ক্ষুণ্ণ মনে আশ্রমে ফিরিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মিলনের দুই দিক—জিতন ও এণ্ডারসন।

সেই বসন্তের জ্যোৎস্না-প্লাবিত শূন্য ভেদ করিয়া দলে দলে পাহাড় হইতে পাহাড়ীরা নামিল। আকাশে বৃষ্টিধারা আর পাহাড়ের লোকধারা একই ভাবে একই গতিতে ধরায় অবতীর্ণ হয়। দলে দলে লোক নামিয়া নির্ভীক ভাবে জিতনের বাড়ীতে উঠিল, তাহাদের হাতে অস্ত্র, কোমরে তীর ধনুক। তাহারা স্বাধীন, সুতরাং তাহারা প্রফুল্ল। জিতন একটু সঙ্কুচিত, একটু চিন্তা-কাতর। লোক যত সভ্য হয়, ততই হিতাহিত জ্ঞান জন্মে। জিতন একটু সভ্য হইয়াছে, একটু হিতাহিত জ্ঞান জন্মিয়াছে। জিতনের হৃদয়ে যে বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, জিতনের সর্ব্বনাশের দিন যেন নিকট! দল দেখিয়া জিতন চিন্তা করিল;—অধিকক্ষণ নহে, এক মুহূর্ত্ত মাত্র। জিতনের হৃদয়ের আগুণ জ্বলিল, আপন পরিণাম বুঝিল, বুঝিয়া বাঙ্গালী রোগ-

কলঙ্ক-বীজ তখনই হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিয়া ফেলিল। স্বাধীন জিতন স্বাধীনতার গীতি ধরিল—দলে মিশিল, সকলকে আলিঙ্গন করিল। জিতন আপন ভাষায় পরে পাহাড়ীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—খবর কি?—

পাহাড়ীরা বলিল—কল্য সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, আমরা অসহায় কুলিদিগকে সাহেবদিগের ঘোর অত্যাচারের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছি বলিয়া অনতিবিলম্বে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট আমাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। ক্ষুধিতদিগকে অন্ন ও তৃষিতদিগকে জল দেওয়ায় আমাদের যে মহাপাপ হইয়াছে, ঘোষিত হইয়াছে, অচিরে আমাদিগকে তাহার প্রায়শ্চিত্তের দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

জিতন পুন বলিল—কি উপায় ধরিলে যুদ্ধ এড়ান যায়?

পাহাড়ী।—আশ্রিত সকলকে প্রত্যার্পণ করিলে, এবং ইংরাজের অধিনতা স্বীকার করিলে।

জিতন।—তোমরা কি তাহাই করিবে?—পাহাড়ীরা গর্জ্জন করিল—সকলের হৃদয়ে একই ভাব জ্বলিল; সকলে মিলিয়া বলিল—প্রাণ থাকিতে নহে। নিজেরা মরিব, তবুও অত্যাচারিত অসহায় কুলিদিগকে পুন সিংহের মুখে প্রত্যর্পণ করিব না। মানুষে তাহা পারে না, আমরা তাহা করিব না।

জিতন এপ্রকার উত্তর পাইবে, তাহা জানিত। জিতন ও প্রদেশের সাহেবদিগের অত্যাচার বিলক্ষণ জানিত। ইংরাজ-রাজ্যে দাস ব্যবসায়ের কলঙ্ক জিতনের প্রাণে সহিত না। স্বামীর সম্মুখে স্ত্রীর অবমাননা, স্ত্রীর সম্মুখে স্বামীর শরীরে প্রহার, মাতার সম্মুখে শিশুর শরীরে বেত্রাঘাত, শিশুর সম্মুখে মাতার শরীরে রক্তপাত জিতন সহিতে পারিত না। সে অত্যাচারের কথা বলা যায় না, তাহা লেখা যায় না। আজও জিতনের বাড়ী এমন একটী নিরাশ্রয়া রমণীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসে পূর্ণ; যাঁহাকে অসহায় স্বামী পুত্রের নিকট হইতে ছিনাইয়া চিরকালের জন্য স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, এবং বলপূর্ব্বক যাহার সতীত্ব নষ্ট করা হইয়াছে। জিতন তাহার দুঃখের কাহিনী শুনে আর প্রাণ জ্বলে, সে অশ্রু-প্লাবিত মূর্ত্তি দেখে আর হৃদয় অস্থির হয়। সেই দেবতুল্য পবিত্র হৃদয় হইতে অনুতাপের উৎস যখন উৎসারিত হয় জিতন তখন তাহা শুনে, শুনিয়া নির্জ্জনে কাঁদে। জিতন হৃদয়বান। হৃদয়বান জিতনের প্রাণের আশা কি পূর্ণ হইবে না?—যাহা হইবে তাহা হইবেই হইবে। বিনোদ বাবুর চেষ্টা ও যত্ন বিফল হইয়াছে—জিতন

আপনি চেষ্টা করিয়া বিনোদ বাবুর সকল কথা ভুলিতে চেষ্টা করিল। জিতন দলে মিশিল—আনন্দে মাতিল; জয় জয় রবে চারি দিক পূর্ণ করিল। তারপর কত কি পরামর্শ করিল, কত কি ষড়যন্ত্র করিল। পরামর্শের শেষ ফল এই হইল, সকলে জোট বাঁধিয়া সাহেবদিগের কুঠী লুট করিতে ধাবিত হইল।

বিনোদ বাবু নদীতীর হইতে ফিরিয়া আশ্রয়ে গেলেন। আশ্রয় এণ্ডারসনের বাড়ী। সেই গভীর রাত্রে গৃহে যাইয়া দেখিলেন, এণ্ডারসনের স্ত্রী বিমর্ষ ভাবে বসিয়া কি যেন চিন্তা করিতেছেন। তেমন বিমর্ষ ভাব বিনোদ আর কখনও দেখেন নাই। বিনোদ বাবুকে দেখিয়াই জেলী ধীরে ধীরে এক খানি পত্র তাঁহার হাতে দিলেন; কোন কথা বলিলেন না। বিনোদ বাবু ভাব গতিকে কিছু বিপদ গণনা করিলেন। ত্রস্তভাবে পত্র খুলিয়া পড়িলেন;—

"প্রিয় বিনোদ,—তোমাকে না বলিয়াই চলিলাম; কোথায় চলিলাম? কোথায় চলিলাম, সময়ে তাহা জানিবে। তোমাকে বলিলে তুমি যাইতে দিবে না, সন্দেহ হইল, সেই জন্যই বলি নাই। আমার জীবনের দুটী কলঙ্ক—একটী—আমি স্বার্থপর—কেবল জ্ঞান পিপাসু, প্রেম পিপাসু নহি; আর একটী—আমি জাতিভেদ না মানিয়া ও ভারতে আসিয়া নূতন জাতিভেদ সৃজনে সহায়তা করিতেছি। তোমার উপদেশেই হউক, কিম্বা যে রকমেই হউক, আমি আমার জীবনের অভাব বুঝিয়াছি। সে অভাব পূর্ণ করিবই করিব। অভাব পূর্ণ না হইলে আর ফিরিব না। যে জাতির অধ্যবসায় আকাশ হইতে নক্ষত্রকে ভূতলে অবতরণ করিতে সমর্থ, সে জাতির অতি নিকৃষ্ট আমি যদি প্রেমের সাধনায়, জাতিভেদ ধ্বংশে কৃতকার্য্য না হই, তবে আর ফিরিব না। ভারতে অভিনব যে দুটী জাতি সৃষ্ট হইতেছে, তাহার শোচনীয় ফলে হৃদয় অস্থির! কিন্তু সে কথা আজ থাকুক।

তোমার নিকটে একটী নূতন সত্য শিক্ষা করিয়াছি—তাহা কখনও ভুলিব না—শতকণ্ঠে তাহা চিরকাল ঘোষণা করিব। মহাদেবকেও চাই সতীকেও চাই;—জ্ঞানও চাই, প্রেমও চাই। জ্ঞান ভিন্ন প্রেমিক অন্ধ, প্রেম ভিন্ন জ্ঞানী কঠোর। মহাদেবকে যদি বুঝিয়াছি—তবে সতীকেও বুঝিব। জ্ঞানকে যদি বুঝিয়াছি, তবে প্রেমকেও বুঝিব। ধর্ম্মকে যদি বুঝিয়াছি, তবে কর্ম্মকেও বুঝিব। সুলোচনা চিরকাল ভাসিয়া বেড়াইবে, সাহেবের প্রাণ ইহা সহ্য করিতে পারিবে না?—তোমার বৈরাগ্য—তোমার

উদাসীনতা দেখিয়া হৃদয়ে ব্যথা পাইয়াছি;—কর্ম্মক্ষেত্রই শিক্ষাক্ষেত্র, সেই ক্ষেত্রে তোমার বিজাতীয় বন্ধু এণ্ডারসন কেবল বৈরাগ্যনীতিকে কখনও আদর করিবে না।

যে সময়ে গেলেম, এ সময়টী যাওয়ার পক্ষে বড় অনুকুল নহে, কিন্তু তাহা ভাবিয়া কি করিব?—পাহাড়ীদিগের অত্যাচার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে—কবে কি হইবে জানি না, কিন্তু তাহা ভাবিয়া বসিয়া থাকিলে কখনও জীবনের বাসনা পূর্ণ হইবে না। তুমি আছ, তুমিই সকল দেখিবে, আমার কর্ত্তব্য আমি করি, তোমার কর্ত্তব্য অবশ্য তুমি করিবে। লোক যাহা চায়, তাহা পায় না। তুমি চাও বৈরাগ্য—ভগবান তোমাকে সংসারী করিলেন। তোমার উপর আমার পরিবারের ভার রহিল—যাহা ইচ্ছা করিও।

জেলীকে তুমি আমাপেক্ষা ভালবাস, জেলী তোমাকে পাইলেই সুখে থাকিবে। কবে ফিরিতে পারিব তাহা ভগবানই জানেন।"

তোমার স্নেহের এণ্ডারসন।

বিনোদ বাবুর পত্র পাঠ সমাপ্ত হইল, মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। নূতন নূতন নানা প্রকার চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। এণ্ডারসনেব স্ত্রী জেলী বুঝিল—বিনোদ বাবু বড়ই কষ্ট পাইতেছেন। জেলীর মস্তক পাতলা হইল—জেলী হাসিয়া বলিল,—'এত ভাবনা কিসের, ঈশ্বর যাহা করেন তাহাই হইবে। এখন আহার করুন।'

বিনোদ বাবু জেলীর কোমল ও সরল ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া আহার করিতে-বসিলেন। গৃহিণী আপনি পরিবেষণে ব্যাপৃত হইলেন। আহারান্তে নিভৃত কক্ষে শয়ন করিয়া বিনোদ কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। এণ্ডারসনের মহত্ত্ব ও উদারতা হৃদয়ে চির-লেখা লিখিল, বিনোদের চক্ষে নিদ্রা বসিল না; আপন জীবনকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মহৌষধে।

জিতনের দল তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া তিন সাহেবের কুঠি লুটিতে চলিল। এণ্ডারসন ভিন্ন আরও দুটী সাহেবের কুঠি ছিল। এণ্ডারসনের

বাড়ীর সিংহ দরজায় যখন পাহাড়ীদের একদল উপস্থিত হইল, তখন বিনোদের চক্ষে নিদ্রা বসে নাই, জেলীর চক্ষে একটু তন্দ্রা বসিতে চেষ্টা করিতেছে। দরজা ভাঙ্গিয়া বাড়ীতে পাহাড়ীরা নির্ভয়ে প্রবেশ করিল। দরজায় যে প্রহরী ছিল, সে হঠাৎ জাগিয়া 'কোন্ হায়, কোন্ হায়' বলিয়া একটু পিছে হটিয়া দেখিল, ব্যাপার সামান্য নহে, অনেক দস্যু কুঠিতে ঢুকিতেছে। সে ভাবিল অদ্য আর নিস্তার নাই, কারণ সাহেব বাড়ীতে নাই। প্রহরী হিন্দুস্থানী, কিন্তু হিন্দুস্থানীদের আর পূর্ব্বের সাহস বা বীর্য্য নাই, সাহেবের গোলামী স্বীকার করিয়া করিয়া সকল তেজ, সকল সাহস মাটী হইয়া গিয়াছে। প্রহরী থাকিয়া থাকিয়া সকল দেখিল; দেখিয়া নিমেষের মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইল। পাহাড়ীরা প্রাঙ্গনে যাইয়া একবার জয় জয় রব হাকিল। সে শব্দ শুনিয়া অন্যমনস্ক বিনোদের চেতনা হইল, তিনি ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। জেলী বিনোদের পূর্ব্বেই সকল বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি একেবারে কতকগুলি কাট্রীজও একটী বন্দুক লইয়া দরজা খুলিলেন। পাহাড়ীদের উপদ্রবের ভয়ে সাহেবেরা সর্ব্বদাই বন্দুক প্রস্তুত করিয়া রাখিত। জেলী বাহিরে যাইয়া দেখিল, বিনোদ পূর্ব্বেই বারাণ্ডায় আসিয়াছেন,—জেলী বলিল,—আমাদিগকে রক্ষা করা আপনার কার্য্য, কি করিবেন?

বিনোদ বাবু নিমেষের মধ্যে উত্তর করিলেন,—মানুষ কি রক্ষা করিবে, রক্ষাকর্ত্তা যিনি, তাঁহাকে স্মরণ করুন।

জেলী একথা শুনিয়া মৃদু-হাসি হাসিল, বলিল, বৈরাগ্যনীতির এ সময় নহে, রক্ষাকর্ত্তাকে স্মরণ না করিয়া এই বন্দুকের আশ্রয় লইলে অনেক কাজ হইবে।

বিনোদ।—রক্ষা হইলে হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে এক জনের জীবনের জন্য আর দশ জনের জীবন যাইবে! খ্রীষ্টনীতি এ নহে।

জেলী বলিল, খ্রীষ্টনীতির সময় চলিয়া গিয়াছে, তাহার খোসা মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। আমার জ্ঞান-বলে বুঝিতো আত্মরক্ষা সকল ধর্ম্মের মূল; আপনাকে যে বিনাশ করে, সে সকল ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয়।

বিনোদ বুঝিল, তর্কে কিছুই মীমাংসা হইবে না, কারণ শত্রু বুকের উপর। বিনোদ ভাবিয়া বলিল, আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন।

জেলী বলিল, আমাদিগকে রক্ষা করা আপনার কার্য্য আমি কি করিব?

বিনোদ বলিল, তা জানি। আমার কার্য্য আমি অবশ্য করিব, কিন্তু উপায় স্বতন্ত্র।

ইতিমধ্যে পাহাড়ীরা বারাণ্ডায় উঠিবার উপক্রম করিল দেখিয়া জেলী হঠাৎ একবার বন্দুকের আওয়াজ করিলেন, কিন্তু লক্ষ্য স্থির হইল না। কোন লোক তাহাতে আহত হইল না দেখিয়া মেম-সাহেব আবার বন্দুক হাতে তুলিলেন। বিনোদ বাবু মহাবিপদ গণনা করিয়া হঠাৎ মেমের সম্মুখে ছুটিয়া যাইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, মারিতে হয়, অগ্রে আমাকে মারুন।

বিনোদের নয়ন প্রান্তে যেন বিদ্যুৎ চমকিল, জেলী সে মুখে এক অলৌকিক জ্যোতি দেখিল। সে তৎক্ষণাৎ হাতের বন্দুক নামাইয়া বলিল, বিনোদ বাবু, আপনি বালক, পাগলামী ছাড়ুন, অসভ্যেরা ধনে প্রাণে মারিবে, আমি তা সহিতে পারিব না; লক্ষ্য-পথ ছাড়ুন।

বিনোদ কথা বলিলেন না, নিমেষের মধ্যে পাহাড়ীদের সম্মুখীন হইলেন। পাহাড়ীদের যে ব্যক্তি অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাকে বিনোদ জ্যোৎস্নার আলোকে চিনিতে পারিলেন; সে ব্যক্তি প্রায়ই জিতনের বাড়ীতে আসিত। তাহার নাম ফেলাই সিং। ফেলাই বিনোদকে দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—সাহেব কোথায়?

বিনোদ বলিল, সাহেব বাড়ীতে নাই—বাড়ীতে তাহার স্ত্রী ও আমি আছি। আজ বৈকালে সাহেব নিরুদ্দেশ হইয়াছেন।

ফেলাই বিনোদের কথা বিশ্বাস করিল, কারণ সে বিনোদকে বিলক্ষণ জানিত, বলিল,—বাবু পথ ছাড়ুন আমরা আজ এ বাড়ী লুটিব। মেম সাহেবকে মারিব!

বিনোদ।—শূন্য বাড়ী লুটিবে, ভারতবাসীর এ ধর্ম্ম নহে—স্ত্রীবধ মহাপাপ।

ফেলাই গর্জ্জিয়া বলিল, লুটিব; ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি না,—দলের আদেশ মানাকেই ধর্ম্ম মনে করি; অত্যাচারীর সর্ব্বস্ব বিনাশ করাকে আমরা পুণ্য কর্ম্ম মনে করি, আপনি পথ ছাড়ুন।

বিনোদ বাবু বলিলেন, আমিই এ বাড়ীর বর্ত্তমান কর্ত্তা, তবে আমাকে অগ্রে মার।

ফেলাই।—তা মারিব না, কারণ তুমি অত্যাচারী নও।

বিনোদ।—এণ্ডারসন সাহেব কি অত্যাচারী?

ফেলাই।—ভয়ানক অত্যাচারী, আপনি এদেশে আসিবার পূর্ব্বে সে না করিয়াছে, এমন কাজ নাই।

বিনোদ একটু অপ্রতিভ হইলেন, বলিলেন, এণ্ডারসন বাড়ীতে নাই, তাহার মেম আছেন, তিনি ত অত্যাচারী নন।

ফেলাই।—তিনি আরো অত্যাচারী—এই যে বন্দুকের শব্দ শুনিলেন, ইহা তাহারই পরিচয়! পথ ছাড়ুন, আমরা বন্দুকের ভয় করি না।

বিনোদ পুন বলিলেন, তোমরা কি করিতে চাও?

ফেলাই।—এই বাড়ীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া নদীতে ভাসাইব, পরে এই বাড়ী মাটীতে মিশাইব।

বিনোদ।—তাতে তোমাদের স্বার্থ কি?

ফেলাই।—স্বার্থ প্রতিশোধ। প্রতিশোধ না তুলিলে আর মানুষ কি জন্য হইয়াছি? পথ ছাড়ুন, আজ প্রাণ ভরিয়া প্রতিশোধ তুলিব।

বিনোদ।—আমি পথ ছাড়িব না, তোমাদের ধর্ম্ম তোমরা পালন কর, আমার ধর্ম্ম আমি পালন করিব, কখনই পথ ছাড়িব না।

ফেলাই একটু উষ্ণ হইয়া বলিল,—পাষণ্ড, কুলাঙ্গার, দূর হ, বাঙ্গালী সাহেবের গোলামী করাকে ধর্ম্ম মনে করে, পাহাড়ীরা মহাপাপ মনে করে, নরাধম দূর হ!

বিনোদ আরো নরম হইয়া বলিলেন, আমি গোলাম, কিন্তু নেমক-হারাম নহি। যাহার দ্বারা উপকার পাইব, তাহার উপকার করিব।

ফেলাই।—আর স্বদেশ?—তাহার নিকট কি কোন উপকার পাস্ নাই?—

বিনোদ।—উপকার যথেষ্ট পাইয়াছি, দেশের জন্যইত জীবনের সকল আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সাহেবের গোলাম হইয়াছি। দেশের উন্নতির জন্য সাহেবের গোলামী করিতেই হইবে,—আর পথ নাই, আর উপায় নাই।

ফেলাই।—তুই পাষণ্ড, তুই নরাধম, তোর ন্যায় নরাধমের দ্বারাই এই বিষ দেশে আসিয়াছে! দূর হ।

বিনোদ।—আমার দ্বারা যদি আসিত, আমি আমার জীবনকে সার্থক মনে করিতাম, একার্য্যে যে সহায়তা করিয়াছে, সে স্বর্গে স্থান পাইয়াছে।

ফেলাই সিংহের চক্ষু রক্তজবার ন্যায় হইল, বলিল, সে প্রতারকের

নরকেও স্থান নাই,—তোরও নাই। স্বদেশবাসীর কষ্ট দুঃখ যে দেখিল না, বুঝিল না, সে পাষণ্ড! এই সাহেবদের দ্বারা দেশের কি অনিষ্ট হইতেছে তাহা কি কখনও দেখিস্ নাই। হায়, দিন দিন কত বিধবা আশ্রয়হীনা, কত মাতা পুত্রহীনা, কত পুরস্ত্রী সতীত্বহীনা, হইতেছেন! চোখ থাকে চাহিয়া দেখ্, দেশের কত অধোগতি হইতেছে!

বিনোদ বিনয়ে নত হইয়া ফেলাইর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন, তারপর বলিলেন, তুমি স্বদেশ বৎসল, কিন্তু ভাই, অধর্ম্মে কি হইবে? এ সংসার লক্ষ্য নহে; উপরে ভগবান আছেন; অত্যাচার হইয়া থাকিলে তিনিই তাহা গণনা করিতেছেন; তাঁহার ন্যায়-দণ্ডে সকল নিয়মিত হইবে। অত্যাচার হইয়া থাকে, এক দিন ইংরাজ-রাজত্ব উঠিয়া যাইবে, এস ভাই, আমাদের কর্ত্তব্য আমরা পালন করি। এস ভাই, আমরা মানুষ হই!

ফেলাই বলিল,—এ অধর্ম্ম, কে বলিল? এই ত প্রকৃত ধর্ম্ম। জীব-শরীরের জন্য যেমন জীব-নাশ প্রকৃতির নিয়ম, জীবের স্বাধীনতার জন্য, শান্তির জন্য, সুখের জন্য, ধর্ম্মের জন্যও রক্তপাত হওয়া আবশ্যক। অধর্ম্ম হইলে আমাকে ও জিতনকে এ কার্য্যে দেখিতে পাইতে না। জিতন ও আমি দশবৎসর পর্য্যন্ত ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়াছি, ধর্ম্ম কথা শুনিয়াছি। এই বলিয়া ফেলাইসিংহ আবার জয় জয় রব হাকিল। ইতিমধ্যে আবার জেলীর বন্দু-কের আওয়াজ হইল, লক্ষ্য ব্যর্থ হইল না, দুইজন পাহাড়ী মাটী কাঁপা-ইয়া শব্দ করিয়া পড়িল। ফেলাই ক্রোধে উন্মত্ত হইল, বিনোদের গালে এক চপটাঘাত করিয়া বলিল, ঠক, প্রতারক, দূর হ,—দেশের কুলাঙ্গার, দূর হ!

বিনোদ বুঝিল, কথার আর সময় নাই—ফেলাইর পা ধরিয়া বলিল, ক্ষমা কর, অপরাধ হইয়াছে। পরে বিনোদ একখানি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ফেলাইর হাতে দিল; ফেলাই তাহা দেখিয়া লজ্জায় মুখ নত করিল, সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ফেলাই অস্থির হইল। ফেলাই আর কিছু না করিয়া বলিল,—আপনাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে আপনার নিকট আমার কেবল এই ভিক্ষা।

বিনোদ ক্ষণকাল কর্ত্তব্য চিন্তা করিলেন, পরে কি ভাবিয়া প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সদলে বিনোদকে বেষ্টন করিয়া সদর্পে ফেলাই পর্ব্বতা-ভিমুখে চলিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

অভিষেক।

বিনোদকে লইয়া ফেলাই সিংহের দল পাহাড়ে উঠিয়া নিভৃত স্থানে পৌঁছিল। জিতনের দল পূর্ব্বেই সেখানে পৌঁছিয়াছিল। জিতন সে দিন জয়ী, ফেলাই জয়ী না হইয়াও জয়ী। ফেলাই জয়ী কেন না, ফেলাই বিনোদকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়াছে। জিতনের বাড়ী ঘর সকলই পাহাড়ে উঠিয়াছে; কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জিতন সকল পাহাড়ে তুলিয়াছে; সে আর দাসত্ব করিবে না, এই প্রতিজ্ঞা। যদি ফেলাই বিনোদকে না পাইত, তবে অদ্যকার জয় অসম্পূর্ণ থাকিত। জিতন জানিত, বিনোদ বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ লোক। জিতন বুঝিত, শরীরের বলে বুদ্ধি বল সংযুক্ত না হইলে চলিবে না। সেই জন্যই বিনোদকে গ্রেপ্তার করিতে ফেলাইকে আদেশ করা হইয়াছিল। সাহেবের সহিত বিনোদের ঘনিষ্ঠ যোগ, ইহা জানিয়া জিতন সর্ব্বদাই আশঙ্কা করিত, কোন্ সময়ে হয় ত ক্রোধোন্মত্ত পাহাড়ীর হস্তে বিনোদের প্রাণ যাইবে। এই আশঙ্কায় জিতন বিনোদের হস্তে একখানি তাম্রফলক দিয়াছিল, সেই তাম্রফলক সাঙ্কেতিক চিহ্ন। জিতন বলিয়া দিয়াছিল, যখন পাহাড়ীরা তোমাকে ধরিবে, তখন ইহা দেখাইবে। সেই সাঙ্কেতিক চিহ্ন বিনোদ সদাই কাছে কাছে রাখিতেন। তাহাতেই অদ্য কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিয়াছেন। ফেলাইসিংহ বিনোদকে পাইয়াই কৃতার্থ হইয়াছে। জিতন বিনোদকে দেখিয়া বড়ই সুখী হইল। বিনোদ সে অপূর্ব্ব স্থান দেখিয়া বিমোহিত হইলেন,—গভীর রজনী—নিস্তব্ধ—নীরব—সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া আকাশ হইতে চন্দ্রের প্রফুল্ল বিমল জ্যোতি নামিয়া নামিয়া গগনভেদী পর্ব্বত শেখরে শেখরে ভাসিতেছে! শেখরের পশ্চাতে উন্নততর শেখর, তাহার পশ্চাতে উন্নততম, এই প্রকারে ক্রমিক উন্নত শেখরগুলি অধিত্যকার ব্যাপার যেন জ্যোৎস্নার আলোকে দেখিতেছে! অধিত্যকায় জিতনের দল! অধিত্যকা সাগরতল হইতে অনেক উচ্চ। অধিত্যকা উন্নত পাহাড় বেষ্টিত। পাহাড় হইতে মৃদু মৃদু ঝরণা কুল কুল করিয়া নামিতেছে—গতি অবিশ্রান্ত। ক্ষুদ্র প্রস্তরে, ক্ষুদ্র বৃক্ষশাখায় সেই

গতির প্রতিরোধে মধুর শব্দ হইতেছে—অবিশ্রান্ত। চতুর্দ্দিকের মৃদু মৃদু শব্দ মিশিয়া এক আনন্দপ্রদ মহারোল নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া গগনে উঠিতেছে। সে গম্ভীর ভাব ভাষায় ব্যক্ত হয় না। তাহাতে কতই মধুরতা, কতই কোমলতা, কতই আনন্দ। যিনি কখনও শুনিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, সেই নিস্তব্ধতায় ঐ মধুর শব্দ, জ্যোৎস্না-প্লাবিত পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া সে স্থানকে এক অভূতপূর্ব্ব গম্ভীর ভাবে পূর্ণ করিতেছে। বিনোদ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলেন! চতুর্দ্দিকে পাহাড়ীরা তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়াছে, পাহাড়ীদের প্রফুল্ল মুখে নব উৎসাহ খেলিতেছে। সে উৎসাহে বীর্য্য—স্বাধীনতার রেখা প্রতিফলিত, সরলতার সুন্দর আভা সুচিত্রিত দেখিয়া, তাহাতে বিনোদ মোহিত হইলেন। সেখানে সংসারের জাঁকজমক বা বেশ ভূষার পারিপাট্য নাই—কিন্তু হৃদয়ের শোভা শরীরকে কতই সুন্দর করিয়া দেখাইতেছে।

জিতন বিনোদের সম্মুখীন হইয়া বলিল, আপনি রাজা, আপনি প্রভু, আমরা আপনার প্রজা, আপনার ভৃত্য; এ রাজত্ব আপনার পক্ষেই শোভা পায়; আমরা অগণিত প্রজাপুঞ্জ আপনাকে এই রাজ্যের রাজপদে বরণ করিতেছি।

বিনোদের প্রাণ মন বিস্ময়ে পূর্ণ হইল, জিতনের কথায় মিথ্যা নাই, তাহাতে প্রবঞ্চনা নাই, তাহাতে কপটতা নাই, তাহাতে অসরলতা নাই, এ বিশ্বাস বিনোদের প্রাণে দৃঢ়বদ্ধ। বিনোদ যেন স্বপ্ন দেখিতেছেন। কথা সরে না—মুখ গম্ভীর, শরীর নিস্পন্দ।

জিতন ঈঙ্গিতে ফেলাইকে নিকটে ডাকিল। ফেলাই নিকটে আসিল। জিতন বলিল,—ফেলাই,তুমি সৈন্যাধ্যক্ষ—রাজার হস্তে তীর ধনুক দেও;—রাজভূষায় নব রাজাকে সাজাও।

ফেলাই আদেশ পালন করিল।

বিনোদ বাবু কম্পিত হৃদয়ে, কম্পিত স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—জিতন তোমার এ কি লীলা দেখিতেছি? আমি সন্ন্যাসী, আমি বৈরাগী, আমাকে কি করিতেছ?

জিতন বলিল,—আপনাকে সন্ন্যাসী ও বৈরাগীর অধিকারীই করিতেছি। পৃথিবীতে সকল থাকিতে যে আসক্তিশূন্য হয়, সেই বৈরাগী, রাজা হইয়াও যে সুখকামনাবিবর্জ্জিত থাকিতে পারে, সেই সন্ন্যাসী। যাহার

কিছুই নাই সে বৈরাগীও নহে,সন্ন্যাসীও নহে। বৈরাগ্য মনে,সন্ন্যাস মনে। মনের সাধনই সাধন। বাহিরের সাধন আমরা মানি না। বাহিরে আমরা অসভ্য, কিন্তু ভিতরে আমরা দেবত্ব লাভ করিতে প্রয়াসী। সকল প্রকার সাধনই মনে। এ সকল কথা আপনার নিকটেই শুনিয়াছি। সুতরাং আপনি এ সকল পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। এই সকল রাখিয়া ভিতরে যদি অনাসক্ত হইতে পারেন, তবেই আপনার সাধনা সিদ্ধি হইবে। অতএব এই রাজধর্ম্ম আপনাকে পালন করিতেই হইবে।

বিনোদ বাবু অসভ্য জিতনের চরণে প্রণাম করিলেন, তারপর বলিলেন, তুমিই রাজাহও, আমি তোমার ভৃত্য হই। তোমার নিকটে অনেক শিখিবার আছে।

জিতন।—আমার নিকট আপনাকে কখনও শিখিতে হইবে না—আমি মূর্খ, আমি অসভ্য, আমি অধার্ম্মিক; আপনার কথাই আপনাকে পালন করিতে হইবে। মনুষ্যের শরীর পৃথিবীতে কখনও রাজত্ব করিতে পারিবে না—চরিত্রবান্ হৃদয়ই রাজত্ব করিবে। আপনি চরিত্রে দেবতা। আমরা পশু—পশুর দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। ইহা আপনারই কথা। পশুর ধর্ম্ম, হিংসা,—হিংসায় কখনও রাজ্য রক্ষা হয় না। অহিংসা ভিন্ন রাজ্য রক্ষা অসম্ভব। সুতরাং আপনিই রাজা হইবেন।

বিনোদ।—কথায় তোমার নিকট হারিলাম। রাজার কি করিতে হয়,বল।

জিতন বলিল,—আপনি কি সকলিই ভুলিয়াছেন?—আপনার নিকটেই সকল শুনিয়া শিখিয়াছি, এবং তদনুসারে জীবনে কার্য্য করিয়াছি। এ দল আপনার কথা মতই হইয়াছে। আজ আপনার কথাই আপনাকে বলিব। "উন্নত চরিত্রের কর্ত্তব্য অবনতদিগকে উন্নত করা, বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য মূর্খদিগের বুদ্ধি পরিচালনার সহায়তা করা, জ্ঞানীর কার্য্য অজ্ঞানীকে জ্ঞান দান করা।" রাজার কার্য্য ইহাই। বুদ্ধি, চরিত্র, প্রেম ও জ্ঞানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। এই অসংখ্য পশুকে আপনি মানুষ করিবেন। যাহারা কাটাকাটী করিয়া মরে, তাহাদিগকে আপনি প্রেমের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন।

বিনোদ।—বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম কি, এসম্বন্ধে লোকের বড়ই কুসংস্কার জন্মিয়াছে—সাম্প্রদায়িকতাই ধর্ম্মের জীবন হইয়াছে। লৌকিক ধর্ম্মেরই রাজত্ব। আমার কথা জগতে থাকিবে না।

জিতন একটু উষ্ণ হইয়া বলিল—ভবিষ্যৎ কে জানে, কে বুঝে? সত্য যাহা তাহা জগতে থাকিবে। জীবন হইতে একটী জীবন্ত সত্য বাহির হইলে, অনন্ত কাল তাহার রাজত্ব থাকিবে। যখন জীবন পাইবেন, তখনই তাহার কার্য্য হইবে। যে কখনও জীবনে সত্য পালন করে নাই, সেই নিরাশার স্বপ্ন দেখে। সত্যবীর, সত্য সেবক,—সত্য যাহার আহার ও পানীয়, সে নিরাশার স্বপ্ন দেখে না। অতএব কি থাকিবে, কি থাকিবে না, তাহা ভাবিয়া কোন প্রয়োজন নাই, আপনি রাজার উপযুক্ত, আপনি রাজা হউন।

বিনোদ আর কোন কথা বলিলেন না। সেই নিস্তব্ধ গভীর রজনীতে জিতন বলপূর্ব্বক বিনোদকে নূতন রাজ্যে অভিষেক করিল।

বিনোদ রাজা হইলেন, ফেলাই সৈন্যাধ্যক্ষ হইল। অসংখ্য সৈন্য সামন্ত লইয়া ফেলাই পর্ব্বত কাঁপাইয়া ভৈরব রব করিল। ইচ্ছা অনিচ্ছাকে বলিদান দিয়া বিনোদ জিতনের কথা পালন করিতে বাধ্য হইলেন।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ডাকাতের মাঠে।

অনাথনগরের নীচে একটী ক্ষুদ্র নদী। সুন্দর বনের অপ্রশস্ত নদী,—স্রোত অতি প্রবল। জোয়ারে তীরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া স্রোত কৃষকের ধান-ক্ষেতে প্রবাহিত হয়। ধান ক্ষেতের একধারে নদী, একধারে অনাথনগরের নিবিড় অরণ্য। অরণ্যের পশ্চিমে অনাথ নগর। ঐ অরণ্যের নীচেই প্রবল স্রোত ধান-ক্ষেতে প্রবাহিত। ধান গাছের গলায় গলায় স্রোত। স্রোতের কলকল রবে নিত্য অরণ্য পুলকিত। ধানগাছের সহিত স্রোতের কতই কোলাকুলি—কতই রঙ্গ—কতই ভাব। এদৃশ্য দেখে, অনিমেষ নয়নে নিস্তব্ধ অরণ্যের বৃক্ষরাজি, আর দেখে, অরণ্যের পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ। আর কে দেখে, পাঠক তুমি শুনিবে? স্থির হও, বলিব।

সায়ংকাল উপস্থিত—অরণ্যের পশু পক্ষী বন কাঁপাইয়া ডাকিতেছে :—যেন প্রলয় উপস্থিত! এক শ্রেণীর ডাকের পশ্চাতে আর এক শ্রেণীর ডাক, তাহার পশ্চাতে আর শ্রেণীর ডাক—সকল ডাকের মিলিত স্বর নীলিমাময় সায়ং সান্ধ্য-গগনে উঠিয়া কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে! সকল পরিশ্রম আকাশে বিলীন হইতেছে! ডাকিয়া ডাকিয়া হিংস্রজন্তুগুলি বন ছাড়িয়া গ্রামেরদিকে ছুটিতেছে, গ্রাম হইতে পক্ষীগুলি উড়িয়া উড়িয়া বনে আশ্রয় লইতেছে। সূর্য্যের রশ্মি নিবিয়া গিয়াছে—দূর দূরান্তর হইতে গাঢ় অন্ধকার কোল প্রসারিত করিয়া আসিতেছে। সেই আঁধার দেখিয়াই পশুপক্ষী যেন ভয়ে ডাকিতেছে। আঁধারে সব একাকার করিতেছে, সকলের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া আপন ক্রোড়ে করিতেছে, সীমাবদ্ধ ভাবকে অসীম করিতেছে,—বিশেষত্বকে ডুবাইয়া একত্বে পরিণত করিতেছে—বৃক্ষ ফল ফুল, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, নরনারী সেই আঁধারে সব একাকার। এ দৃশ দেখিতেছে,

আকাশ হইতে ক্ষীণালোক বিস্তার করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রমণ্ডলী, আর ঐ অরণ্যের মধ্য হইতে কে দেখিতেছে, পাঠক, শুনিবে? স্থির হও, বলিব।

ঐ নদীর অপর পারে ডাকাতের বিস্তৃত মাঠ। মাঠে বৃক্ষ নাই, বসতি নাই, সব পরিষ্কার। মাঠের একদিকে নদী, আর অনেক দূরে লোকের বসতি। মাঠের শব্দ মাঠেই লয় পায়, গ্রামে যায় না, গ্রামের শব্দ মাঠ পার হয় না। দিবসে এই মাঠে খেলে রৌদ্র, রাত্রে খেলে অন্ধকার বা জ্যোৎস্না, —যখন যাহার পালা, সেই তখন খুব খেলে। দুপ্রহরের সময় কাহার সাধ্য এই মাঠের রৌদ্র ভেদ করিয়া গমন করে, রাত্রেই বা কাহার সাধ্য এই জনপ্রাণীহীন নীরব প্রান্তরের আঁধার ভেদ করে। অতি প্রত্যুষে ভিন্ন রৌদ্রের ভয়ে মাঠে কেহ পাড়ী ধরে না, সন্ধ্যার সময় কেহ এমাঠে হাটে না। আজ হঠাৎ সন্ধ্যার সময়ে দুই জন লোক এই মাঠের মধ্যে পড়িয়াছে। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, এ সময়ে এমাঠে প্রায়ই ডাকাতি হইত। দুই জন লোকের একজন স্ত্রীলোক, একজন পুরুষ। স্ত্রীলোকটী মাঠের সকলই জ্ঞাত ছিল, তাঁহার ধারণা ছিল, বেলাবেলি মাঠ পার হওয়া যাইবে, খেয়া মিলিবে; কিন্তু শরীরের অবসন্নতা প্রযুক্ত তেমন হাটা হয় নাই, তাই মাঠের মধ্যেই সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। স্ত্রী লোকের মনে হইতেছে, যদি দস্যুর হাতে প্রাণ বাঁচে তবুও খেয়া মিলিবে না, সুতরাং রাত্রে শীতে বা বন্য জন্তুতে প্রাণ লইবে। অত্যন্ত ভয়ে জড়সড় হইয়া স্ত্রীলোকটী ছুটিতেছে। ছুটিতেছে কিন্তু পা চলিতেছে না, পশ্চাৎদিক হইতে কে যেন গতিরোধ করিতেছে। স্ত্রীলোকটী ফিরিয়া চাহিল, দেখিল ঘোর আঁধার চতুর্দ্দিক গ্রাস করিতেছে; পশ্চাতের দিকে চাহিয়া প্রাণ উড়িয়া গেল। স্ত্রীলোকের চলিবার শক্তি রহিত হইল, ক্ষণকাল বসিল। প্রায় অর্দ্ধদণ্ডের পর স্ত্রীলোকের প্রাণে একটু সাহস জন্মিল, মনে হইল, কে যেন সঙ্গে আছেন, কে যেন রক্ষা করিবেন। স্ত্রীলোকটী সাহসে ভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল পরে বুঝিল, কে যেন অতি নিকটে। একটী পুরুষ বেলা থাকিতে মাঠের মধ্যে দূর হইতে লোক দেখিয়া,মাঠে পাড়ী ধরিয়াছিল,সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লোক দেখিয়া চলিতেছিল, সন্ধ্যার পরে আর কিছুই দেখিতে না পাইয়া ত্রস্ত হইয়া ছুটিয়া যাইতেছিল। নিকটে আসিলে স্ত্রীলোকটী বুঝিল, এক জন মনুষ্য, পুরুষটীও বুঝিল এক জন মনুষ্য ধরিয়াছি। কিন্তু এমনি অন্ধকার, কে পুরুষ, কে

স্ত্রীলোক, উভয় কে তাহা জানে না। কাছে আসিলে স্ত্রীলোকটী অগ্রে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে?

পুরুষ উত্তর করিল, আমি বিদেশীলোক নাম বলিলে চিনিবে না।

স্ত্রীলোক।—কোথায় যাইবে?

পুরুষ।—অনাথপুরে।

স্ত্রীলোক।—কোথা হইতে আসিয়াছ?

পুরুষ।—অনেক দূর হইতে,—তুমি চিনিবে না। তুমি কে?

স্ত্রীলোক।—আমি এদেশী স্ত্রীলোক, তুমি বিদেশী লোক নাম বলিলে চিনিবে কেন?

পুরুষ বলিল, নাম শুনিব, না চিনি তবুও বল তোমার নাম কি?

স্ত্রীলোকটী একটু ভাবিয়াই বলিল, আমার নাম করালী, কেমন সুখী হইয়াছ?

পুরুষ বলিল, করালী নাম আমি শুনিয়াছি, তুমিই কি 'করালী'?

করালী কি ভাবিয়া মনে মনে হাসিল; পরে বলিল, আমিই করালী,কিন্তু তোমার কোন ভয় নাই।

পুরুষ বলিল, করালীকেও আমি ভয় করি না, আমরা পৃথিবীতে কাহা-কেও ভয় করি না।

স্ত্রীলোকটী লোকের সাহস দেখিয়া বিস্মিত হইল, কারণ করালীকে ভয় করিত না অনাথপুরের দুই তিন দিন নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে এমন লোক ছিল না, বলিল, তুমি কোন দেশ হইতে আসিয়াছ?

পুরুষ বলিল, তাহা বলিব না।

স্ত্রীলোকটী বিস্মিত ভাবে বলিল, করালীকে ভয় করিতেছ না? এখনই তোমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইব,পরে নাক কাণ কাটিয়া এই মাঠে ছাড়িয়া দিব।

পুরুষ।—তাহা পারিবে না, ক্ষমতা থাকে, কাছে এস।

করালী অপ্রতিভ হইল, বলিল, তোমার খুব সাহস, তবে তুমি অগ্রে চলিয়া যাও না কেন?

পুরুষ এবার বিপদ গণিল, কারণ সে পথ চিনিত না; বলিল, যখন ইচ্ছা হইবে তখনই যাইব।

স্ত্রীলোক বলিল, স্ত্রীলোকের নিকটে ইচ্ছা করিয়া যে পুরুষ দাঁড়ায়, সে পাষণ্ড! তুমি চলিয়া যাও।

পুরুষ এবার অপ্রতিভ হইল, বলিল, তোমাদের দেশে এ প্রকার পাষণ্ড নাই ?

স্ত্রীলোক।—অনেক আছে। কিন্তু তাতে তোমার কি ? তুমি ত আর এদেশী লোক নহ ? তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে যে, তুমি সাহেব, শুনেছি সাহেবেরা স্ত্রীলোকদের খুব সম্মান করে, তাই বলিলাম।

পুরুষ।—আমি এখনই যাইতাম, কিন্তু আমি নিরুপায়, এই প্রদেশ আমার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাই একা যাইতে পারি না। তোমাকে অনাথপুরের যাত্রী বলিয়া শুনিয়াই তোমার পশ্চাৎ আসিয়াছি, তোমার সঙ্গ ধরিয়াই এতদূর আসিয়াছি। এক্ষণ যদি পথহারা পথিককে পথ না দেখাও, তোমার অধর্ম্ম হইবে।

স্ত্রীলোক।—যদি ধর্ম্মকে আমি মানিয়া না চলি ?

পুরুষ।—ধর্ম্ম না মানিতে পার, কিন্তু দয়াকে না মানিয়া পার না। পথ দেখাইতে হইবে, কারণ আমি কৃপাপ্রার্থী নিরাশ্রয়।

স্ত্রীলোকটী নত হইল, বলিল, তবে তুমি আমার সহিত এস, খেয়াঘাটে নৌকা পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ ; যদি নৌকা না পাওয়া যায়, তবে উভয়ে একত্রে নদীতীরে থাকিব। এ ঘাটে বড় ভয়।

পুরুষ বলিল, আজ নদীতীরে থাকিতে ইচ্ছা নাই, যে প্রকারে হউক নদী পার হইতেই হইবে, যে প্রকারে হউক অনাথপুরে যাইতেই হইবে, নৌকা না পাই নদী সাঁতরাইব।

করালী মনে মনে পুরুষের সাহসকে ধন্যবাদ দিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল, পুরুষটী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

খেয়াঘাটে—পান্সীতে !

খেয়াঘাটে খেয়া-নৌকা মিলিল না, কিন্তু ঘাটে তিনখানি পান্সী বাঁধা রহিয়াছে, পথিকেরা দেখিল। একখানি নৌকার ছইয়ের ভিতর হইতে মনুষ্যের স্বর বাহির হইতেছিল, পথিকেরা চুপি চুপি পান্সীর ধারে যাইয়া কাণ পাতিয়া কথা শুনিল।

প্রথম আরোহী বলিতেছে, এত পরনিন্দা ভাল নহে, আপন দোষ শোধন করাই মনুষ্যত্ব।

দ্বিতীয়।—নিন্দাই আমার ব্রত, লোককে ভাল করিতে হইলে এ ব্রত অবলম্বন করিতেই হইবে, পথ এক, ভিন্ন দুই নহে।

প্রথম।—তুমি নিজে যে কি পদার্থ, তাহা কি একবারও ভাবিবে না? ভিতরে বিষ পূরিয়া বাহিরে সুধা মাখিয়া কত কাল কাটিবে? একই ভাবে কি চিরকাল যাইবে? ধন মানে, জ্ঞান গৌরবে, বিদ্যা বুদ্ধিতে, শক্তি সামর্থ্যে তোমাপেক্ষা উন্নত লোক কি বাঙ্গালায় আর নাই? তুমি কাহাকেও কেয়ার কর না, কিন্তু তোমাপেক্ষা অধিক শক্তি কি আর কাহারও নাই?

দ্বিতীয়।—"আমি আমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও গণিব না—এই ভাবেই জীবন যাইবে। শক্তি কাহারও থাকে, আমার সমকক্ষ হউক! বুদ্ধি কাহারও থাকে, আমার চক্রান্ত বুঝিয়া ফেলুক! জ্ঞান কাহারও থাকে, আমাকে চিনিয়া লউক! বল কাহারও থাকে, আমাকে পরাস্ত করুক! কেবলই কল্পনার কথা শুনিয়া ভীত হইব কেন? শক্তির পরীক্ষা আজই হইবে—মানুষ কেহ দেশে থাকে, আমার সমক্ষে আসিয়া জয় লাভ করুক।"

করালী আর সহ্য করিতে পারিল না, বলিল, নৌকা কোথাকার?

মাজী চিৎকার করিয়া বলিল, বিষ্ণুপুরের নৌকা।

করালী পুন বলিল, নৌকা কোথায় যাইবে?

মাজী উত্তর করিতেছিল, এমন সময়ে ছইয়ের ভিতর হইতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—নৌকা আজ রাত্রে এই নদীতেই থাকিবে, পরে যেখানে ইচ্ছা, যাইবে।

করালী বলিল,—আমাদিগকে পার করিতে হইবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হাসিয়া বলিল, তোমরা কে গা?

করালী বলিল,—আমি বিবসনা, সঙ্গে বিদেশী লোক, আমরা উভয়েই অনাথপুরে যাইব, পার করিতেই হইবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—নৌকায় এস, পার করিব।

করালী নির্ভয়ে অগ্রে নৌকায় পা ফেলিল, পরে বিদেশীও নৌকায় উঠিল। নৌকায় উঠিয়া করালী আলোকে, সাহেবকে ভাল করিয়া দেখিল।

সাহেব নৌকায় উঠিল দেখিয়া নৌকার দ্বিতীয় ব্যক্তি ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল—দুজনকে পার করিতে পারিব না, এক জন নামিয়া যাও।

করালী বলিল—তবে আমিই যাই, কারণ বিদেশীকে পার করিতেই হইবে—অতিথিকে অগ্রে সাহায্য করাই ধর্ম্ম। আমি নামিয়া যাইতেছি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি।—তোমাকেই পার করিব, ম্লেচ্ছকে তীরে নামাইয়া রাখিব—পাষণ্ডকে পার করিব না।

সাহেব সঙ্গিনীর মহত্ত্ব স্মরণ করিয়া বিস্মিত হইল, বলিল, ইহাকে কখনই রাখিয়া যাওয়া হইবে না—আমিও থাকিব না, সুতরাং উভয়কেই পার করিতে হইবে।

প্রথম ব্যক্তি বলিল,—যদি পার করিতে হয়, তবে উভয়কেই পার করা যাইবে, কিন্তু বড় ভয়ের কথা। অনাথপুরের ঘাটে আজ রাত্রে নৌকা রাখা বিষম ব্যাপার!

সাহেব বলিল—কোন ভয় করিবেন না, পার করুন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি সাহেবের কর্কশস্বরে উষ্ণ হইয়া উঠিল, বলিল—পার করিব না, ম্লেচ্ছ দূর হ। নৌকা থেকে নাম্।

করালী বলিল, ম্লেচ্ছ দেশের রাজসিংহাসন পাইয়াছে, রাজভক্ত ভারত সাহেবের গোলামী-ব্রত লইয়াছে, ব্রাহ্মণ ব্যবসা ছাড়িয়া মদ্ ধরিয়াছে,—আফিসে কর্ম্ম লইয়াছে,—ইংরাজের পোষাক ইংরাজের ভাষা লইতেছে, আবার সাহেব বলিয়া ঘৃণা? এ ঘৃণা বাহিরের, অন্তরের নহে। যদি ঘৃণা থাকে, মাথার দিব্বি, সাহেবকে নামাইয়া দেও।

দ্বিতীয় ব্যক্তির বেশ পরিবর্ত্তিত ছিল, করালীর বেশও পরিবর্ত্তিত ছিল, নচেৎ উভয়ে হয়ত উভয়কে চিনিতে পারিত। বিপদের সহিত সহবাস করিতে করিতে করালী এত সাহস পাইয়াছে যে, কাহাকেও আর ভয় নাই, কথা বলিবার সময়ে একটুও সঙ্কুচিত হইল না। সদর্পে আত্মাভিমানে বলিল,—শক্তি থাকে সাহেবকে নামাইয়া দেও।

করালীর কথা নৌকা খানিকে যেন তোলপাড় করিয়া তুলিল। কেহ কোন উত্তর করে না দেখিয়া ভিন্ন কামরা হইতে তৃতীয় ব্যক্তি বাহির হইয়া বলিল,—সাহেবও জানি না, বাঙ্গালীও জানি না, উভয়কেই নৌকা হইতে নামাইব। এই বলিয়া ক্রোধে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া মস্তকের কেশগুচ্ছ ধরিয়া সজোরে করালীকে টানিল।

করালী বলিল—মারিবে, মার; যে রাগের অধীন তাহাকে কিছু না বলাই উচিত। মারিতে ইচ্ছা করিয়াছ, মার, কিন্তু নৌকা হইতে নামিব না।

নবলীলা

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুঃখিনীর কথা।

ধীরে ধীরে স্থষ্টির কার্য্যকলাপ সমাধা হয়। বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফুল, ফুল হইতে ফল, এ সকল ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয়। যদু এক দিন বালক ছিল, আজ বড় হইয়াছে, বুদ্ধি পরিপক্ক হইয়াছে, আজ যদু পৃথিবীর কত মহৎ কার্য্য সমাধা করিতেছে; ইহা একদিনে হয় নাই। আমিও একদিনে হই নাই, তুমিও একদিনে হও নাই,—অনেক সময় গিয়াছে, তবে তুমি আমি মানুষ হইয়াছি। একদিনে কিছু তুমি 'তুমি' হও নাই, আমি 'আমি' হই নাই, আমাদের জন্মের পূর্ব্ব হইতে পৃথিবী কত সময় দিয়াছে, তবে তুমি 'তুমি' হইয়াছ, আমি 'আমি' হই-য়াছি। এই সময়ের মধ্যে তোমার আমার কতবার পতন হইয়াছে, কত-বার উত্থান হইয়াছে,—তবে আজ আমরা এই বর্ত্তমান অবস্থা পাইয়াছি। তোমার আমার কথা ছাড়িয়া দি,—ঐ সমাজ, ইহাও কতদিনের ফল—ইহার মধ্যেও কত উত্থান, কত পতন। বীজের পতন, বৃক্ষের উত্থান,—ফুলের পতন, ফলের উত্থান;—দেথ ঐ বীজ আর ঐ ফল, ইহার মধ্যে কত উত্থান, কত পতন;—এই উত্থান ও এই পতনের মধ্যে রহিল কি?—ঐ বৃক্ষ। মনুষ্যের মধ্যে কি দেখি?—বালকের পতন, যুবকের উত্থান; যুবকের পতন—বৃদ্ধের উত্থান। ইহাতে হইল কি? হইল—মানব জীবন। সমাজের উত্থান পতন আর কি গণনা করিব?—ইহার মধ্যে কত ঢেউ, কত উত্থান, কত পতন, মানব তাহা ভাবিতেও অক্ষম। ধীরে ধীরে উত্থান পতনের অভিনয় হয়—ধীরে ধীরে স্থষ্টির কার্য্য সমাধা হয়। কোন জাতি

একদিনে উন্নত হয় নাই—কোন দেশ একদিনে সভ্য হয় নাই। সময়ের প্রতীক্ষা না করিয়া যে বড় হইতে চায়, সে মূর্খ। সুলোচনা এক দিন বালিকা ছিল—হাসিত, খেলিত, বেড়াইত, আজ সে যুবতী হইয়াছে,—আজ সে গম্ভীর হইয়াছে। জননীর চক্ষে আজও যেন সে বালিকা রহিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীর চক্ষে সুলোচনা আজ যুবতী—স্থির-বুদ্ধি। একদিনে ইহা হয় নাই। কত উত্থান, কত পতন, কত পরিবর্ত্তনের পর আজ সুলোচনা যুবতী হইয়াছেন। সুলোচনা হিন্দুসমাজের কুক্ষিগত অন্ধকারের মধ্যে পরিপালিত, কিন্তু তবুও বুদ্ধি সুমার্জ্জিত,—ইহা একদিনে হয় নাই। অনেক শিক্ষায়, অনেক উপদেশে সুলোচনা আজ এইরূপ হইয়াছেন। ভাল মন্দ পৃথিবী বিচার করুক, আমরা সুলোচনার বর্ত্তমান অবস্থা যথাযথ বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হই।

"মা, আমি কখনই যাব না, তুমি যতই বল না কেন, আমি কখনই ঐ কুৎসিত স্থানে যাব না। দিদি যায় যাক্, কিন্তু আমি কোন মতেই যাব না।" এই কথা বলিয়া সুলোচনা আজ কোমর বাঁধিয়া বসিয়াছেন।

"যাবিনে, যাবিনে, যাবিনে?" জননী কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল।

সুলোচনা পুন ধীর-স্বরে বলিলেন,—প্রাণান্তেও না।

জননী ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল, পাড়ার আর সকল মেয়ে ফল-বিয়ের বাড়ীতে কাদামাটীর জন্য মিলেছে,আমার মেয়ে হয়ে তুই সেখানে যাবিনে? আমার মেয়ে হয়ে তুই খ্রীষ্টানি মত লয়ে আপন জেদ্ বজায় রাখ্‌বি? তা কখনই হবে না, আজ তোর লেখাপড়ার সাধ মিটায়ে, খ্রীষ্টানি মত ভেঙ্গে দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ! যে ঘরের মেয়ে, এ ঘরে খ্রীষ্টানি মত? এই বলিয়া জননী সুলোচনার কেশ ধরিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। সুলোচনা আর সহ্য করিতে না পারিয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

সুলোচনার ক্রন্দনের স্বর এবং মাতার প্রহারের শব্দ শ্রবণ করিয়া বারবিলাসিনী পাড়ার ছোট বড় সকল স্ত্রীলোক একত্রিত হইল। দুই দশটী গৃহস্থের মেয়েও সেখানে জুটিল। একত্রিত হইয়া সুলোচনার স্বভাব সমালোচনা আরম্ভ করিল।

একজন বলিল,—ওমা, এমন ঘরে এমন মেয়ে ত কখনও দেখিনি, সর্ব্বনাশী দেশের জাত্ ধর্ম্ম সব ডুবাবে! এ কুবুদ্ধি কে শিখালে?

আর একজন বলিল,—কে শিখালে, একথা আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছ কেন?

আমি তখনি বলেছিলাম—স্কুলে পড়্তে দিও না। ওত পড়াশুনা নয়, ও পরকাল নষ্ট করা। তা আমার কথা ত তখন ভাল লাগে নি! আজ আর দেখ্ছ কি? একে নিয়ে শেষ অনেক ভুগ্তে হবে।

একটী যুবতী বলিল,—লেখাপড়ার দোষ দিচ্চ কেন? আমরা কি লেখাপড়া শিখি নাই? সুলোচনা বা কথানা বই পড়েছে, আমরা কত বই পড়েছি, কিন্তু এর মত শিক্ষা ত আমাদের আজও হয় নাই। খ্রীষ্টানি স্কুলে দেওয়াতেই এই ফল ফলেছে।

একটী বালিকা বলিল,—আমি ত খ্রীষ্টানি স্কুলে পড়ি নাই, কিন্তু আমার পণ্ডিত মহাশয় বলেছেন, এই সকল জঘন্য কার্য্যে কখনই যোগ দেওয়া উচিত নয়। আপনারা যে প্রকার নির্লজ্জর ন্যায় ব্যবহার করেন, কোন্ শিক্ষিত লোক তাতে আহ্লাদ প্রকাশ কর্তে পারে? ছি ছি, আপনারা আর বাহাদুরি করিবেন না।

যুবতী মুখ বক্র করিয়া, ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল,—আর তোর মুখ নেড়ে বক্তিতে কর্তে হবে না; আমাদের বাড়ীতে ত আর শিক্ষিত লোক নেই, তোর পণ্ডিত মহাশয়ই দেশের মধ্যে এক জন,—না? আমাদের বাবুরা আর লেখাপড়া জানে না,—না?

বালিকা ধীরে ধীরে বিনীত স্বরে বলিল,—সব জানি, আর বল্বেন না। কেবল নাটক, কেবল ছাই ভস্ম, আপনাদের বাবুকেও জানি, আপনাকেও জানি।

এই কথা বলা হইতে না হইতে একটী প্রাচীনা বলিয়া উঠিলেন,—এ ছুঁড়ীকে শাসন করে, এমন বুঝি কেহ নাই? এই বলিয়া বালিকার চিবুক ধরিয়া দন্ত কিড়মিড় করিয়া বলিলেন—তুই যদি আমার গর্ব্ভে জন্মাতিস্, তবে আজই গলা টিপে তোকে মেরে ফেল্তাম।

এইরূপ নানা প্রকার তর্কের স্রোত চলিয়াছে, এদিকে সুলোচনা প্রহারে হতচেতন হইয়া পড়িয়াছেন। জননী নানা লোকের উৎসাহে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া এত প্রহার করিয়াছে যে, সুলোচনার জ্ঞান নাই। নিষ্ঠুর জননী, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, বলিতে বলিতে গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া আর সকল মেয়ের সহিত কুৎসিৎ দেশাচারে যোগ দিতে চলিল।

সুলোচনার ভগ্নী কুলকামিনী এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া পূর্ব্বেই বিনোদ বাবুর বাড়ীতে সংবাদ দিতে গিয়াছিলেন, জননীর দলবল গৃহের বাহির

হইতে না হইতে, বিনোদ বাবুর সহিত সুলোচনার ভগ্নী গৃহে প্রবেশ করিলেন। সুলোচনা এ সকল কিছুই জানেন না, প্রহারে তিনি অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। বিনোদ বাবু ও কুলকামিনী সুলোচনার মস্তকে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। বিনোদ বাবুর দু নয়ন হইতে ধারাবাহী হইয়া জল পড়িতে লাগিল। বিনোদ বাবু একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে ভগ্নীকে বলিলেন—'আমার জন্যই সুলোচনার এত কষ্ট সহ্য করিতে হইল। আমি যদি কাদামাটীতে যোগ দিতে নিষেধ না করিতাম, তাহা হইলে সুলোচনার এত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না! সুলোচনার অদৃষ্টে যে কত কষ্ট আছে, তা কে জানে? আমার সহিত তোমাদের আলাপ পরিচয় না হইলেই ভাল ছিল! এই বলিয়া বিনোদ বাবু কাঁদিতে লাগিলেন। সুলোচনার ভগ্নী অধোবদনে রহিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উভয় সঙ্কট।

স্বামী স্ত্রীর জন্য কাঁদে, ভ্রাতা ভ্রাতার জন্য কাঁদে, জননী পুত্রের জন্য কাঁদে, এদৃশ্য জগতে বিরল নহে। কিন্তু ইহাতে প্রেমের অপরিসীম মাহাত্ম্যের পরিচয় পাওয়া গেল না। রাজা সুখ-সিংহাসন ছাড়িয়া দীন দুঃখীর কুটীরে বসিয়া যখন সহানুভূতির অশ্রুতে গণ্ডস্থল ভাসাইতে থাকেন, তখন সেই দৃশ্যে বিশ্ববিজয়ী প্রেমের কতক পরিচয় পাওয়া যায়। ধনীর পুত্র বিনোদ বাবু আজ অসহায়াদিগের জন্য অশ্রুতে গণ্ডস্থল ভাসাইতেছেন, এ দৃশ্য জগতে চিরকাল অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত থাকিবে। বিনোদবাবু অধিকক্ষণ সেই বিষাদময় চিত্রের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিলেন না, দুঃখাশ্রু সম্বরণ করিয়া সে স্থান হইতে উঠিলেন। বিনোদ বাবুর প্রাণে আজ বড়ই আঘাত লাগিয়াছে। লাগিবারই কথা,—বিনোদ বাবু কত কষ্ট স্বীকার করিয়া দুটী ভগ্নীকে লেখা পড়া শিখাইয়াছেন। কিন্তু আজ বুঝিলেন, তাঁহার আর হাত নাই। উভয়কে যদি দেশান্তরে লইয়া যান, তবে হয় ত সকল গোল চুকিয়া যায়, কিন্তু বিনোদ বাবুর এখন সে সাহস নাই—সে ইচ্ছা নাই। ইহার পূর্ব্বেই ঐ গ্রামে দলাদলী আরম্ভ হইয়াছে,—

বিনোদবাবুকে লইয়া,সুলোচনাকে লইয়া। লোকেরা বলে,বিনোদবাবুর স্বার্থ আছে বলিয়া তিনি সুলোচনাকে মানুষ করিয়াছেন। গ্রামের ভাল লোকেরা জানিত, বিনোদ বাবুর স্বভাবে কালিমা নাই। কিন্তু গ্রামের দুষ্ট লোকদিগের চক্রান্তে—দেবসদৃশ বিনোদ বাবু আজ সকলের চক্ষের বিষ। গ্রামের দুষ্ট লোকদিগের ইচ্ছা, সুলোচনাকে অভিসার পথে লইয়া যায়। সুলোচনার জননী কুলকলঙ্কিনী,—অর্থের দাসী,ধর্ম্ম কর্ম্ম,এ সকলের সে বড় একটা ধার ধারে না। অর্থের আশায় জননী সুলোচনাকে পাপের হ্রদে ডুবাইতে প্রস্তুত, কিন্তু বিনোদ বাবুর জন্য আজ পর্য্যন্ত কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। একমাত্র বিনোদ বাবুর মধুর কথায় ভুলিয়া সুলোচনা সকল প্রকার প্রলোভনকে তুচ্ছ করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়াছেন, এই জন্য জননী ক্রোধে অধীর,—সুলোচনার প্রতি—বিনোদ বাবুর প্রতি। বিনোদবাবুকে কিছুই বলিতে পারে না—ধনীর সন্তান, ক্রোধের বেগ সুলোচনার উপরেই পড়িয়াছে। সর্ব্বনাশী মনে করিয়াছে, কথায় না পারিলে মারিয়া ফেলিব। বিনোদ বাবুর পূর্ব্বে আশা ছিল, ইহাদিগকে পাপের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন, কিন্তু আজ সে আশা গিয়াছে। বিনোদবাবুর আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলেই চটিয়া গিয়াছে,—বিনোদ বাবুর নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া অন্যের নিকট শুনিয়াই চটিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর স্বভাব বিনোদবাবু চেষ্টা করিয়া ফিরাইতে পারিবেন, আশা ছিল না; কিন্তু তবুও কয়েক জনকে বলিয়াছিলেন, "সুলোচনাকে আমি সহোদরার ন্যায় মনে করি, আমার প্রতি কেন সন্দেহ কর? বিবাহিত অবস্থায় আমি কলঙ্কের পথে যাইব, তোমরা কেন মনে এ সন্দেহকে স্থান দেও?" এ কথায় তাহারা উত্তর করিল,—"পৃথিবীর সকলি আমরা জানি, এই স্থানে দেবতাদিগের দেবত্ব লোপ হয়, মানুষ কোন্ ছার জীব! আজ সুলোচনা তোমার সহোদরা, কিছুদিন পরে নিশ্চয় দেখিব, আর সে ভাব নাই। আমরা সন্দেহবাদী। ঘোরতর স্বার্থজাল-বেষ্টিত পৃথিবীকে জানিতে আর আমাদের বাকী নাই, একে একে অনেক বড় লোক দেখেছি, সকলের পতন ঐ এক স্থানে।" বিনোদবাবু পরাস্ত হইয়াছেন, আজ তাঁহার সমস্ত আত্মীয় বন্ধু বান্ধব তাঁহার বিরোধী। শেষ ফল এই হইয়াছে, ঐ দ্বিতীয় বিবাহের বাড়ীতে গ্রামের সকল লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, কেবল বিনোদবাবুর হয় নাই। বিনোদবাবুর নিমন্ত্রণ হয় নাই বলিয়া, বাবুদের বাড়ীর কেহই যায় নাই। যায়

নাই বটে, কিন্তু সকলেই বিনোদ বাবুর প্রতি অসন্তুষ্ট, আজ সকলেই রাগান্বিত। জাত্ মান সব বিনোদের জন্য গেল, ইহা ভাবিয়া বিনোদ বাবুর বাড়ীর কেহ কেহ কাঁদিতেছেন। বিনোদ বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বড়ই হিংসা-পরতন্ত্র ছিলেন, তিনি আজ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—"সকলের ঘরের খবর বাহির করে, সকলকে একঘরে করে তবে ছাড়্‌ব।" বিনোদ বাবুর প্রতিবেশীমণ্ডলী এই কথা লইয়া কাণাকাণি করিতেছে। বিনোদ বাবুর স্ত্রী মুখ ভার করিয়া আছেন, স্বামীর চরিত্রের কথা শুনে প্রাণে আঘাত পাইয়াছেন, মনোদুঃখে মুখ ভার করে আছেন। সমস্ত দিন এই ভাবে, এই আন্দোলনে গিয়াছে; বিনোদ বাবু সকল কথা শুনেছেন,—তাঁহার মুখ আজ একটু বিষন্ন,—চিন্তায় মলিন। অপরাহ্নে সুলোচনাকে ঐ অবস্থায় দেখিলেন। দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু কি করিবেন, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। আজ স্ত্রীর মনের সন্দেহ জাল ছিন্ন করিবেন, না ভ্রাতার ক্রোধকে প্রশমিত করিবেন, না জননীকে শান্ত করিবেন,—না অন্যান্য সকলকে সন্তুষ্ট করিবেন;—না এদিকে সুলোচনার জন্য ভাবিতে বসিবেন? কেবল ভাবিলে হইবে না—সুলোচনার ভগ্নী বিনোদবাবুকে চুপে চুপে ভিতরের সকল সংবাদ দিয়া বলেছেন, দুই চারি দিনের মধ্যে উদ্ধার করিতে না পারিলে, হয় সুলোচনা পাপে ডুবিবে, না হয় আত্মহত্যা করিয়া মরিবে। এই হৃদয়বিদারক কথা শুনিয়া বিনোদ বাবুর প্রাণ আজ অস্থির হইয়াছে; কি করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। গ্রামের মধ্যে মহা আন্দোলন-স্রোত চলিয়াছে। বিনোদ বাবুর জননী কাঁদিতেছেন, স্ত্রী মুখ ভার করিয়া আছেন, এ দিকে সুলোচনা প্রহারে অচেতন হইয়া রহিয়াছেন। এ সকলের মূলেই আমি, ইহা ভাবিতে ভাবিতে বিনোদ বাবু ভ্রাতার ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

রাত্রি হইয়াছে, দিবসের আন্দোলন একটু একটু থামিয়া আসিতেছে,—লোকের ভিড়, লোকের চলাচল্‌তি একটু থামিয়া আসিয়াছে। গোপনে

কোথায় কি পরামর্শ চলিতেছে, কে জানে, কিন্তু বাহিরের আন্দোলন একটু থামিয়াছে। জননী শিশু সন্তানকে ঘুম পাড়াইতেছেন, আর বলিতেছেন, বিনোদ বাবুদের বাড়ীতে যেও না, বিনোদ বাবুরা একঘরে হয়েছেন। শিশু সন্তানেরা ভাল মন্দ কিছুই জানে না, তাহারা বলিতেছে,—কেন যাব না মা? বিনোদ বাবু বড় ভাল বাসেন, কত ভাল জিনিস খেতে দেন। জননী আর কিছু না বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছেন,—বিনোদ বাবুদের বাড়ী গেলে মার খাবে। বালকেরা চুপ করিতেছে। গৃহের কর্ত্তা আসিয়া গৃহের সকলকে বলিতেছেন, সাবধান, পাড়ার ওদিকে কেহ যেও না। এই প্রকারে ঘরে ঘরে একটু একটু কথাবার্ত্তা হইতেছে, কিন্তু বাহিরের আন্দোলন আর নাই। পাড়ায় পাড়ায় দিবসে যে কমিটী বসিয়াছিল, সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমিটী ভাঙ্গিয়াছে। বাহিরে কি ধার্য্য হইয়াছে, জানি না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আপন আপন ঘর ঠিক করিবার চেষ্টা হইতেছে। বিনোদ বাবুদের বাড়ীর মেয়েদের সহিত যে সকল মেয়েদের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল, তাহাদের প্রাণে এ সকল নিষ্ঠুরতার কথা বাজিতেছে, তাহারা একটু আধটু প্রতিবাদ করিয়া তিরস্কৃত হইতেছে।

বিনোদ বাবুর জননীকে পাড়ার একটী মেয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত, সে নিষেধ সত্ত্বেও বিনোদ বাবুদের বাড়ীতে এসেছে; এসে, বিনোদ বাবুর জননীর নিকট বলিতেছে, "ওমা, দেশের হলো কি, জোর করে সকলকে ঘরে বেঁধে রাখ্‌তে চায়। আমি ত তা পারিনে,এতকাল যাহাদিগকে আত্মীয় ভেবেছি, আজ হঠাৎ কেমন করে তাহাদের বাড়ী যাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করব।" বিনোদ বাবুর জননী ধীর স্বরে বলিলেন,—"তুমি আর এস না মা, কেন বিবাদের পথ খুল্‌বে? দলাদলিতে লোকের বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পায়, হঠাৎ তোমাকে কেহ অপমান করবে, তুমি আর এস না।"

স্ত্রীলোক,—তা তো থাক্‌তে পারিনে, আপনি বলেন তার কি বল্‌ব, কিন্তু আমিতো আপনার নিকট মনের সকল কথা না বলে পারিনে।

এই সময়ে নিকটে স্ত্রীলোকের পদ-শব্দ শ্রুত হইল। জননী বলিলেন—দেখ, হয় ত কেহ তোমাকে খুঁজ্‌তে এসেছে?

এই সময়ে হঠাৎ একটী স্ত্রীলোক আসিয়া জননীর পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। জননী বুঝিলেন—স্ত্রীলোকটী সুলোচনার ভগ্নী। বিনোদ বাবুর মাতা বলিলেন,—'কাঁদিস্ কেন, কি হয়েছে বল্?

সুলোচনার ভগ্নী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আপনি যদি সদয় না হন, আপনি যদি রক্ষা না করেন, তবে আজ আমার প্রাণের সুলোচনা ভেসে যায়!

অনন্তদেবীর প্রাণে আঘাত লাগিল, ক্রন্দনে হৃদয় ব্যথিত হইল, বলিলেন, কোন ভয় নাই, কি হয়েছে বল্।

কুলকামিনী বলিলেন,—গ্রামের সকল মাতাল জুটেছে, আজ আর সুলোচনার রক্ষা নাই; আপনি যদি আজ রক্ষা না করেন, তবে আমরা জন্মের মত ভেসে যাই। আমার প্রাণে আর সয় না!

অনন্তদেবীর হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল, বলিলেন,—কি?—গোপালপুরের এই অবস্থা?—জোর করে একজনের ধর্ম্ম লোপ কর্‌বে? তা কখনই হবে না। এই বলিয়া অনন্তদেবী গম্ভীর স্বরে বিনোদ বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশচন্দ্রকে ডাকিলেন। সুরেশচন্দ্র আসিলে জননী বলিলেন, সুরেশ, বিনোদের অপরাধ আজ ভুলে যাও—গোপালপুরে জোর করে কাহারও ধর্ম্মলোপ কর্‌বে, ইহা আমি সইতে পারিনে। এখনই লোকজন লয়ে তুমি যাও। সুলোচনাকে উদ্ধার করে আন। টাকার জন্য ভয় ক'র না, যত টাকা লাগে আমি দিব।

আগুনে ঘৃত নিক্ষিপ্ত হইল, সুরেশচন্দ্র ইতিপূর্ব্বেই ক্রোধে অধীর হইয়াছিলেন, জননীর আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ লোক জন লইয়া চলিলেন। বিনোদ বাবু আশু বিপদ গণনা করিয়া বারম্বার দাদাকে নিষেধ করিলেন, কিন্তু সুরেশ জননীর আদেশ লঙ্ঘন করিবার লোক নহেন, তিনি দ্রুতবেগে চলিলেন। বিনোদ বাবুও অগত্যা সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সুরেশচন্দ্র যে সময়ে লোক জন লইয়া উপস্থিত হইলেন, সে অতি ভয়ানক সময়, সে সময়ের ঘটনা লিখিতে শরীর শিহরিয়া উঠে। কুলকামিনীর জননী মদে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছে, গৃহের অভ্যন্তর হইতে আর্ত্তনাদের করুণ স্বর গগনভেদ করিয়া উঠিতেছে;—পাষণ্ড দল আমোদে মত্ত। "দিদি, আমাকে বিষ দে, আমাকে বিষ দে, আর বাঁচ্‌ব না, আজই মরি, মা কই?—হায়, হায়, দিদি এমন নিঃসম্বল করে আমাকে ফেলে তুই কোথায় গেলি? বুঝেছি—আমার সহায় সংসারে কেহ নাই—আকাশে কি দেবতারা নাই? তাঁরা কি আমাকে রক্ষা কর্‌বেন না? রে পাষণ্ড, আমাকে ধরিস্‌নে, এখনই তোর বুকে লাথি মার্‌ব। ঐ দেখ—স্বর্গে

দেবতারা আমার সহায়—আমার সহিত তোরা পার্‌বি ? কখনই না। আয় দেখি, কাছে আয়। আজ আগে তোদের বুকে ছুরি মেরে তবে বিষ খেয়ে মরি। উঃ পারিনে, উঃ পারিনে, পাষণ্ডদের সহিত আর পারলেম্ না,—বিনোদ বাবু, তুমি কোথায় ? দিদি গেল, তুমিও গেলে ? হায়, হায়, তবে আমার আর বুঝি উপায় নাই।”এই প্রকার আর্ত্তনাদের ধ্বনি গৃহভেদ করিয়া আকাশে উঠিতেছে, এমন সময়ে সুরেশচন্দ্র রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া লোকজন লইয়া উপস্থিত হইলেন। সুলোচনা উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছেন, তাঁহার করুণ স্বরে পাষাণ পর্য্যন্ত বিগলিত হয়। বিনোদ বাবু এতক্ষণ শান্তভাবে ছিলেন, কিন্তু সুলোচনার স্বর শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন,—সুরেশ ও বিনোদ উভয়ে বীরের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করিলেন। সুরেশ ও বিনোদ যখন দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, তখন পাষণ্ডেরা ভীত হইয়া পলায়ন-তৎপর হইল,—সুলোচনা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া মৃত্তিকায় পড়িলেন। সুরেশের লোকেরা পাষণ্ডদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল—চতুর্দ্দিক হইতে আরো লোক আসিতে লাগিল, উভয় দলে ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। বিনোদ বাবুর আদেশে সুলোচনাকে পার্শ্বের ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। এদিকে দুই ভাই মত্ত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। কতক্ষণ পরে পাষণ্ডদিগের দল পরাজিত হইল। যখন ২।৩ টা খুন হইল, তখন তাহারা ভীত হইয়া পলায়ন করিল। সুরেশ ও বিনোদ বাবু উভয়ে সুলোচনাকে লইয়া বাড়ীতে আগমন করিলেন। সুলোচনা তখন অচেতন, কিছুই জানিলেন না। দলাদলির আগুনে ঘৃত নিক্ষিপ্ত হইল—আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দলাদলির প্রথম অধ্যায়।

পরদিন কমলমণি, সুলোচনার মাতা, বক্ষে আঘাত করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। কমলমণির স্বার্থ কেবল অর্থ, আজ যদি কেহ কতকগুলি টাকা কমলমণির হস্তে দিতে পারিত, তবে কমলমণি নিঃশব্দে আবার সংসার পাতিত, আবার সুখ অন্বেষণ করিত। কিন্তু অর্থ দিয়া কেহই,

—বিনোদ বাবুর দলের কেহই কমলমণির মনের আগুন নির্ব্বাণ করিল না,—সুতরাং কমলমণি বিপক্ষে যোগ দিল, সুরেশ ও বিনোদের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় রত হইল। প্রথমত গোপালপুরের আপামর-সাধারণ সকলে জুটিয়া বিনোদ বাবুদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিল; পরে ধোপা নাপিত বন্ধ করিল; গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, রাষ্ট্র করিয়া দিল,—'কমলমণির হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া বিনোদ ও সুরেশ, সুলোচনা ও কুলকামিনীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে, সুতরাং তাহাদের জাতি গিয়াছে। গ্রামে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সুরেশচন্দ্রের বাড়ীতে প্রকাশ্যে যাতায়াত বন্ধ করিল, অর্থের প্রলোভন ছাড়িতে না পারিয়া গুপ্ত-দ্বার খুলিল। ধোপা নাপিত বন্ধ হইল—চতুর্দ্দিকে নিন্দার রোল ছাইয়া পড়িল। সুরেশের এ সকল সহ্য হইল না, তিনি দেশের লোকদিগকে যথেচ্ছা গালি দিয়া, স্থানান্তর হইতে ধোপা নাপিত আনয়ন করিলেন—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনিলেন। ক্রমে চাকর চাকরাণী পলায়ন করিল। সুরেশ স্থানান্তর হইতে চাকর চাকরাণী আর জুটাইয়া আনিতে পারিলেন না। গোপালপুরে একটী স্কুল ছিল, স্কুলের শিক্ষকেরা বিনোদের সহিত অকৃত্রিম ভালবাসায় জড়িত ছিল; তাঁহারা বিনোদের সহিত সাক্ষাতাদি করিত বলিয়া গ্রামের লোকেরা তাঁহাদিগের প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিল। একজন শিক্ষক তাঁহাদের গ্রাম হইতে একজন চাকর আনিয়া দিয়াছিল বলিয়া তাঁহার হুঁকা বন্ধ হইল।—কেবল তাহা নহে, তাঁহাকে স্কুল হইতে তাড়াইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল। স্কুলের শিক্ষকদিগকে গ্রামের লোকেরা পদে পদে অপমান করিতে লাগিল—পদে পদে নির্যাতন করিতে লাগিল। শিক্ষকেরা একত্রিত হইয়া উপরিতন কর্ম্মচারীদিগকে এ কথা জানাইলে গবর্ণমেণ্ট হইতে যখন বিশেষ কোন বন্দোবস্ত হইল না, তখন একে একে শিক্ষকেরা স্কুল পরিত্যাগ করিল। অবশেষে স্কুলটী এক প্রকার উঠিয়া গেল। গ্রামের লোকেরা বলিল,—ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষাই সর্ব্বনাশের মূল, শিক্ষায় প্রয়োজন নাই। ইহা বলিয়া, বালকদিগকে জ্যাটামির দলে ভর্ত্তি করিয়া দিল—দলাদলির "ক খ" শিক্ষা দিতে লাগিল। স্কুলের যে দশা ঘটিল—পোষ্টাফিসেরও প্রায় তাহাই ঘটিল। গ্রামের লোকেরা, প্রথমত পোষ্ট-পিয়নকে বিনোদ বাবুদের বাড়ীতে পত্র বিলি করিতে নিষেধ করিল, পিয়ন সে কথা অগ্রাহ্য করিল—সুতরাং একদিন তাহাকে প্রহার

সহ্য করিতে হইল। পিয়ন কর্ম্মত্যাগ করিল—গ্রামের ভাবগতিক দেখিয়া পোষ্টমাষ্টারও স্থানান্তরে গমনের অভিমত জানাইলেন, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না। কিয়দ্দিবস পরে ডাকঘর হইতে চুরি আরম্ভ হইল। এই প্রকারে পোষ্টাফিসটীও যায় যায় হইল। স্কুল গেল—পোষ্টাফিস যায় যায় হইল,—সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই—এদিকে এই আন্দোলনের সময় মদের আদর অত্যন্ত বাড়িল. পূর্ব্বে অনেক দূরে মদের দোকান ছিল, ক্রমে যখন আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন দোকানীরা আসিয়া গোপালপুরে ঘর বাঁধিল। এদিকে গোপালপুরের এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা, অন্য-দিকে কি হইল, তাহাও বলিতেছি। সেই রজনীতে যাহারা প্রহার সহ্য করিয়াছিল, তাহারা সে কথা গ্রামের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের কাহাকেও বলিল না—পাছে তাহারা বিরক্ত হয়। কোন প্রকার মকর্দ্দমাও উপস্থিত করিল না। এমন কি, কমলমণি যদি সকলের বাড়ী বাড়ী যাইয়া মেয়েদের দুর্দ্দশার (?) কথা—অপহরণের কথা না বলিতেন, তবে সেই রজনীর ঘটনা আর কেহই জানিতে পারিত কি না, সন্দেহ ছিল। সেই জন্যই বলিতেছিলাম—কমলমণির হাতে যদি কেহ অর্থ সংযোগ করিত, তবে তখনি গোলমাল চুকিয়া যাইত। তবে ঐ লোকগুলি মিলিয়া ভিতরে ভিতরে সুরেশচন্দ্রের অনিষ্টের চেষ্টায় রত হইল। ধনী গোবিন্দচন্দ্র এই দলের অধিনায়ক হইল। প্রথমত ইহারা প্রতিজ্ঞা করিল, সুরেশ বা বিনোদকে যেখানে পাইবে, সেইখানে ধরিয়া প্রহার করিবে, কিন্তু সে আশা পূর্ণ করা বড়ই কঠিন হইল। সুরেশ ও বিনোদ যখন বাড়ীর বাহির হইতেন, তখন ৩।৪ জন করিয়া অস্ত্রধারী সর্দ্দার ইঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। এদিকে নিরাশ হইয়া তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল, সুরেশের বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে অপমান করিবে। কিন্তু তাহাও হত-ভাগ্যদের দ্বারায় ঘটিয়া উঠিল না. সুরেশ ও বিনোদ গোপালপুরের মধ্যে অর্থ সম্বন্ধে নিতান্ত হীন নহেন; স্ত্রীলোক দূরে থাকুক, কোন চাকরকে অপমান করিতে পারে, গোপালপুরে এমন লোকও অল্প ছিল। অবশেষে তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল—সিঁধ কাটিয়া সুরেশদের বাড়ীতে প্রবেশ করিবে। এক দিন রাত্রে ইহারা কয়েকজন জুটিয়া সিঁধ কাটিয়া সুরেশদের গৃহে প্রবেশ করিল। এ সম্বন্ধে ইহাদিগের সকলেই অপরিপক্ক, গৃহে প্রবেশ করিয়াই ইহারা ধরা পড়িল। সুরেশচন্দ্র নিজ হস্তে উত্তম মধ্যম প্রহার

করিয়া পরদিন ইহাদিগকে পুলিসে চালান দিলেন। পুলিস আসিয়া গ্রামে পড়িয়া ইহাদিগের বাড়ী অনুসন্ধান করিল,—কতপ্রকার নির্যাতন করিল;—কেহ কেহ অর্থ দ্বারা নির্যাতনের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন; যাহাদের অর্থ ছিল না, তাহাদিগকে অশেষ প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হইল,—পরে কয়েকজনকে শ্রীঘরে পর্য্যন্ত পদনিক্ষেপ করিতে হইল।

গ্রামে এই প্রকার চতুর্দ্দিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল—দলাদলিতে গ্রামের স্কুলটী উঠিয়া গেল—পোষ্টাফিসটী যায় যায় হইল, ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের ঘরের তণ্ডুল শেষ হইয়া আসিল,—অভাবে এমনই হইল যে, অনেকের আর যেন দিন কাটে না। কেহ কেহ বা এ দিকে ওদিকে হাত চালাইয়া শ্রীঘরে গমন করিল। দলাদলিতে গোপালপুরের লোকেরা মত্ত—এ সকল-কেই তাহারা উন্নতির লক্ষণ মনে করিল;—গোপালপুরের বর্ত্তমান অবস্থায় কাহারও অশ্রুপাত হইল না। দলাদলির প্রথম অধ্যায় শেষ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দলাদলির অনল গৃহে।

সেই রজনীতে সুরেশচন্দ্র লোকজন লইয়া যখন সুলোচনাকে উদ্ধার করিতে গমন করেন, তখন কুলকামিনী, সুলোচনার ভগ্নী, সুরেশচন্দ্রের জননীর নিকটই ছিলেন। যখন সুলোচনাকে লইয়া সুরেশ ও বিনোদবাবু গৃহে ফিরিলেন, তখন কুলকামিনীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। বিহগ-শিশু শিকারীর ভয়ে ভীত হইয়া যে প্রকার জননীর পক্ষপুটের আড়ালে অঙ্গ ঢাকিয়া নিরাপদ মনে করে, কুলকামিনী ও সুলোচনা আজ অনন্তদেবীর স্নেহ-পক্ষপুটে আপনাদিগকে ঢাকিয়া সেই প্রকার নিরাপদ মনে করিলেন। অনন্তদেবী উভয়কে আপন আশ্রয়ে পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমে যখন দলাদলির আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তখন সেই উত্তাপ অন্তঃপুর পর্য্যন্ত পৌঁছিল। দেশময় রাষ্ট্র হইয়াছে,—বিনোদ বাবু ও সুরেশচন্দ্র সুলোচনা ও কুলকামিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ইহাদিগকে অপহরণ করিয়াছেন। ক্রমে এই সংবাদ অন্তঃপুরে পৌঁছিল—সুরেশের স্ত্রী আনন্দময়ী, এবং বিনোদের স্ত্রী শান্তিময়ীর হৃদয় মন বিষাদে মলিন হইল, মুখ ভার হইল। পাড়ার

দুষ্ট মেয়েরা ঐ কথায় রংচড়াইয়া এমন ভাবে ইহাদিগের নিকট উপস্থিত করিতে লাগিল যে, অবশেষে ইহারা সুলোচনা ও কুলকামিনীকে ঘোরতর বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। অনন্তদেবী পুত্রবধূদিগকে ও ইহাদিগকে সমান চক্ষে দেখিতেন, ইহাও ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। অসহায় সুলোচনা ও কুলকামিনীর এ অবস্থা বুঝিতে বাকী রহিল না। অল্প সময়ের মধ্যে ইহারা সকলি বুঝিতে পারিলেন। এক দিকে বাহিরের দলাদলির আন্দোলনে সুরেশচন্দ্র ও বিনোদের অশেষবিধ কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে, অন্য দিকে অন্তঃপুরে হিংসার অনল জ্বলিয়া উঠিয়া ইহাদিগের হৃদয়ের শান্তি বিনাশে উদ্যত—এই চিন্তা সুলোচনা ও কুলকামিনীর হৃদয়ে কালিমা লেপিয়া দিল,—উভয়ের মুখ মলিন হইল, উভয়ের শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইতে লাগিল। কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, উভয়ের অন্তরে এই চিন্তা। উভয়ে উভয়ের শান্ত্বনা, উভয়ে উভয়ের মুখের পানে চাহিয়া থাকিতেন। অনন্তদেবী ভাল মন্দ কিছুই জানেন না—তিরস্কার করিয়া সময়ে সময়ে বলেন,—দিন দিন তোদের এ প্রকার ভাব দেখ্‌ছি কেন? বাড়ীর মেয়ের মত কাজ কর্ম্ম কর্‌বি, না অলস হয়ে বসে থাকিস্? অনন্তদেবী এমন কর্কশ কথাই বা কেন বলেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, শান্তিময়ী ও আনন্দময়ী আজ কাল সর্ব্বদাই ইহাদিগের সম্বন্ধে নানা বিরুদ্ধ কথা বলিয়া একটু চটাইয়া দিয়াছেন। স্পষ্ট করিয়া মনের কথা শাশুড়ীর নিকট বলিতে পারেন না, কিন্তু নানা রকমে শাশুড়ীর মনে সন্দেহের গরল ঢালিয়া দিয়াছেন। শাশুড়ী ঠাকুরুণ ইহাঁদিগকে সমান চক্ষে দেখেন, ইহা বধূদের প্রাণের অসহ্য। এজন্য ইহারা সময়ে সময়ে মুখ ভার করিয়া থাকেন, কখনও বা শাশুড়ীকে অলক্ষিত ভাবে ঠাট্টা করেন,—কখনও বা শাশুড়ীর কথাকে অগ্রাহ্য করেন। এই প্রকার করিয়াও অনন্তদেবীর মন যখন খুব বিরক্ত হইল না, তখন ইহারা গৃহকার্য্যে শিথিলতা দেখাইতে লাগিলেন। যদি শাশুড়ী এজন্য তিরস্কার করিতেন, তাহা হইলে বধূরা বলিতেন, আমরা চারি জনে সমান কাজ করিব, ভাগ করিয়া দিন। শাশুড়ী বলিলেন, এরা কি তোদের সতিন, এদের প্রতি তোদের এত হিংসা কেন? দুই চারি দিনের জন্য এরা এসেছে, এরা আবার কাজ কর্ম্ম কি করবে? ইহার উত্তরে শান্তিময়ী বলিলেন, তবে আমরাও করব না। এই প্রকার জিদ্ রক্ষা করায় গৃহের কার্য্যাদিতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। অনন্তদেবীর মন ক্রমে ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিল;

তখন সুলোচনা ও কুলকামিনীকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তদেবী, বধূদিগের গূঢ় অভিসন্ধি কি, তাহা জানিতেন না। অনন্তদেবী যখন ইহাদিগের প্রতি একটু একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন সুরেশ ও বিনোদ একটু অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারাও ভিতরের কোন সংবাদই জানিতেন না; জানিতে পারেন নাই। তাঁহারা মনে ভাবিলেন, জননীর তিরস্কারেই সুলোচনা ও কুলকামিনী মলিন ও কৃশ হইতেছে। জননীর প্রতি তাঁহাদের উভয়ের যে শ্রদ্ধা ছিল, তাহার একটু হ্রাস হইল। জননীকে তাঁহারা ভালবাসার একটী প্রতিমূর্ত্তি মনে করিতেন, কিন্তু সেই জননীও যখন ভগ্নীদিগের প্রতি বিরক্ত হইলেন, তখন তাঁহারা মনে ভাবিলেন, গৃহে অশান্তির আগুন না রাখিয়া ইহাদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়াই ভাল। সুলোচনা ও কুলকামিনী ভিতরের সকল সংবাদই জানিতেন, তাঁহারা এই প্রস্তাবে আরো অসন্তুষ্ট হইলেন; মনে ভাবিলেন, পৃথক থাকিয়া ইহার পর সুরেশ ও বিনোদ বাবুর সহিত আমরা যদি কথাও বলি, তাহা হইলেও লোকের মনে সন্দেহ হইতে থাকিবে। বধূরা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অনন্তদেবী সম্মত হইলেন না। সুরেশ ও বিনোদ জননীকে বলিলেন— তোমার জন্যই আমরা ইহাদিগকে স্থানান্তরিত করিতে চাই, তুমি ইহাদিগকে আপনার কন্যার ন্যায় পালন করিতে পারিতেছ না। অনন্তদেবীর প্রাণে সন্তানদিগের এই কথা অসহ্য হইল, তিনি অশ্রু ফেলিয়া বলিলেন, দ্যাখ সুরেশ, দ্যাখ বিনোদ, আমি একদিনও ইহাদিগকে পরের ন্যায় দেখি নাই, যদি দেখে থাকি, ভগবান তার বিচার করিবেন।

বিনোদ বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, তবে ইহারা দিন দিন মলিন হইতেছে কেন? ইহাদের মনে কিসের চিন্তা?

অনন্তদেবী বলিলেন,—আমি তা কিছুই জানি না, দোহাই তোদের, আমাকে অবিশ্বাস করিস্‌নে, আমি তাহার কিছুই জানিনে। সুরেশচন্দ্র ও বিনোদ বাবু জননীর কথায় আশ্বস্ত হইলেন, স্থানান্তরে রাখা স্থগিত হইল। তাঁহারা উভয়ে কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। নির্জ্জনে সুলোচনা ও কুলকামিনীর নিকটে তাহাদের মলিন ও বিষণ্ণ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সুলোচনা কিছুই বলিল না—কুলকামিনী বলিল,—আমাদের অবস্থা সকল সময়েই ভাবিয়া ভাবিয়াই এই দশা উপস্থিত হইয়াছে।

সুরেশচন্দ্র বলিলেন,—তোমাদের কিসের ভাবনা?—আমরা থাকিতে

তোমাদের কোন চিন্তা নাই তোমরা যাহা বলিবে, আমরা তাহাই করিব।

সুরেশের এই কথা আনন্দময়ী আড়ালে থাকিয়া শুনিলেন। পূর্ব্বের সন্দেহ তাঁহার মনে আরো ঘনীভূত হইয়া উঠিল;—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—হয় আমি বিষ খাইয়া মরিব, না হয় ইহাদিগকে মারিব।'

সুরেশচন্দ্রের কথা শুনিয়া কুলকামিনী বলিলেন,—আপনারা আমাদের জন্য যাহা করিতেছেন, এ প্রকার কেহ আপন বোনের জন্যও করে না,—আমাদের জন্য আপনারা কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, আজও সহ্য করিতেছেন, ইহা ভাবিলেও চক্ষে জল আসে। আমাদের দ্বারা যদি আপনাদের আরো অনিষ্ট হয়, তবে তাহা আমরা কি প্রকারে সহ্য করব ?

বিনোদ বাবু বলিলেন,—কি অনিষ্ট ? আমাদের কি অনিষ্ট হইবে ?

সুলোচনা ভ্রুকুঞ্চিত করিলেন। কুলকামিনী মুখ নত করিয়া বলিলেন, অনুসন্ধান করুন, জানিতে পারিবেন।

বিনোদ বাবু পুন বলিলেন,—কোথায় অনুসন্ধান করিব ?

কুলকামিনী ধীরে ধীরে বলিলেন—গৃহে।

এই মর্ম্মভেদী কথা শুনিয়া সুলোচনার অন্তর শিহরিয়া উঠিল—শরীর রোমাঞ্চিত হইল। কুলকামিনীর শেষ কথা শুনিয়া সুরেশচন্দ্র ও বিনোদ বাবু উঠিয়া গেলেন।

সুলোচনা কুলকামিনীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—দিদি, কি সর্ব্বনাশ করিলি ? দিদি কি সর্ব্বনাশের পথ খুলিল, তাহা দিদি বুঝিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শান্তিময়ী না গরলময়ী ?

সেই দিন রাত্রে সুলোচনা ও কুলকামিনী শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু সুলোচনার চক্ষে নিদ্রা নাই—ভাল মন্দ কত কি চিন্তা মনের ভিতরে আগুন জ্বালিয়া দিতেছিল। সুলোচনা ভাবিতেছিলেন—আপনাদিগের পরিণাম—আর কত দিন এখানে থাকিব—পরে কোথায় যাইব—পরে কি দশা হইবে! মানুষ ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিণামের কি ঠিক করিতে পারে ? মানুষ পারে কি না পারে, জানি না। সুলোচনা পারিলেন না—মন

ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন হইল, ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল, নিদ্রাকর্ষণের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পোড়া নিদ্রা আজ অসময়ে সুলোচনার চক্ষে বসিল না। অবশেষে সুলোচনা উঠিয়া বাতি জ্বালিয়া পড়িতে লাগিলেন। কুলকামিনী তখন অচেতন ছিলেন, এ সকল কিছুই জানিতে পারেন নাই। রাত্রি অধিক হইল, মনুষ্য-জগৎ নীরব, নিস্তব্ধ,—নিদ্রার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়াছে; সুলোচনা তখনও পড়িতেছেন। পুস্তক পড়িতেছেন? না, তাহা নহে—পূর্ব্বেও যাহা, এখনও তাহাই পড়িতেছেন—আপনার পরিণাম—দিদির পরিণাম। এই প্রকার পরিণাম ভাবিতেছেন—এমন সময়ে সহসা সেই কক্ষে বিকটাকৃতি একজন মানুষ উপস্থিত হইল। সুলোচনা দেখিয়াই মনুষ্যকে চিনিলেন,—সেই রজনীর একজন নৃশংস। সুলোচনা ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, চিৎকারের পরক্ষণেই মূর্চ্ছিত হইলেন। কুলকামিনী চিৎকার শুনিয়াই উঠিলেন। বিনোদ বাবুও চিৎকার শুনিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিতে করিতেই সেই নৃশংস অন্তদ্বার দিয়া পলায়ন করিল। বিনোদ বাবু লোকের পশ্চাৎবর্ত্তী না হইয়া সুলোচনার মস্তকে তৈল জল দিতে লাগিলেন, কুলকামিনী বাতাস দিতে লাগিলেন। বিনোদ বাবু আজ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, বাড়ীর ভিতরে কি প্রকারে বাহিরের লোক প্রবেশ করিল, এই চিন্তায় মস্তিষ্ক বিলোড়িত হইল।

চিন্তার ফল ভাল হইল না—মন সন্দেহে পরিপূর্ণ হইল,—বুঝিলেন, বাড়ীর কেহ হয়ত দরজা খুলিয়া দিয়াছে। কেন দরজা খুলিয়া দিয়াছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী শান্তিময়ী গৃহের বাহিরে গিয়াছিলেন,—তাঁহার প্রতিই সন্দেহ হইল। কুলকামিনী একদিন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল—শান্তিময়ীর প্রতি অত্যন্ত সন্দেহ হইল, তিনি অধিকক্ষণ সুলোচনার নিকটে থাকিতে পারিলেন না—ত্রস্ত হইয়া সদর দরজার নিকটে গেলেন। সেখানে যাইয়া দেখিলেন, দরজা বন্ধ। তৎপরে খিড়্‌কির দরজার নিকটে গেলেন। সেখানে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে শরীর শিহরিয়া উঠিল,—দেখিলেন, শান্তিময়ী ও আনন্দময়ী একটী পুরুষের সহিত নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে;—এই সময়ে এ দিকে কেহ আসিবে, তাহা তাহারা ভাবে নাই, নির্ভয়ে কথা বলিতেছে। বিনোদ বাবুকে দেখিয়াই তিন দিকে তিন জন

লোক বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিল, কাহাকেও তিনি ধরিতে পারিলেন না। বিনোদ বাবু বিষম সমস্যার মধ্যে পড়িলেন, বাড়ীর ভিতরে আর কোন লোক আছে কি না,তাহারই অনুসন্ধান করিবেন, না গৃহে যাইয়া শান্তিময়ীকে ধরিবেন ? এক জনের দ্বারা দুই দিক রক্ষা পাইল না,—অন্য কাহাকে ডাকিলেন না,—গোলমাল হইবে, পাড়ার লোকেরা জানিবে, এই আশঙ্কায় অন্য কাহাকেও ডাকিলেন না,—বাড়ীর আর কোন স্থান অনুসন্ধান করিবার জন্যও ব্যস্ত হইলেন না ; আপন গৃহে প্রবেশ করিলেন। করিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। বিনোদ বাবু মনে ভাবিয়াছিলেন,গৃহে যাইয়া দেখিবেন, শান্তিময়ী দীর্ঘ দীর্ঘ শ্বাস ফেলিতেছেন, ভয়ে জড়সড় হইয়াছেন। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে দেখিলেন, তিনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। বিনোদ মনে ভাবিলেন, "আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ?—না, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে।" ইহা মনে ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ শান্তিময়ীকে ডাকিলেন। শান্তিময়ী স্বামীর ডাক শুনিলে অন্যদিনও যে প্রকার ভাবে উঠিতেন, অদ্যও ঠিক সেই ভাবে উঠিলেন,—উঠিয়া ঠিক অন্যান্য দিনের ন্যায় বলিলেন—"কি চাই ?" বিনোদ বাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল, সকলি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, বিস্ময়ে বলিলেন, তুমি কতক্ষণ পূর্ব্বে গৃহে আসিয়াছ ?

শান্তিময়ী বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, তুমি কি স্বপ্ন দেখিতেছ ? আমিত কোথাও যাই নাই ; কোথা থেকে ঘরে আস্‌ব ?

বিনোদ বাবু ক্রোধ-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, কোথা থেকে ?—তা তুমি যেন কিছুই জান না ?—শীঘ্র বল।

শান্তিময়ী যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন, ওমা তুমি বলছ কি, ক্ষেপেছ নাকি ? তুমি কোথা থেকে ক্ষেপে এসেছ—মাতাল হয়েছ নাকি ?

বিনোদ বাবু একটু নত হইলেন—বলিলেন, এ বেশ কথা, উল্টা চাপ, এ বেশ চালাকি শিখেছ ; কিন্তু দাঁড়াও আমি আস্‌ছি। এই বলিয়া বিনোদ বাবু সুলোচনাদের গৃহের দিকে চলিলেন, ভাবিলেন, এতক্ষণ সেখানে না যাইয়া ভাল করি নাই। শান্তিময়ী বিনোদ বাবুকে গমনোদ্যত দেখিয়া বলিলেন, এস, যেওনা যেওনা, কথা আছে।

বিনোদ বাবু স্ত্রীর প্রতি সন্দেহযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না, যদি শান্তিময়ী নির্দ্দোষী হয়, তবে কেন অকারণ তাহার

মনে কষ্ট দি, ইহা মনে করিয়া আবার গৃহে প্রবেশ করিলেন। শান্তিময়ী এবার ভাল ভাবে বলিলেন, কি হয়েছে, বলত ?

বিনোদ বাবু বলিলেন, কি হয়েছে আমি বল্‌ব ? না তুমি বল্‌বে ?

শান্তিময়ী বলিলেন,—আমার নিকট কি জান্‌তে চাও ?

বিনোদ বাবু।—তোমার যে কথা বলিবার আছে, তাহাই বল ?

শান্তিময়ী।—একটী প্রতিজ্ঞা কর, পরে বল্‌ছি।

বিনোদ বাবু।—কি প্রতিজ্ঞা, বল।

শান্তিময়ী।—প্রাণান্তেও এ কথা কাহাকে বলিবে না।

বিনোদ বাবু।—আচ্ছা বল্‌ব না।

শান্তিময়ী,—আজ বৈকালে দিদির হাতের লেখা এক খানি কাগজ পেয়েছি—তাহা তোমাকে দেখাইতেছি।

এই বলিয়া কাগজ খানি বিনোদ বাবুর হাতে দিলেন। বিনোদ বাবু কাগজ খানি দেখিয়া অবাক হইলেন, বলিলেন, এ কাগজ তুমি কোথায় পাইলে ?

শান্তিময়ী।—দিদির বালিসের নীচে।

বিনোদ বাবু।—এর পূর্ব্বে আমাকে ইহা দেখাও নাই কেন ?

শান্তিময়ী।—কিসের পূর্ব্বে ?

বিনোদ বাবু।—বাড়ীতে লোক প্রবেশের পূর্ব্বে—সন্ধ্যার সময়ে।

শান্তিময়ী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, লোক আসিয়াছে, ওমা সে কি ?

বিনোদ বাবু সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। তাঁহার মনে যে সন্দেহ-মেঘ জমিয়া ছিল, তাহা একটু কমিয়া আসিল, বলিলেন, সন্ধ্যার সময় দেখাও নাই কেন ?

শান্তিময়ী।—সময় পাই নাই। এই বলিয়া শান্তিময়ী বলিলেন, চল আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, বাড়ীতে লোক ঢুকিয়াছে, অথচ তুমি নিশ্চিন্ত মনে এখানে আছ ? এ কাজটী ভাল হয় নাই, এখনই চল।

বিনোদ বাবু বলিলেন, আমি নিশ্চিন্ত নই, এই জন্যই যাইতেছিলাম, তুমি ডাকিলে, তাই ফিরিলাম।

ইহা বলিয়া বিনোদ বাবু অগ্রে অগ্রে চলিলেন। এবার দাদাকে ডাকিলেন, বাড়ীর আর সকলকে ডাকিলেন, মনের সন্দেহ একটু ঘুচিয়াছে—বাড়ীর সকলকে নির্ভয়ে ডাকিলেন। সকলে মিলিয়া সুলোচনাদের ঘরে

যাইয়া দেখিলেন, সে ঘরে কেহই নাই; এক জন আহত পুরুষের শরীর মৃত্তিকায় পড়িয়া রহিয়াছে; আর গৃহে কেহই নাই,—সুলোচনা নাই, কুলকামিনী নাই। বিনোদ বাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। সকলে হতবুদ্ধি হইয়া এদিক ওদিক অনুসন্ধানে ছুটিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গৃহ-সুখে বিষ!

পরে যাহা ঘটিবার, তাহাই ঘটিল। সেই রাত্রেই সহৃদয়তাকে বুকে বাঁধিয়া বিনোদ বাবু জননীর নিকটে গেলেন—যাইয়া সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন। শুনিয়া অনন্তদেবীর গম্ভীর মূর্ত্তি একটু চঞ্চল হইল—শান্ত ভাবে একটু উষ্ণত্ব মিশিল, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নির্ভীক চিত্তে বলিলেন,—যা হয়েছে তা ত শুনিলাম, এক্ষণে কি চাও?

বিনোদ বাবু বলিলেন, আপনার অনুমতি চাই।

অনন্তদেবী—কি অনুমতি চাও?

বিনোদ বাবু—আমাদের বাড়ীতে এই প্রকার ঘটনা ঘটিল, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। আমি এই অনাথাদিগের উদ্ধারের জন্য জীবনকে ভাসাইব; কিন্তু আপনার অনুমতি ভিন্ন এক পা ও অগ্রসর হইতে পারি না। আপনার প্রসন্ন মুখের অনুমতি পাইয়া নির্ভীক হৃদয়ে গৃহ হইতে বাহির হইতে চাই।

অনন্তদেবী বলিলেন,—বিনোদ, তুমি মূর্খ, সৎকার্য্য করিবার সময় আবার অনুমতির আবশ্যক কি? আমি কি কখনও কোন ভাল কার্য্য করিবার সময় তোমাদিগকে বাধা দিয়াছি? অনাথাদিগকে আমি আর পর ভাবি না, উহারা আমার প্রাণের বস্তু—উহাদিগকে তোমাদিগের সহোদরার ন্যায় মনে করি। ভগ্নী যখন গৃহের বাহিরে, তখন যে ভাই নিশ্চিন্ত মনে গৃহে থাকে, সে পাষণ্ড। যাও, ভ্রাতার কর্ত্তব্য পালন কর;—সুলোচনা ও কুলকামিনীকে উদ্ধার কর। যদি উদ্ধার করিতে না পার—তবে আর গৃহে ফিরিও না—ভগ্নী-শূন্য গৃহে আর ফিরিও না।

অনন্তদেবীর প্রশস্ত হৃদয়ের গম্ভীর অথচ মধুময় উৎসাহ-পূর্ণ বাক্য ক্ষয়ে-

কটী বিনোদ বাবুর হৃদয়কে অস্থির করিয়া তুলিল; তখনি জননীর চরণে প্রণিপাত করিয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া সুরেশ বাবুর নিকটে আসিলেন। সুরেশচন্দ্র বলিলেন, আমি বাড়ী থাকিয়া শত্রুদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করি, তুমি ইহাদিগকে উদ্ধার করিতে যাও। আমার মনে হয়, পাষণ্ডেরা ইহাদিগকে অনেক দূরে লইয়া গিয়াছে। বিনোদ বাবু দাদার নিকট বিদায় লইয়া শান্তিময়ীর নিকটে আসিলেন। শান্তিময়ী তখন নিশ্চিন্ত মনে ছিলেন, কণ্টক পরিষ্কৃত হইয়াছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ছিলেন, সহসা বিনোদকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন, এ বেশে কোথায় যাইতেছ?

বিনোদ বাবু।—আমার প্রাণ আজ অস্থির হয়েছে—তুমি তা কি বুঝিবে? আমি এক্ষণই সুলোচনাদের অনুসন্ধানে গৃহ পরিত্যাগ করিব।

শান্তিময়ীর হৃদয় চঞ্চল হইল, বলিলেন, তুমি একাকী যাইবে? তাহারা কোন্ পথে গিয়াছে, তাহা কেমনে জানিবে? তুমি যে'ও না।

বিনোদ বাবু বলিলেন, তোমার নিকট এর চেয়ে আর অধিক উৎসাহের কথা কি শুনিব,—তুমি স্বার্থের দাসী বই ত নও! এত দিন পরে আজ জননীর আদেশে গৃহ পরিত্যাগ করিব—সর্ব্বমঙ্গলার নিকট প্রার্থনা করি, যেন আমাকে পুন তোমার স্বার্থময় বন্ধনে জড়িত হইতে না হয়।

শান্তিময়ী স্বামীর এই নিদারুণ কথা শুনিয়া ক্রন্দন-স্বরে বলিলেন—আমি জানি, আমি বুঝি, আমি তোমার উপযুক্ত স্ত্রী নহি, কিন্তু কি করিব, তোমার মন যোগাইয়া চলিতে চেষ্টার কখনও ত্রুটি করি নাই। দুঃখিনী, জ্ঞানহীনা অবলাকে পরিত্যাগ করে যে'ও না,—আজ হইতে আমার সকল দোষ সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব। আজ তুমি আমাকে ক্ষমা কর—আজ আমার কথা শুন।

বিনোদ বাবু আর কথা শুনিলেন না। অনেক সময় বৃথা যাইতেছে দেখিয়া, তখনি গৃহ হইতে বাহির হইলেন। বিনোদ বাবু বুঝিলেন, এ বড়ই বিষম সমস্যা, এ কণ্টক পরিষ্কার করা বড়ই কঠিন। দেখিতে দেখিতে শান্তিময়ী বিনোদ বাবুর পাদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন,—বলিলেন, অপরাধ ক্ষমা কর—গৃহে ফের, যা হয়েছে তা হয়েছে, আর হবে না।

বিনোদ বাবু ক্রোধ-যুক্ত স্বরে বলিলেন—কি হয়েছে, আর কি হবে না? আমি যখনি সৎকার্য্য করিতে যাই, তখনি তুমি এই প্রকার বাধা দেও;

ধিক তোমার জীবনে! মনে করিও না, আমি তোমার স্বার্থ-পূর্ণ কথায় ভুলে আজ কর্ত্তব্য পথ হতে ফিরিব। তুমি যদি আজ এই স্থানে প্রাণ-ত্যাগ কর, তবুও আমি ফিরিব না। এই বলিয়া বিনোদ বাবু বলপূর্ব্বক শান্তিময়ীর হস্ত হইতে মুক্ত হইলেন, এবং দ্রুত পদনিক্ষেপ করিয়া চলিলেন। শান্তিময়ী কতক্ষণ চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু যখন বুঝিলেন, স্বামীকে ধরিতে পারা সহজ কথা নয়, এবং যখন জানিলেন, তাহার রোদনের স্বর আজ স্বামীর কর্ণকুহর পর্য্যন্ত পৌঁছিতেছে না, তখন আস্তে আস্তে বিষণ্ণ মনে গৃহের দিকে ফিরিলেন। শান্তিময়ী গৃহের দিকে ফিরিয়াছেন, যখন বিনোদ বাবু বুঝিলেন, তখন পুন গ্রামের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া সকল স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, আকাশের কোলে নক্ষত্র-মণ্ডলী মৃদু মৃদু জ্বলিতেছে,—নিম্নে সকলই অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বিনোদ বাবু এ বাড়ী ও বাড়ী অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এ ঘরে ও ঘরে কাণ পাতিয়া কথা শুনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লালিলেন, কিন্তু কোথায়ও কোন সাড়া শব্দ পাইলেন না। তাঁহাকে দেখিয়া মধ্যে মধ্যে এক একটী কুকুর কেবল ডাকিয়া উঠিতে লাগিল; দুই একটা পেচক বা অন্য পক্ষীর স্বর শুনিলেন, আর কোন শব্দই কর্ণে প্রবেশ করিল না। গ্রামের সকল স্থান অনুসন্ধান করা হইল; কিন্তু কোথাও কিছু সন্ধান পাইলেন না। সুলোচনাদের অনুসন্ধানের জন্য পূর্ব্বে আর যে সকল লোক বাহির হইয়াছিল, তাহাদেরও কোন সন্ধান পাইলেন না। মনে ভাবিলেন, হৃদয়শূন্য অর্থের দাসদিগের দ্বারা পৃথিবীর কোন সৎকার্য্য হয় না,—তাহারা অনুসন্ধানের পরিবর্ত্তে সকলেই আপন আপন স্বার্থের পথে গিয়াছে। শান্তিময়ীর ব্যবহার, ভৃত্যদিগের ব্যবহার, এই গভীর নিস্তব্ধ রজনীতে বিনোদ বাবুর মনে এক অভূতপূর্ব্ব চিন্তার উদ্রেক করিল—"পৃথিবীর সকলই স্বার্থের দাস, সকলেই স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত।" আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, এই কথাটী ভাবিতে ভাবিতে বিনোদ বাবু পুন গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন। তখন রজনী প্রভাত হয়-হয় হইয়াছে, এমন সময়ে বিনোদ বাবু গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন।
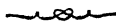
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আঁধার জীবন-পথে।

স্থলোচনা ও কুলকামিনীর কপালে পরে কি ঘটিল, বলিতেছি। স্থলোচনা ও কুলকামিনীকে অপহরণ করিতে যাহারা আগমন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাড়ীর বাহিরে ছিল, কেহ কেহ ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। স্থলোচনা একজনকে গুরুতর রূপে আঘাত করেন। একজন আহত হইলে আর সকলে পলায়ন করে। নিমেষের মধ্যে এই ঘটনা ঘটে। স্থলোচনা ও কুলকামিনী আর অপেক্ষা না করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। কোথায় যাইবেন, কোন্ পথে হাটিবেন, কিছুই ঠিক নাই, তবুও বাহির হইলেন। বিনোদবাবুদের বাড়ীতে থাকা আর সঙ্গত বোধ হইল না, দুই ভগ্নী এক-মত হইয়া, প্রাণে প্রাণে মিলিয়া, সেই রজনীতে বিপদকে আলিঙ্গন করিবার জন্য গৃহের বাহির হইলেন। যাহাদের গৃহে বিপদ, তাহাদিগকে বাহিরের বিপদ আর ভয় দেখাইতে পারিল না,—উভয়ে গৃহের বাহির হইলেন। স্থলোচনার হস্তে একখানি অস্ত্র ছিল, সেই অস্ত্রদ্বারাই একটী লোককে আঘাত করিয়াছিলেন। ভাল মন্দ বিচারের শক্তি নাই—ভবিষ্যৎ ভাবিবার সময় নাই, উভয়ে উভয়ের মুখ চাহিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে যে তাঁহাদের জন্য গুপ্তচর নূতন বিপদের শৃঙ্খল হাতে করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাদের সে ধারণা ছিল না। অনাথাদিগের জন্য ঈশ্বর যে আরো বিপদ রাখিয়াছিলেন, ইহারা তাহা বুঝিতে পারেন নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। স্থলোচনা ও কুলকামিনী কমলমণির হাতে ধরা পড়িলেন। কমলে আরো কণ্টক ছিল, মণিতে আরো গরল ছিল;—সেই কণ্টক, সেই গরল অনাথাদিগকে ধরিয়া বসিল। স্থলোচনা ও কুলকামিনীর হৃদয় চমকিত হইয়া উঠিল। কুলকামিনী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

কমলমণি চতুর স্ত্রীলোক,—আজ ক্রোধের পরিবর্ত্তে ভালবাসার ফাঁদ পাতিল। বলিল,—মা তোদিগকে এই কয় দিন না দেখে আমার প্রাণ অস্থির হয়েছে। আর কিছু চাইনে, একবার তোদিগকে ভাল করে দেখে মরব, এই সাধ হয়েছে। আমার মরবার দিন নিকটে, এই দ্যাখ্

কি হয়ে গিয়াছি! কমলমণি সুলোচনার হাত টানিয়া আপন বক্ষে জোরে চাপিয়া ধরিল। সেই বক্ষ চক্ষের জলে প্লাবিত হইল। কতক্ষণ এই ভাবে গত হইলে, জননী পুন বলিল,—মা, আর না, চল, আমার অনেক ত্রুটি ছিল, সে সব ক্ষমা কর, মায়ের অপরাধ ধরিস্‌নে, চল; শেষের কয়টা দিন তোদিগকে দেখে চলে যাই।

সুলোচনা বলিলেন,—কোথায় যাইতে বলিতেছ?—কলঙ্কের মধ্যে ডুবিতে?—কখনই হবে না। কখনই যাব না।

কমলমণি আরো নরম হইল, বলিল—মা হয়ে আবার তোদের সর্ব্বনাশ কর্‌ব?—আমি মরেছি, আমি ডুবেছি, তোরা যদি আমায় ক্ষমা করে না দেখিস্‌, তবে আর আমার পানে চাইতে কেহ নাই—পৃথিবীতে কোন মানুষ নাই—স্বর্গে কোন দেবতা নাই। মা, তোরা ক্ষমা কর, মা হয়ে তোদের নিকট ক্ষমা চাচ্ছি, দোহাই তোদের, আমায় ক্ষমা কর, ঘরে চল্‌।

কুলকামিনীর কোমল হৃদয় বিগলিত হইল, বলিলেন,—গ্রামে আর আমাদের মুখ দেখাবার পথ রাখ নাই, আর কোথায় যাইব?

কমলমণি বলিল, সব চাপা দিয়া রাখ্‌ব, না পারি, গোপালপুরের কার কি খবর না জানি?—সকলের ঘরের খবর বাহির কর্‌ব। তোদের কোন ভয় নাই, তোদিগে কেহ কিছু বল্‌বে না, ঐ বিনে ব্যাটার ঘারে সব চাপায়ে দেব।

সুলোচনার হৃদয় মন দুঃখে, ক্ষোভে অধীর হইল, কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—"সর্ব্বনাশি,—নিষ্কলঙ্ক বিনোদ বাবুর উপর দোষারোপ ক'রে আমাদের মন ফেরাবি, মনে ভেবেছিস্‌? বামন হয়ে স্বর্গের চাঁদ ধরিবার সাধ তোর কখনই পূর্ণ হবে না—বিনোদ বাবুর স্বভাবের কিছুই কর্‌তে পার্‌বিনে—অন্তত যত দিন আমি আছি। তোর মুখ দেখ্‌তে নেই—তুই না পারিস্‌ এমন কাজই নেই, ছেড়ে দে।" এই বলিয়া বলপূর্ব্বক জননীর হস্ত হইতে মুক্ত হইলেন। তার পর কুলকামিনীকে বলিলেন—দিদি, তুই যাবি কি না, বল, আমি আর এখানে থাক্‌ব না, আমার প্রাণ যেন কেন অস্থির হইয়াছে।

কুলকামিনী হতবুদ্ধি হইলেন। কমলমণি, সুলোচনা হাত ছাড়াইল দেখিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইল, আপন মূর্ত্তি ধরিয়া বলিল, যা ত দেখি কোথায় যাবি,—এখনি তোকে ধরে মনের সাধ মিটাব—ঐ পাপে

ডুবাব। এই বলিয়া কমলমণি অন্যান্য সকল লোকদিগকে ডাকিল। সে বিকট চিৎকারে চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিয়া সুলোচনাকে ঘেরিয়া ফেলিল। সুলোচনা কৌশল ভিন্ন আর উপায় না দেখিয়া, ধীরে ধীরে বশ্যতা স্বীকার করিলেন। বলিলেন, তোরা কেহ আমাকে ধরিসনে, আমি মায়ের সহিত যাইতেছি। এই বলিয়া, সুলোচনা ও কুলকামিনী চলিলেন। কমলমণি, সকলকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে বলিল, কিন্তু তাহাতে সুলোচনা আপত্তি করায় সকলকে অন্য কাজে পাঠাইল। কমলমণি জানিত, সুলোচনা মিথ্যা কথা বলে না। সুলোচনা ও কুলকামিনীকে লইয়া কমলমণি গোপালপুর ছাড়াইয়া নিকটবর্ত্তী একটী নূতন গ্রামে প্রবেশ করিল। সুলোচনা সে গ্রামের সে বাড়ী কখনও দেখেন নাই। সে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে মন অগ্রসর হইল না—জননীকে বলিলেন,—মা, আমাদের বাড়ীতে চল্, এবাড়ীতে যাইব না। সুলোচনা অন্যমনস্ক ছিলেন, গোপালপুর যে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। মাতা বলিলেন, আজ এখানেই থাকি। কাল বাড়ীতে যাইব, আজ অনেক রাত্রি হইয়াছে। সুলোচনা অনিচ্ছার সহিত জননীর সহিত যাই সেই অপরিচিত বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, অমনি বহির্দ্দিক হইতে সে বাড়ীর দরজা বন্ধ হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

জননী নহে,—পিশাচিনী!

যখন বাহির হইতে দরজা বন্ধ হইল, তখন সুলোচনা মায়ের চক্রান্ত সকলি বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিয়াও কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। বিনোদ বাবুদের বাড়ীর বাহির হইলে এত বিপদে পড়িবেন, পূর্ব্বে সুলোচনা বা কুলকামিনী, কেহই বুঝিতে পারেন নাই। সেই অপরিচিত গৃহে প্রবেশ করিয়া উভয়ে উভয়ের মুখ চাহিতে লাগিলেন। কুলকামিনী বলিলেন,—বোন্, আর তোকে বাঁচাইতে পারিলাম না। কুলকামিনীর দুই চক্ষু দিয়া ধরাবাহী হইয়া জল পড়িতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে আবার বলিলেন, "তুই কি ভাবিতেছিস্?—আর বিনোদ বাবুকে দেখিবার সম্ভাবনা নাই—একবার মা ভগবতীকে স্মরণ কর।"

কুলকামিনী আর কথা বলিতে পারিলেন না, অঞ্চল দ্বারা চক্ষু পুছিলেম।

স্থলোচনা সকলি বুঝিতে পারিলেন; ধীর-স্বরে বলিলেন,—যা হবে তা হবেই, আমি অবশ্য রক্ষা পাইব, এই দা দেখিতেছ না ?

কুলকামিনী বলিলেন, তাই হো'ক।

আর কথা হইতে পারিল না। বাড়ীর ভিতরে যাইয়াই কমলমণি স্থলোচনাকে এক ঘরে, কুলকামিনীকে অন্য ঘরে যাইতে বলিল।

স্থলোচনা বলিলেন, আমি দিদিকে ছেড়ে কখনই অন্য ঘরে যাব না।

কমলমণি আর কিছু না বলিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে পৃথক করিতে দুই জন লোককে আদেশ করিল।

স্থলোচনা অগত্যা অপমানের ভয়ে ভগ্নীর সহিত পৃথক হইলেন। মনে ভাবিলেন—যত বিপদ থাকে, আসুক। স্থলোচনা বিপদের সময়ে আজ নির্ভীক হইলেন।

স্থলোচনাকে এক ঘরে আবদ্ধ করা হইল, কুলকামিনীকে অন্য ঘরে। কমলমণি জানিত, কুলকামিনীকে হাত করিতে পারিলে সকল বাসনাই পূর্ণ হইবে। কমলমণির আদেশে দুই জন অপরিচিত লোক স্থলোচনার ঘরে প্রবেশ করিল। কমলমণি আপনি কতকগুলি টাকা ও অলঙ্কার লইয়া কুলকামিনীর নিকটে যাইয়া বসিল। প্রথমত কমলমণি বিনোদ বাবুদের নিন্দা করিতে লাগিল। নিন্দা শ্রবণে কুলকামিনী উষ্ণ হইলেন, বলিলেন, মা, তুই আর ও সকল কথা বলে আমার প্রাণে আঘাত করিস্‌নে। বেশি পীড়াপীড়ি করবিত বিষ খেয়ে মরব।

চতুর কমলমণি অমনি প্রকারান্তরে বিনোদ বাবুদের প্রশংসা আরম্ভ করিয়া বলিল,—না তেমন কিছু নয়, বিনোদ বাবু ভাল লোক, তবে কি না, বাড়ীর আর সকল লোক তেমন নয়।

কুলকামিনী আবার তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিলেন; কমলমণি অমনি আপন মেয়েদের প্রশংসা আরম্ভ করিল। কুলকামিনী তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, বলিলেন, মা তুই কি আমাকে পাগল না বোকা পেয়েছিস্‌ যে, যা ইচ্ছা তাই বলে আমাকে ভোলাবি ? তোর মনের ভাব কি, বল্‌।

কমলমণি বলিল, এই দ্যাথ্‌ তোর জন্য কত অলঙ্কার এনেছি। স্থলোচনা অলঙ্কার ভালবাসে না, তাকে আর কি দেব ? এই দ্যাথ তোর জন্য কত গয়েনা প্রস্তুত করেছি।

কুলকামিনী বলিলেন, আমি ও সকল কথায় আর ভুল্‌ব না,—তোর মনের ভাব কি, স্পষ্ট করে বল্‌?

কমলমণি বলিল, তোদের নিকট আর কিছুই চাই না, একমাত্র ইচ্ছা এই,—তোরা আমার কথা মতে চল্‌, সুখে থাক্‌।

কুলকামিনী বলিলেন, তোর কথা শোনার চেয়ে বিষ খেয়ে মরা সহস্র গুণে ভাল। তুই মা হয়ে কেমন করে আমাদিগকে পাপে ডোবাতে চাচ্ছিস? তোর নিকট যাহা সুখ, আমাদের নিকট তাহা বিষ। আমরা কখনই তোর কথা মতে চল্‌ব না। মনের জেদ্‌ বজায় রাখ্‌তে না পারি, বিষ খেয়ে মর্‌ব। মা তুই ক্ষমা কর্‌, আমাদের ছেড়ে দে। না জানি আজ তুই কি সর্ব্বনাশ ঘটাবি! সুলোচনাকে হয়ত আমি আর দেখ্‌তে পাব না! সে কখনই তোদের অত্যাচার সহ্য কর্‌বে না। টাকার জন্য আপনি কুল দিয়া মজেছিস্‌—আবার আমাদিগকে মজাবি?—কখনই তোর এ সাধ পূর্ণ হবে না! তোর হৃদয়ে এত গরল ছিল, পূর্ব্বে ত ভাবি নাই! তোর পায়ে ধরি, ক্ষমা কর্‌। যদি বেঁচে থাকি, যদি মনের বাসনা পূর্ণ হয়, তোর আকাঙ্ক্ষা মিটাব।

কমলমণি পাষাণ দিয়া বুক বাঁধিয়া বলিল,—টাকা? তোদের টাকায় আমার ঘরকন্না হবে, তা মনেও ভাবিস্‌নে। আজ কথায় না পারি জোর করে তোদের মত ফিরাব, খ্রীষ্টানি মত লয়ে কখনই থাকতে দিব না। এই বলিয়া কমলমণি কৃত্রিম ক্রোধভরে সে স্থান হইতে উঠিয়া সুলোচনার ঘরে আসিল। সুলোচনা তখন ভীমরূপ ধারণ করে আত্মরক্ষা করিতেছিলেন, বলিতেছিলেন,—"কেহ আমার নিকটে আস্‌বি ত অমনি এই দা দিয়া কাট্‌ব,—না পারি আমি মর্‌ব।" জননীকে দেখিয়া সুলোচনার একটু সাহস হইল,—হাজার হো'ক, জননী ত। মায়ের মুখ দেখে সুলোচনার প্রাণে একটু বল আসিল। ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিয়া কমলমণি অন্য লোকদিগকে বলিল, তোমরা অন্য ঘরে যাও, আমি সুলোচনার মনের কথা শুনি।

অন্য লোকেরা গৃহান্তরে যাইতে না যাইতে সুলোচনা কাঁদিতে কাঁদিতে জননীকে বলিলেন,—"মা, তুই ইহার বদলে হাতে তুলে বিষ দে, খেয়ে মরি—ম'রে বাঁচি! বুঝেছি—বুঝেছি, এই জন্য তোর গর্ভে জন্মেছিলাম! জননী নাম, কত আদরের, তা আমার নিকট বিষের ন্যায় হলো! তোর মনে কি

এই ছিল,—মা হয়ে মেয়েকে মারিবার জন্য এনেছিস্ ? এনেছিস্ বেশ হয়েছে, তুই হাতে তুলে বিষ দে, খেয়ে বাঁচি—সংসারের যন্ত্রনার হাত এড়াই। তা দিবে নে, তা দিতে পারিস্‌নে, তা দিলে তোর স্বার্থ পূর্ণ হয় না। বুঝেছি, সব বুঝেছি। আজ এই দা দিয়া তোর সাম্‌নে আত্মঘাতী হব। মরিব ?—মরিতেই জন্মেছি, মরিতেই এসেছি ! পাপ হবে ? হবে না,—কখনই পাপ হবে না—পবিত্রতার জন্য মরিব। লোকে তা বিশ্বাস করিবে না ?—যে ঘরে জন্মেছি, লোকে তা শুন্‌বে না, তা জানি। কিন্তু স্বর্গের দেবতারা শুনিবেন—আমার কথা নিশ্চয় শুনিবেন,—শুনে আমাকে ক্ষমা করিবেন।" এই বলিয়া সুলোচনা হস্তের অস্ত্র উত্তোলন করিলেন।

এ দৃশ্য কমলমণির সহ্য হইল না, স্বার্থে কণ্টক পড়ে ভাবিয়া তখনি অস্ত্র ধরিল। তারপর বলিল,—সুলোচনা, স্থির হ, আমার কথা শোন্। আমার কথা শুনে তার পর মর্‌তে ইচ্ছা হয়, মরিস্। তোর বিয়ে করার বড় সাধ ছিল, সেই জন্য আমি পাত্র ঠিক করেছি, তোকে কলঙ্কিত পথে আর যেতে হবে না, তোর বিয়ে দেব। তোর গায়ে গয়েনা না দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায়, মা হয়ে কি তোর এবেশ দেখ্‌তে পারি ? বাছার চুল গুলি শাদা পানা হয়ে গেছে, তেল সিন্দুর বিনে কি চুল ভাল দেখায় ? মা, তোর মুখ খানি শুকায়ে গেছে, আর তোকে কষ্ট পেতে হবে না, আয় তোকে তেল সিন্দুর ও গয়েনা পরিয়ে দি।

সুলোচনা আবার বলিতে লাগিলেন,—আমার গায়ে গয়েনা ?—এই দায়ের আঘাত। ছেড়ে দে, গয়েনা পরিয়া তোর সাধ পূর্ণ করি। আমার রূপের জন্য তুই বড়ই কাতর ? ছেড়ে দে, অপরূপ বেশে আজ সাজিয়ে তোকে দেখাই। আমার বিয়ে দিবি ?—ছেড়ে দে, এই দেহ এই মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত করে, বরমাল্য বসুন্ধরাকে অর্পণ করি। সর্ব্বনাশি, তোর মনে কি এতই ছিল ? আজও তোর বাসনা মিট্‌ল না, এত কষ্ট দিয়াও তোর আশা পূর্ণ হলো না। বুঝেছি, আমি থাক্‌তে তোর আশার নিবৃত্তি হবে না। এক-মুহূর্ত্ত ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, বাসনা মিটাই। দিলি না, দিবি না, ছেড়ে দিতে জানিস্‌নে ? তবে আমার দিদিকে ডাকি। তোর লজ্জা বা ভয় নাই, তা জানি, কিন্তু দিদিকে পাইলে আমার উপায় হবে।" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—"দিদি, দিদি, এক বার আয়, আমি জন্মের মত যাই, বিদায়

দিয়ে যা, তোর সুলোচনার নব বেশ একবার দেখে যা। আজ অপূর্ব্ব সাজে সাজ্‌ব, দিদি একবার আয়।”

সুলোচনার আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া কুলকামিনী নিমেষের মধ্যে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া উন্মত্তের ন্যায় জননীকে বলিলেন—“মা, সুরোকে ছেড়ে দে, আমাকে নিয়ে তুই থাক্। ধরিস্‌নে, ধরিস্‌নে, সুরোকে ছাড়্। আমি তোর নিকট বিকাইব, তোরই কথা মতে চলিব। ছাড়, ছাড়। মা, সুরোর প্রাণে আর আঘাত করিস্ না। আমাকে নিয়ে তুই থাক্।

কমলমণি বলিল,—সুলোচনাকে মরিতে দেব ? তা কখনই হবে না।

কুলকামিনী সুলোচনাকে বলিলেন, প্রাণের বোন্, তুমি যাও, আমি মায়ের স্বার্থের দাসী হয়ে থাকি। দুইজন কেন মরিব ? পাপ হবে,—বিনোদ বাবু হাসিবেন,—তিনি যে তোমার জন্য পাগল হইবেন। মরার বাসনা ছেড়ে দেও। বিধাতা আমাকে পাপের জন্য সৃষ্টি করেছেন, না হলে তোমাকে এত ভালবাস্‌তে পারিতাম না। তোমার জন্য আমি পাপে ডুবিব, মায়ের স্বার্থ পূর্ণ করিব, বোন্, তুমি যাও, আমি থাকি।

কুলকামিনীর দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, বলিলেন,—তোকে কোথায় যাইতে বলিতেছি ? হায়, বোন্ হয়ে তোকে বিদায় দিতেছি, লোকে কি বল্‌বে ? জননীর গৃহে মেয়ে সুখী হলো না, এ কথা শুনে লোকে কি বল্‌বে ? কাহাকেও কিছু বলিস্‌নে,—এই ঘরে জন্মেছিলি, এ কথা বলিস নে, মনের কথা মনেই রাখিস্। তুই যা, সেখানে থাকিস্ সেই ভাল ; এই সর্ব্বনেশে স্থানের চেয়ে সব স্থান ভাল। হায়, বিনোদ বাবু তোর জন্য অস্থির হবেন্—হয় ত এতক্ষণ অস্থির হয়েছেন।

দিদির কথা শুনে সুলোচনার হৃদয়ের আগুন আরো জ্বলিয়া উঠিল, বলিলেন, দিদি, তোকে ছেড়ে কোথায় যাব ? তোকে ছাড়িলে পৃথিবীতে আমার দাঁড়াবার আর স্থান থাকে না,—তুই আমার বল, তুই আমার ভরসা, তোর মুখের দিকে চেয়ে আজও বেঁচে আছি, তোর অদর্শন আমি সইতে পার্‌ব না। না—তা কখনই হবে না। আমার জন্য তুই এই সর্ব্বনাশীর স্বার্থের পথে হাটিবি, তা আমি সহ্য কর্‌তে পারিব না। তোকে ডুবায়ে আমি সুখে থাক্‌তে পারব না, দিদি, মায়ের হাত ছেড়ে দে, আমি এখনই মরি।

কুলকামিনী উপায়ান্তর না দেখিয়া সুলোচনাকে বলিলেন,একটু স্থির হ। তারপর জননীকে বলিলেন,—মা, ক্ষণকাল তুমি ছেড়ে দিয়া দাঁড়াও, আমি দুটো কথা বলি। আমরা মরিব না।

কমলমণি কি ভাবিয়া সুলোচনাকে ছাড়িয়া দিয়া বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

কুলকামিনী সুলোচনাকে বলিলেন,—মা কি বলে ?

সুলোচনা।—বিবাহের কথা বলে।

কুলকামিনী বলিলেন,—আমি আর উপায় দেখি না, তুমি বিবাহে সম্মত হও, তারপর ভাল মন্দ দেখিয়া একটা উপায় করা যাইবে।

সুলোচনা বলিলেন, প্রাণান্তেও প্রতারণা করিতে পারিব না, ও প্রস্তাবে কখনই সম্মত হইতে পারিব না। দিদি, তোকে এ বুদ্ধি কে শিখালে ? ভগবতীর নিকট অপরাধী হব ?

কুলকামিনী।—তুমি কি চিরকাল কাঁদিবে ?

সুলোচনা।—ভগবতী যদি কাঁদিবার জন্যই সৃষ্টি করে থাকেন, চিরকাল কাঁদিব, তুমি আমি সহস্র চেষ্টা করিলেও কিছু করিতে পারিব না। কান্নায় কি আমার অসুখ ?—পৃথিবীতে যদি কিছু সুখ থাকে, তবে তা আমার চক্ষের জলে আছে। কাঁদিতে পারিতেছি বলিয়া আজও বেঁচে আছি।—এই জলের দ্বার যখন বন্ধ হইবে, তখন বেঁচে থাকিয়া মরার মতন হব। দুই বৎসর কাঁদিয়া কত সুখ পেয়েছি, আজীবন কাঁদিলে কত সুখ পাইব, কে জানে ?

কুলকামিনী—কাঁদিবার পথ কোথায় ? মরিলে ত আর কাঁদিতে পারিবে না।

সুলোচনা।—দিদি, তবে আর ত উপায় দেখি না।

কুলকামিনী।—এক উপায় আছে—প্রতারণা।

সুলোচনা।—প্রতারণা করিতে কখনই পারিব না।

কুলকামিনী।—দ্বিতীয় উপায়,তুমি যাও, আমি থাকি, আমাকে পাইলে মা তোমার আশা ছেড়ে দিবে। আমি কিছু দিন থাকিয়া পরে পালাইব।

সুলোচনা।—তুমি মায়ের স্বার্থের পথে যাইয়া পাপে ডুবিবে ?

কুলকামিনী।—ডুবিব না। মায়ের আর সকল কথা শুনিব, ঐ একটী কথা কেবল শুনিব না।

সুলোচনা।—মা ছাড়িবে কেন? সম্মত হইলে তোমাকে সব করিতে হইবে।

কুলকামিনী।—আজই মাকে বলিয়া রাখিব, একটী অনুরোধ ভিন্ন তোমার আর সকল কথা শুনিব।

সুলোচনা।—মা তাতে সম্মত হবে কেন?

কুলকামিনী।—এমন ভাবে বলিব, মা কিছুই বুঝিতে পারিবে না।

সুলোচনা।—তবে কি প্রতারণা করিবে?

কুলকামিনী।—করিব। আর উপায় দেখি না, এই পথই ধরিব। আমার মন বলে, এতে পাপ নাই।

সুলোচনা।—আমি বলি, এতেও পাপ আছে। এ পথও অবলম্বন করা উচিত নহে।

কুলকামিনী।—তবে তুমি কি বল?

সুলোচনা।—এস উভয়ে মরি।

কুলকামিনী।—এতেও ত পাপ। আত্মহত্যা মহা পাপ।

সুলোচনা।—তা বুঝি, কিন্তু জীবিত থেকে পাপ করার চেয়ে মৃত্যু সহস্র গুণে ভাল।

কুলকামিনী।—তোমার এ কথা কখনই সত্য হইতে পারে না।

সুলোচনা।—তবে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। এই কথা শেষ হইতে না হইতেই পুন কমলমণি গৃহে প্রবেশ করিল। তখনও রজনী প্রভাত হয় নাই। কুলকামিনী সুলোচনাকে ঘেরিয়া বসিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সুখ-কণিকা

এত ঘটনা ঘটিল, তবুও রজনী প্রভাত হইল না;—সুলোচনা এত সময় দুশ্চিন্তার বোঝা মস্তকে বহন করিলেন, তবুও দুঃখের নিশি বিপদের চাকুরি পরিত্যাগ করিল না। ঘুষ দিয়া, প্রলোভন দেখাইয়া পৃথিবীর মনুষ্যকে ভুলান যায় সত্য, কিন্তু আজ প্রকৃতির প্রতিনিধি, রজনী, কমলমণির চক্রান্তে ভুলিল কেন? কুলকামিনী ভাবিতেছেন,—“নিশি প্রভাত হয় না কেন?

পাখী থাকিয়া থাকিয়া ডাকে,—ডাকে, আবার নীরব হয়। কেন নীরব হয়? বোধ করি তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে—আজ আর নিশি পোহাইবে না! হায়, তবে সুলোচনাকে কি প্রকারে রাখিব? মা, আজ ঘুষ দিয়া নিশির সহিত বোধ করি কোন বন্দোবস্ত করেছে! অর্থের চক্রান্ত, কে জানে আজ কি হবে! পুলিস মায়ের বশ— উকীল মোক্তার সকলই মায়ের বশ! আমাদিগকে পাইবার জন্য পৃথিবী যেন ক্ষেপে উঠেছে। মানুষ কি পশু?" কমলমণি সুলোচনাদের গৃহে প্রবেশ করিয়াই গৃহান্তরে গোলমাল শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া তথায় গেল। সুলোচনা সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছেন,—হঠাৎ তাহার চক্ষে একটু নিদ্রা বসিল। এই অবসরে কুলকামিনী এই প্রকার কত কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিলেন,—"যত লোক আমাদের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছে, সকলেই যে নিঃস্বার্থ ভাবে খাটিতেছে, তা ত বোধ হয় না;—কারণ তাহারা আজ কোথায়? বিনোদ বাবু একমাত্র নিঃস্বার্থ ভাবে খাটিতেছেন;—সেই বিনোদ বাবুর বাড়ী হইতে আসিয়া ভাল করি নাই! ভাল করি নাই—তবে আবার ফিরিয়া যাই না কেন? রজনী প্রভাত হইলে আমরা সেখানে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিব কি? চেষ্টা করিলেও ফল পাইব না—মায়ের হাত ছাড়াইতে পারিব না। পারিব না—চেষ্টাও করিব না। বিনোদ বাবুদের ঘরে আবার আগুন জ্বালিবার জন্য ফিরিব? বিনোদ বাবুদের ঘরে আগুন জ্বালিতে সুলোচনা কখনই আর যাইবে না—সে মরিবে, তবুও যাইবে না। তবে কি করিব! মায়ের হাত হইতে সুলোচনাকে কি প্রকারে রক্ষা করিব? সুলোচনা বলে, তাহার কাঁদিয়াই সুখ, কিন্তু আমি ত তার চক্ষে জল দেখিতে পারি না। সুলোচনার কষ্ট দেখিলে এ প্রাণ অস্থির হয়। কি দারুণ জ্বালা! সুলোচনা প্রতারণার পথে হাটিবে না,—বিনোদ বাবুর উপদেশ যাহার কর্ণে একবার প্রবেশ করিয়াছে, সে প্রতারণা করিতে পারে না। আমি কলঙ্কিত পথে যাইব, তাহাও সুলোচনার সয় না, তবে কি করি? আর ত উপায় দেখি না! সুলোচনা নিদ্রায় অচেতন হয়েছে, হায়, বোন আজ সমস্ত রাত্রের মধ্যে আর ঘুমায় নাই; কি কষ্টেই আজ রাত্রি শেষ করিল! রাত্রি শেষ হয় নাই—হইবে যে, তাহাই বা কে জানে? হায়, সুলোচনার কি মনোহর রূপ, ইচ্ছা হয় হৃদয়ের ভিতরে পুরে রাখি। এই রূপ দেখে লোকগুলি যেন পাগল হয়েছে! হবে না কেন? আমিই ত পাগল হয়েছি। সুলোচনার জন্য কি না করিতে পারি?—

পৃথিবীর সকল পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু সুরোকে ছাড়িতে পারি না! কি মোহ! কি মায়া! আমি মজিয়াছি। বিধাতা আমাদিগকে মজাইয়াই মারিয়াছেন! বিচ্ছিন্ন হইতে পারি না, তাই আমরা রক্ষা পাইলাম না, নচেৎ দুই জনে দুই ভিন্ন পথে গেলে কেহই আমাদিগকে পাইত না। সুলোচনা আমাকে ছাড়িতে চায় না,আমিও ছাড়িতে পারি না। আর সব পারি,এই একটী কাজ পারি না—সুলোচনাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। আমার একমাত্র সুখ—সুলোচনা। আমার প্রাণ উহার প্রাণের ভিতরে! বোনের কি অপরূপ!" কুলকামিনী এই বলিয়া সুলোচনার মুখচুম্বন করিলেন। সুলোচনা কুলকামিনীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া কি সুখে নিদ্রা যাইতেছেন! এমন আরামস্থান আর নাই। কুলকামিনীই যেন সুলোচনার মাতা পিতা, ভাই ভগ্নী, সকলই। সেই মাতা পিতা, ভাই ভগ্নী আজ সুলোচনার সুধা-বিনিন্দিত মুখচুম্বন করিল। সুলোচনা সে ক্ষণিক সুখ যেন অনুভব করিল—অজ্ঞাতে, স্বপ্নে দিদির রূপ দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি কুলকামিনী দেখিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত যে মুখে হাসি ফোটে নাই, কুলকামিনী সেই মুখে হাসি দেখিয়া প্রফুল্ল হইলেন, হাসিলেন,—কুলকামিনীর হৃদ্‌-দর্পণে ঐ প্রফুল্লানন প্রতিবিম্বিত হইল। কি সুখের চিত্র! সুখের চিত্র অধিকক্ষণ থাকে না,—অধিকক্ষণ রহিল না। রজনী প্রভাত হইয়া আসিল, পাখী কলরব করিয়া উঠিল, এবার আর থামিল না। এই সময়ে বাড়ীর ভিতরে মহা কলরব উঠিল। ধর, মার, কাট, এই শব্দ প্রাঙ্গণ ভেদ করিয়া আকাশে উঠিল। সুলোচনা শব্দ শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিলেন, কুলকামিনীও অস্থির হইলেন। গৃহান্তরে শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। কমলমণির চিৎকারে সুলোচনা ও কুলকামিনীর প্রাণকে অস্থির করিয়া তুলিল। তাঁহারা উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া সেই দিকে চলিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আলোক-পথে।

সুলোচনা ও কুলকামিনী যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে সুলোচনা ও কুলকামিনী উভয়ের হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল। দেখিলেন—কমলমণিকে ধরিয়া কয়েকজন পাষণ্ড প্রহার করিতেছে। সুলোচনা ও কুলকামিনী

জননীর ক্রন্দনে এত অধীর হইলেন যে, উভয়ে উভয়ের বর্ত্তমান বিপদের কথা ভুলিয়া গিয়া, জননীর স্বরে স্বর মিলাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কেবল কাঁদিয়াই নিরস্ত হইলেন না, যাহারা কমলমণিকে প্রহার করিতেছিল, তাহাদিগের পা ধরিয়া সুলোচনা বলিতে লাগিলেন;—তোমাদের পায়ে পড়ি, মাকে ছেড়ে দেও, আর মারিও না ; মায়ের কষ্ট দেখ্‌লে আমার প্রাণ অস্থির হয়।

একজন বলিল,—"তোদের জন্যই ত এই প্রহার। টাকা দিয়াছি তবুও মন পাই নাই, মন পাই নাই—তোদিগকে পাই নাই। আমাদের সকল আয়োজন নষ্ট হইবার উপক্রম হইল। তোদের সকল চক্রান্ত বুঝিয়াছি।" এই বলিয়া আবার প্রহার করিতে লাগিল।

সুলোচনা এই সকল কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, কাহাকে টাকা দিয়াছ ?

লোক উত্তর করিল—তোর মাকে দিয়াছি।

সুলোচনা।—কেন টাকা দিয়াছ ?

লোক।—তোকে পাইবার জন্য।

সুলোচনা এতক্ষণ পরে সকল কথা উত্তম রূপে বুঝিলেন; বলিলেন, —তবে মাকে মারিতেছ কেন ?

লোক।—সমস্ত রাত্রি গেল, তবুও তোকে আমাদের হাতে দিল না।

সুলোচনা বুঝিলেন, আমাদের জন্যই মাতার এই দুর্দ্দশা উপস্থিত। আবার বলিলেন, মা ত আমাকে সঁপে দিতে বিশেষ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আমিই মাকে বাধা দিয়াছি ; আমিই দোষী, মাকে ছেড়ে দিয়া আমাকে মার না কেন ?

লোক।—মারিব। সে জন্য চিন্তা নাই, তোকেও মারিব। একবার যখন তোকে হাতে পাইয়াছিলাম, তখনই মারিতাম, কিন্তু এই সর্ব্বনাশী মারিবার পূর্ব্বেই ঘর হইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া দিল, নচেৎ তখনই মারিতাম।

সুলোচনা।—প্রথমেই আমাকে মারিতে আরম্ভ কর নাই কেন ?

লোক।—প্রথম মনে ভেবেছিলাম, অনায়াসেই তোর মন পাইব, কিন্তু তাহা হইল না।

সুলোচনা।—যখন তাহা হইল না, তখন মারিলে না কেন ?

লোক।—তখন বুঝিলাম, তোর মন অটল, প্রহারে কিছুই হইবে না;—কিন্তু প্রলোভনে তোকে ভুলাইতে পারিব, তখনও আশা ছিল।

সুলোচনা।—প্রলোভনে কি লোক ভোলে ?

লোক।—কেবল লোক কেন ?—স্বর্গের দেবতারাও ভোলেন।

সুলোচনা।—তবে প্রলোভনের পথ ছাড়িয়া আবার মারিবে কেন ?

লোক।—যদি তাতেও আশা পূর্ণ না হয়, এই পথই ধরিব। মারিয়া তোদের জন্মের সাধ একেবারে ঘুচাইয়া দিব।

সুলোচনার চিত্ত প্রফুল্ল হইল, বলিলেন, তবে মাকে ছাড়, আমাকে ধর, প্রলোভন দেখাও—তারপর মারিয়া ফেল। আমি মরিয়া স্বর্গে যাই। মায়ের কান্না আমাকে আর যেন শুনিতে না হয়।

সুলোচনার মুখে এইকথা শুনিয়াই পাষণ্ডেরা কমলমণিকে ছাড়িয়া সুলোচনাকে ধরিল। সুলোচনার সরল কথা গুলি কুলকামিনীর প্রাণে বাজিতেছিল। কুলকামিনী বুঝিলেন, সুলোচনা মরিবার উৎকৃষ্ট পথ পাইয়াছে। বুঝিলেন,—সে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, মরিবে, থাকিবে না। বুঝিলেন,—সুলোচনা প্রলোভনে কখনই ভুলিবে না। যখন ভুলিবে না, তখনই প্রহার আরম্ভ হইবে, সেই প্রহারেই মৃত্যু। কুলকামিনীর অন্তর কাঁপিয়া উঠিল, নির্ভয়ে গম্ভীর স্বরে সুলোচনাকে বলিলেন,—"সুলোচনা ?"

সে স্বর শুনিয়া সুলোচনা শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন—কি দিদি ?

কুলকামিনী বলিলেন, এই কি পথ ?

সুলোচনা।—এই পথ! এ পথে চলিলে মায়ের কষ্টও দেখিব না, তোমার চক্ষেও জল দেখিব না।

কুলকামিনী।—আমার মমতা ছিড়িবে ?

সুলোচনা উর্দ্ধে দৃষ্টি করিলেন, দুই চক্ষুদিয়া কয়েক বিন্দু জল মাটীতে পড়িল। তারপর বলিলেন, এবার মমতা ছিড়িব, আবার ঐ স্বর্গে মিলিব! স্বপ্নে দেখেছি—মৃত্যুই আমার জীবন-পথ। মা আমাকে ডেকেছেন, আমি আর থাকিব না।

কুলকামিনী আরো বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, কখন স্বপ্ন দেখেছ ? স্বপ্নে কি দেখেছ ?

সুলোচনা ধীরে ধীরে বলিলেন, যখন তোমার কোলে শুয়েছিলাম, তখনই স্বপ্ন দেখেছি। দেখিলাম,—"আমি যেন অকূল সাগরে ভাসিতেছি—

চতুর্দ্দিক আঁধার—আঁধার—কূল কিনারা নাই”। সেই সময়ে সেই অকূল আঁধার ভেদ করিয়া বিনোদ বাবু যেন এক খানি ভেলায় চড়িয়া আমার নিকটে আসিলেন। আসিয়া বলিলেন—“সুলোচনা?” হঠাৎ সে অমৃত স্বর শুনিয়া আমি অমনি চাহিয়া দেখিলাম। দিদি, কি বলিব, বলিতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়। বিনোদবাবুর কথা শুনিয়া সেই ভেলা ধরিতে প্রস্তুত হইয়া হাত বাড়াইলাম। কিন্তু ভেলা পাইলাম না, বিনোদ বাবুকেও পাইলাম না। অদৃশ্য-পথ হইতে আবার বিনোদ বাবুর স্বর শুনিলাম—“সুলোচনা, ভেলা ধর, ভেলা ধর, চাহিয়া দেখ।” চাহিয়া দেখিলাম—এক আশ্চর্য্য দৃশ্য— চতুর্দ্দিক আলোকময়। সে আলোকের সীমা নাই—অনন্ত বিস্তৃত—মধুর—মধুর, কিন্তু বর্ণনা করিতে পারি না, কি অপরূপ দেখিলাম। দেখিলাম, সেই আলোকের মধ্যে হইতে যেন এক দয়ার হস্ত প্রসারিত হইয়া আমাকে ধরিল। আমি ধরা পড়িলাম। বিনোদ বাবুর স্বর তখনও কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল, আমিও সে হস্ত ধরিলাম।” এই পর্য্যন্ত দেখিতে দেখিতেই কোলাহল কাণে গেল, আমি চকিত হইয়া উঠিলাম। দিদি, আমার আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই,—ঐ হাত ধরিয়া ঐ আলোকের ভিতর যাইতে বড়ই সাধ হয়েছে। তোমার সহিত কথা বলিতে বলিতে আবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সেই হাত যেন পুন আমাকে ডাকিতেছে। ঐ আলোক ধরিয়া ঐ হস্তের অঙ্গুলি নির্দ্দেশে চলিব, মায়া মোহ আর বুঝি না, সকল ছিন্ন করিব।

কুলকামিনী সকল কথা শুনিয়া অবাক হইলেন। কমলমণি ও অন্যান্য সকলেই অবাক হইল। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া কুলকামিনী আবার বলিলেন,—“তোমাকে ছেড়ে আমি থাক্‌ব না, আমিও যাইব।”

সুলোচনা বলিলেন— পূর্ব্বে যখন মরিবার কথা বলেছিলাম, তখন তুমি কত ভয়ের কথা বলেছিলে। এখন সত্যই কি মরিবে? পৃথিবীর সব সুখের আশা ছিড়িতে পারিবে?

কুলকামিনী একটু ভাবিয়া বলিলেন—সব ছিড়িতে পারিব।

সুলোচনা।—আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে?

কুলকামিনী।—তা পারিব না বলিয়াই ত মরিয়া তোমার সঙ্গে যাইব।

সুলোচনা।—সে ইচ্ছা করিও না, তাহা পূর্ণ হইবে না। সেই আলোকের মধ্যে আর কিছুই নাই, আর কিছুই দেখিলাম না। সেই হস্ত আর আমি

—একাকিনী। বুঝিলাম, অকূল ভব-সাগরে আমিও একাকিনী, তুমিও একাকিনী, সকলেই একাকী। কাহারও সহিত কাহারও দেখা সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই। এক জনকেও পাইবে না। তবে মরিবে কি ?

কুলকামিনী বলিলেন, মরা বাঁচা বুঝি না, তোমাকে ছাড়িতে পারিব না।

সুলোচনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—দিদি, এত দিনে আমাকে তুমি হারাইলে। বাঁচ আর মর, আমাকে আর তোমরা পাইবে না। আমি আজ হইতে পৃথিবীতে একাকিনী,—স্বর্গেও একাকিনী। মায়ামোহতে আর আমাকে পাইবে না। আমি এবার সংসারে মরিব।

সুলোচনার কথা শেষ হইল। তখন রজনী প্রভাত হইয়াছে,—সূর্য্যের আলোকে পৃথিবী জাগিয়া উঠিয়াছে, বায়ু কাঁপিতে কাঁপিতে নাতিমন্দ গতিতে বহিতেছে, এমন সময়ে সেই অপরিচিত লোকেরা সুলোচনার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। কুলকামিনী ও কমলমণি অবাক হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বীভৎস শক্তিসাধন।

কোথায় লইয়া চলিল, কেন লইয়া চলিল, তাহা কমলমণি সকলই জানিত—পূর্ব্বেই সকল ঠিক ছিল। কুলকামিনী বা সুলোচনা তাহা কিছুই জানেন না। সুলোচনার মায়ায় কুলকামিনী অপরিচিত পথে চলিতে লাগিলেন। সুলোচনার চক্ষুতে এখনও সেই আলোক জ্বলিতেছে, এখনও সেই স্বর কাণে বাজিতেছে, সংসার যেন নাই নাই বোধ হইতেছে; তিনি অবিচলিত ভাবে চলিতেছেন। লোকেরা যাহাকে পাইবার জন্য কমলমণিকে প্রহার করিতেছিল, তাহা মিলিয়াছে, তাহাদের আহ্লাদের সীমা নাই, তাহারা মনে ভাবিতেছে, আজ সুলোচনা ফাঁদে পড়িয়াছে—আর ভয় নাই। একে একে দুই একটীগ্রাম অতিক্রান্ত হইল। গ্রামের লোকেরা উৎসুখ চিত্তে ইহাদিগকে চাহিয়া দেখিল, কেহ ঈষৎ হাসিয়া, কেহ বা দুঃখে ভ্রূকুঞ্চিত করিল। কমলমণি একজনকে বলিল,—‘ গোরাচাঁদ, এ পথে না যেয়ে, চল ঐ দক্ষিণপাড়া বা হাতে রেখে যাই, ওদিকে লোকজন নেই।”

গোরাচাঁদ বলিল, তাই চল।

দক্ষিণ পাড়া বাদিকে রাখিয়াই লোকেরা চলিল। কুলকামিনী এতক্ষণ মনে ভাবিতেছিলেন, লোকেরা কোথা যাইতেছে,-মা তাহা জানেন না; তবে টাকা নিয়েছেন বলিয়া, এবং সুলোচনার মমতা ছাড়িতে পারিতেছেন না বলিয়া, যাইতেছেন। এতক্ষণ পরে সে ভ্রম দূর হইল, বুঝিলেন, মা সকলি জানেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, মা আমাদিগকে লইয়া কোথায় যাইতেছ ?

কমলমণি।—কোথায় যাইতেছি ?—তা সকলি জানিবে। আজ শক্তির পূজা হইবে।

কুলকামিনী।—শক্তি কি মা ?

কমলমণি।—সকলি বুঝিতে পারিবে।

লোকেরা পূর্ব্বে যে পথে যাইতেছিল, সে পথে তবুও লোকজনের সহিত সাক্ষাৎ হইতেছিল, কুলকামিনীর আশা ছিল, বিনোদ বাবুর সহিত যদি সাক্ষাৎ হয়, তবেই বাসনা পূর্ণ হইবে,—উদ্ধারের উপায় হইবে। কিন্তু মাতার আদেশে গোরাচাঁদ এমন জটিল পথে লইয়া চলিল, যে পথে লোকজনের নামগন্ধও নাই। ক্রমেই পথ দুর্গম হইয়া আসিল, সে পথে লোকের পদচিহ্ন অতি অল্পই পড়িয়াছে;—ক্রমে সে পথ অরণ্যের দিকে চলিল। কুলকামিনীর মনে,থাকিয়া থাকিয়া,কত কি ভাবনা,কত কি আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছিল। এক একবার ইচ্ছা হয়,সুলোচনাকে সকল বিপদের কথা খুলিয়া বলেন,আবার মনে হয়, সুলোচনা ত বিপদই চায়। বিষম সমস্যা, কি করিবেন, কিছুই ঠিক পাইতেছেন না;—মা কথা শুনিবে না, কারণ মায়ের স্বার্থ আছে, সুলোচনা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, সে মরিবে তবুও ফিরিবে না; কাহাকে কি বলিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। লোকেরা ক্রমেই ঘনীভূত অরণ্যের মধ্যে চলিল,—গাছের পাতায় পাতায়, ডালে ডালে ঘেসা-ঘেসিতে সূর্য্যের রশ্মি প্রবেশ করিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে পারিতেছে না,—ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে কেবল স্থানে স্থানে একটু একটু ক্ষীণ আলোক দেখা যাইতেছে,—পত্রের মধ্য দিয়া একটু একটু আলোক আসিতেছে। জঙ্গলের পরিসর কত, কুলকামিনী তাহা জানেন না, মনে হইতেছে—এইবার অরণ্য শেষ হইবে। আশার সহিত চলিতে লাগিলেন, কিন্তু অরণ্য আর শেষ হয় না। মন একবার নৈরাশ হয়, আবার পুন আশা আসিয়া হৃদয়ে উপস্থিত হয়,—আবার নবোৎসাহে চলেন, কিন্তু তবুও পথ শেষ হয় না। তবে, বুঝি অরণ্য শেষ

হইবে না ;—একবার এই প্রকার মনে হয়, কিন্তু আশার উত্তেজনায় চিন্তা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না ;—আবার কুলকামিনী মনে করেন, এইবারই জঙ্গল শেষ হইবে,—নিশ্চয় হইবে;—ঐ যে আলো দেখা যাইতেছে। কুলকামিনীর আশা পূর্ণ হইল, কিয়ৎক্ষণ পরে সে আলোকময় স্থান নিকটবর্ত্তী হইল। কিন্তু সে স্থানের চতুর্দ্দিকেই তিমিরাবৃত অরণ্য ;—আনন্দে যেন নিরানন্দ মিশিয়া রহিয়াছে। সেই স্থান দেখিয়া কুলকামিনী তবুও একটু যেন শান্তি পাইলেন—সেখানে আরো অনেক লোক ছিল। চতুর্দ্দিক অরণ্য, মধ্যে একটী কালীর মন্দির, সম্মুখে একটী প্রাচীন প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকা বহু দিনের দামাবৃত,—দুই এক স্থান ভিন্ন তাহার জল দেখা যায় না। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, অনন্ত নীলিমায় বসিয়া একাকী সূর্য্য তীক্ষ্ণ কটাক্ষ-পাত করিতেছেন,—অরণ্যের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া আপন শরীরের অগ্নিকণা সকল ঝাড়িয়া ফেলিতেছেন। অনেক গুলি লোক সেখানে নীরবে বসিয়া রহিয়াছে, যেন কি ভাবিতেছে,—যেন কি নিরাশার কালিমা হৃদয়কে ঘেরিয়াছে! দূর হইতে কুলকামিনী দেখিলেন,—তাহাদি-গকে দেখিয়া ঐ লোকেরা প্রফুল্ল হইল—মলিন বসন, মলিনভূষণ হৃদয় হইতে খুলিয়া রাখিল,—প্রস্ফুটিত ফুল্ল কমলবৎ আনন্দোচ্ছ্বাস হৃদয়ে তুলিয়া দিল। তাহারা মলিন ছিল, প্রফুল্ল হইল। তাহারা বসিয়াছিল, দাঁড়াইল—পরে অভ্যর্থনার জন্য আসিল। অভ্যর্থনা করিল। গোরাচাঁদের দলে সেই দল মিশিল! মিশিয়া কত হাসিল ;—হাসিল—মাতিল—নাচিল—গাইল। উল্লাস-সঙ্গীত গাইতে গাইতে, নাচিতে নাচিতে কালীর মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী হইল। গোরাচাঁদ বিকটস্বরে—মন্দিরের সম্মুখে যাইয়া—মা মা মা, বলিয়া তিনবার ডাকিল। সেই ডাকে করালবদনী যেন প্রসন্ন হইলেন—পুরোহিত মন্দির হইতে বিল্বপত্র এবং সুরার পাত্র হাতে করিয়া আসিয়া বলিলেন—গোরাচাঁদ, মা প্রসন্ন হইয়াছেন, এই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। গোরাচাঁদ হাত পাতিয়া সানন্দে বিল্বপত্র এবং সুরার পাত্র গ্রহণ করিলেন।

পুরোহিত বলিলেন,—গোরাচাঁদ, কলিতে তোমার ন্যায় ভক্ত আর দেখি নাই। সংসারের নিন্দা ঘৃণাকে তুচ্ছ করিয়া, যশমানকে ডুবাইয়া, তোমার মত আজ পর্য্যন্ত কেহই মায়ের চরণ পূজা করিতে পারে নাই। তুমিই ধন্য, কারণ তুমি শিক্ষিত হইয়াও মায়ের সম্মান, দেশের গৌরব রক্ষা করি-তেছ। কলিকালে ইংরাজি শিক্ষায় দেশের প্রেমভক্তি সকল গেল। আর

দেশে ধর্ম্ম থাকে না। দেশের ওদিকে চাহিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। শিক্ষা পাইয়া লোকেরা আর কিছুই মানিতে চায় না, মাতার সম্বন্ধ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়। মা করালবদনী কি অপরূপ সাজে আজ সাজিয়াছেন, গোরাচাঁদ, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রকৃত ভক্ত, একবার চাহিয়া দেখ। রণরঙ্গিনী মাতার বেশ একবার দেখ। দেশের নাস্তিকতা ডুবাও, জীবন্ত ধর্ম্ম সাধনায় প্রবৃত্ত হও,—চক্রে উপবিষ্ট হইয়া আজ একবার মাত।

গোরাচাঁদ বিকট স্বরে সজল নয়নে আবার ডাকিলেন—"মা—মা—মা, প্রসন্নময়ি, অভয় দান কর, সংসারের যশ, মান, নিন্দাকে ডুবাইয়া আজ একবার তোমার সম্মুখে মাতিব। বিবসনা নিশম্ভুঘাতিনী মা—আজ সদয় হও।" এই বলিয়া গোরাচাঁদ মন্ত্রপূত সুরার পাত্র আপনি উদরসাৎ করিলেন, এবং আর আর সকলকে এক এক পাত্র দিলেন। কুলকামিনী দেখিয়া বিস্মিত, চমকিত হইলেন। সুলোচনা ঊর্দ্ধ-নয়না হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এ সকল তাঁহার চিন্তার বিষয় নহে। কুলকামিনী দেখিলেন, ক্রমে কমলমণি সুরার পাত্র হাতে করিল। কুলকামিনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল—বলিলেন, মা, করিস্ কি? কমলমণি কথা বলিল না, পাত্রস্থ সুরা উদরসাৎ করিল। কমলমণির পরে সকলেই এক এক পাত্র উদরসাৎ করিল। এক পাত্রের পরে ক্রমে দুই তিন পাত্র উঠিল। কমলমণি তখন উন্মত্ত হইয়াছে। কুলকামিনীকেও মন্ত্রপূত সুরার পাত্র দিল। কুলকামিনী পাত্র হাতে লইয়াই মৃত্তিকায় তাহা ফেলিয়া দিয়া পদমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, সর্ব্বনাশি, তোর সাধ কখনই পূর্ণ হবে না, আজ দেখিব—মা হারে কি কন্যা হারে। কুলকামিনীর কথা শেষ হইতে না হইতে চতুর্দ্দিকের লোকেরা মাতিয়া উঠিল। কি মন্ত্রপূত সুরার অবমাননা?—শক্তি পূজায় বাধা? এই কথা বলিয়া পুরোহিত জবা ফুলের মত রক্তিম চক্ষে গোরাচাঁদের প্রতি চাহিয়া আদেশ করিলেন—সকলে উলঙ্গ হও—বলপূর্ব্বক ইহাদিগকে দীক্ষিত কর।

পুরোহিতের আদেশ শুনিবামাত্র গোরাচাঁদ সকলকে মাতিতে আদেশ করিল, এবং আপনি নিজ হাতে পাত্র লইয়া সুলোচনার সম্মুখীন হইল। গোরাচাঁদ কিছু না বলিয়া সুলোচনার হাত ধরিল এবং মুখের নিকটে পাত্র ধরিয়া বলিল,—পান করে জন্ম সার্থক কর্!

স্নেহের অবতার সুলোচনা সুস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার কেবল চাহিয়া দেখিলেন।

গোরাচাঁদ পুন বলিল, মায়ের প্রসাদ গ্রহণ কর।

সুলোচনা।—কই মা? কাহার প্রসাদ?

গোরাচাঁদ মন্দিরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ঐ দেখ, মা জীবন্ত ভাবে দণ্ডায়মান। প্রসাদ ধর।

সুলোচনা।—ও ত মা নহে, মায়ের ছায়া মাত্র। আমি পাত্র ধরিব না। আকাশ হইতে মা পাত্র ধরিতে নিষেধ করিতেছেন।

এই কথা শুনিয়া গোরাচাঁদ বলপূর্ব্বক সুলোচনার মুখে সেই মন্ত্রপূত সুরা ঢালিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহা সুলোচনার গলাধঃকরণ হইল না। মা আমায় ধর ধর, বলিতে বলিতে ভয়ে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

কুলকামিনী ভগ্নীর মূর্চ্ছার অবস্থা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া বলিলেন, পাষণ্ড, কি করিলি, আমার সম্মুখে সুলোচনাকে মারিলি? এই বলিয়া সুলোচনার হাত হইতে অস্ত্র লইয়া গোরাচাঁদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু সে অস্ত্র গোরাচাঁদের শরীরে লাগিল না। গোরাচাঁদ এবং অন্যান্য সকলে বলপূর্ব্বক কুলকামিনীকে ধরিল। কুলকামিনী ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইলেন। কমলমণি এই অবস্থায় কুলকামিনীর মুখে মন্ত্রপূত সুরা ঢালিয়া দিল। হতভাগিনী এই প্রকারে সুরায় দীক্ষিত হইলেন, অল্প সময়ের মধ্যে কমলমণির ন্যায় উন্মত্ত হইলেন। সুলোচনাকে চেতন করিতে পাষণ্ডেরা অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই চেতনা হইল না। শক্তি পূজা হইল—সকলে মাতিল—নাচিল, গাইল, পরে সকলেই অচেতন হইয়া পড়িল। ক্রমে সকল নীরব হইল।

মূর্চ্ছার অবস্থায় সুলোচনা আবার স্বপ্ন দেখিলেন—"বিনোদ বাবু বলিতেছেন,—ভয় কি সুলোচনা, চাহিয়া দেখ, আনন্দময়ী প্রেমরূপিনী বিশ্বেশ্বরী স্বয়ং তোমাকে উদ্ধার করিতেছেন, ভীত হইও না। মরিবে, মনে ভাবিয়াছ? তা হবে না; ধীরে ধীরে মাতার ইঙ্গিত মত ঐ পথে চল।—দস্যুর ভয়ে কাতর হইয়াছ?—বিপদে মলিন হইয়াছ? প্রেমময়ীর প্রসন্ন মুখের পানে তাকাও।" এই কথা শেষ হইতে না হইতে বিনোদ বাবু অদৃশ্য হইলেন, চোক মেলিয়া সুলোচনা দেখিলেন, সকলেই অচেতন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। জননীকে দেখিয়া সুলোচনার বিস্ময় হইল না, কিন্তু দিদিকে ওরূপ বেশে ধরায় পতিত দেখিয়া বড়ই কষ্ট হইতে

লাগিল। আকাশের পানে চাহিয়া বলিলেন, মা, তুমি এ কি চিত্র দেখাইলে? দিদিকেও বিচ্ছিন্ন করিলে—পাপে ডুবাইলে? সুলোচনার নয়ন মুদিত হইয়া আসিল; সহসা অন্তরের নিগূঢ়তম স্থান হইতে কে যেন আদেশ করিল—"এখনও ভাবিতেছ?—ঐ পথে চল, মা ডাকিতেছেন।" সুলোচনা আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে সেই আদেশ ধরিয়া সুলোচনা নির্ভয়ে পদনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন,—নীরবে সুলোচনা চলিলেন। বিনোদ বাবুর স্বর তখনও কাণে বাজিতেছিল, সুলোচনা নির্ভয়ে গভীর অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আশ্রয়হীনা।

পৃথিবীতে সুলোচনার দুই আশ্রয় ছিল,—বিনোদবাবু ও কুলকামিনী; একে একে দুই আশ্রয়ই ছিন্ন হইল। বিধাতার লীলা বিধাতা খেলিলেন। মানুষ ভাবিতে জানে, ভাবিল, কাঁদিল, কিন্তু তাহাতে কোন উপায় হইল না,—বিনোদবাবু কিছু করিতে পারিলেন না—কুলকামিনীও পারিলেন না, অবশেষে আশ্রয়হীনা হইয়া সুলোচনা ভাসিয়া চলিলেন। এমন সমুদ্রে ভাসিয়া চলিলেন, যাহার কূল নাই—কিনারা নাই, অথচ যাহাতে বিভীবিকাময়ী তরঙ্গ আছে। অকূল জীবন-সমুদ্রে ক্ষুদ্র যৌবনতরী ভাসিয়া চলিল। তরী ভাসিল—কেহ দেখিল না, কেহ ধরিতে পারিল না। বিপদ-তরঙ্গ ভ্রুকুটি দেখাইতেছে—কি ভীষণ খেলা খেলিতেছে—এ তরী তাহা দেখিয়াও উপেক্ষা করিল। স্বর্গ হইতে দেবতারা সুলোচনার সৎসাহসের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিলেন—সুলোচনা কোমর বাঁধিয়া সাগরে নামিলেন।

সুলোচনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া কষ্ট যন্ত্রণার লজ্জা পাইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা পাইল না। সুলোচনাও কোমর বাঁধিল, বিপদও যেন কোমর বাঁধিয়া আসরে নামিল। সুলোচনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা,—কষ্ট যন্ত্রণাকে মানিয়া চলিব না—যদি কাহাকে মানিতে হয় ত উপরওয়ালাকে মানিব। কষ্ট যন্ত্রণারও যেন প্রতিজ্ঞা, সংসারকেই মানাইব,—বিশ্বাস ও কল্পনার ভুল দেখাইয়া মোহতেই ডুবাইব। দুই যেন সমান। উপর সত্য, কি নিম্ন

সত্য? উপর সত্য হইলে বিপদের পরাজয়, সংসার হারিবে। নিম্ন সত্য হইলে বিপদ রাজ্য পাইবে,—জড়জগৎই পূজা পাইবে। দুই সত্য, কি একই সত্য, সুলোচনা ভাবিয়া তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না।

সুলোচনা সমস্ত দিন বৃক্ষের তলায় তলায়, জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন কিছুই আহার করেন নাই, তাহাতেও কষ্ট বোধ হইতেছে না, প্রাণের ভিতরে দুর্দ্দম্য সাহস। মুখে মলিনতা নাই, প্রাণে বিষাদ-কালিমা নাই। বৃক্ষের পত্র পুষ্প আজ কত মধুর বোধ হইতেছে,—বৃক্ষের সাজ সজ্জা আজ কত মনোহর বোধ হইতেছে। পাতা ও ফুল থাকিয়া থাকিয়া যেন সুলোচনার সহিত কত মিষ্ট আলাপ করিতেছে—যেন বলিতেছে,—'আমরা বারমাস জঙ্গলে থাকি, জঙ্গলেই সুখ, জঙ্গলেই শান্তি। এখানে কেহ আমাদিগকে ধরে না, কেহ দেখে না। মায়ের ধন মায়ের কোল আলো করিয়া থাকি।' সুলোচনার প্রাণে অপার আনন্দ, ফুল ধরেন, ফল ধরেন, আর চুম্বন করেন, বলেন,—'তোমাদের সহিত আমিও থাকিব। স্থান দিবে ত?' ফুলেরা যেন বলে—স্থান দিব; যে আমাদিগকে চায়, তার জন্যই আমরা আছি।—আমায় দেখ, আমায় দেখ, এই প্রকার বলিয়া কত বৃক্ষের কত ফুল, কত ফল যেন সুলোচনাকে অভ্যর্থনা করিল। সমস্ত দিন অভ্যর্থনা করিল,কিন্তু শেষ হইল না, দিবস শেষ হইয়া আসিল,ঘনীভূত জঙ্গলকে ঘনীভূত আঁধার বেষ্টন করিল। পাখী কলরব করিতে করিতে আপনাপন শাবকাদি অন্বেষণ করিতে লাগিল;—তারপর মিলিয়া কুলায়াভিমুখে চলিল। দূর দূরন্তর হইতে বৃক্ষের ছায়ার ছায়ায় লুকাইয়া আসিয়া গাঢ় অন্ধকার কোল প্রসারণ করিয়া সুলোচনার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল,—দূরের পাতা, দূরের ফুল, দূরের বৃক্ষ আঁধারে ঢাকা পড়িল, সুলোচনার চক্ষুর অদৃশ্য হইল। ক্রমে ক্রমে নিকটস্থ বৃক্ষগুলিও ঢাকা পড়িল, আঁধার আসিয়া সকল একাকার করিয়া দিল। বৃক্ষ, ফুল, ফল, পাতা, সব একাকার হইয়া গেল—কেবল ঘনীভূত আঁধার—কেবল আঁধার। সেই আঁধারে সুলোচনা একাকিনী, পৃথিবীর সকল যেন আজ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সেই গাঢ়তর আঁধারে দাঁড়াইয়া, নিরাশ্রয় সুলোচনা, বন কাঁপাইয়া, ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া ডাকিলেন—"মা—মা—মা, আজ দেখা দেও, আজ দেখা দেও। ভিন্ন রূপ ধরিয়া ধ্রুবকে যে প্রকার দেখা দিয়া শান্তি দিয়াছিলে, আমাকে দেখা দিয়া আজ সেই প্রকার শান্তি দেও।"

সুলোচনার গভীর স্বর জঙ্গলে প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে দূর দূরান্তরে চলিল। সুলোচনার দুনয়ন হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতে লাগিল। স্পন্দন-রহিত হইয়া সুলোচনা সেই স্থানে নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সে যে কি জীবন্ত চিত্র, তাহা বর্ণনা করা যায় না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অবসাদাঙ্কে।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে সকলের নেশা ছুটিল। গোরাচাঁদ একে একে দলের লোকদিগকে গণনা করিল। দেখিল, সকলেই আছে, কেবল সুলোচনা নাই। গোরাচাঁদের মন অস্থির হইল। মন অস্থির হইল, কিন্তু পা আর চলে না। মন বলে অনুসন্ধানে চল, পা বলে আর কাজ নাই, যা আছে তাহা নিয়েই থাক। নেশা ছুটিয়াছে, একটু জ্ঞান আসিয়াছে বটে, কিন্তু তখনও বল সঞ্চারিত হয় নাই—স্নায়ুতে ও মাংসপেশীতে একতা হয় নাই। স্নায়ুর কথা মাংসপেশী শুনিতে চাহে না। গোরাচাঁদ বিষম বিভ্রাটে পড়িলেন।

সুলোচনাকে পাওয়া যাইতেছে না, এ কথায় কুলকামিনীর মনে দারুণ দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইল। কুলকামিনী মনে করিল—সুলোচনা আত্মহত্যা করিয়াছে। পাপের ফল হাতে হাতে। একদিকে লজ্জা, অপরদিকে অনুতাপ, কুলকামিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সুলোচনাকে আর পাইব না, আর দেখিব না, ইহা স্মরণে কুলকামিনীর দুই চক্ষু হইতে ধারাবাহী হইয়া জল পড়িতে লাগিল। কুলকামিনী আর ঠিক থাকিতে পারিলেন না। কমলমণিও একটু চিন্তিত হইল,—সে চিন্তা স্বার্থের জন্য, ভালবাসার জন্য নহে। কমলমণির হৃদয় পাষাণ সদৃশ। কমলমণি একটু ভাবিয়া পরে কুলকামিনীকে বলিল—সেটা মরেছে, বেশ হয়েছে, অমন জাত-নাশিনী মেয়ে থাকার চেয়ে না থাকা ভাল। সর্ব্বনাশিনীকে লয়ে শেষে কত ভোগই ভুগ্‌তে হতো। তুই আমার লক্ষ্মী, তুই আমার সোণা।

কুলকামিনী বলিলেন,—মা তোর হৃদয়ে কি একটুও দয়া মায়া নেই, মায়ের কুলে যে তুই কালী দিলি। মা নাম কত মধুর, কিন্তু তোর আচার

ব্যবহার যে দেখিল, সে আর কখনও মা নাম মুখে আন্‌বে না। তুই কি ছলি? কমলমণি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, তোর আর বক্তিতে কর্‌তে হবে না; অনেক দেখেছি, দুদিন পরে তোর দশাও দেখিব, এখন ক্ষান্ত হ।

কুলকামিনী লজ্জায় মুখ নত করিলেন। পাপ করিলে দলের লোকেও ঘৃণা করে, এধারণা পূর্ব্বে ছিল না, মায়ের কথায় কুলকামিনী লজ্জায় মুখ নত করিলেন।

এদিকে গোরাচাঁদ আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, দলের লোকদিগকে সঙ্গে করিয়া, মশাল জ্বালিয়া, সুল্‌ফি, লাঠী ও রামদাও প্রভৃতি লইয়া সুলোচনার অন্বেষণে বাহির হইল। অরণ্যের কালী বাড়ী দস্যুদিগের আড্ডা বিশেষ, অস্ত্রাদি সকলি সেখানে ছিল। গোরাচাঁদ পুরোহিত ঠাকুরকে বলিয়া গেলেন,—কুলকামিনী ও কমলমণিকে দেখিবেন, আমরা সত্বরই আসিতেছি। গোরাচাঁদের বিশ্বাস ছিল, কুলকামিনী দীক্ষিত হইয়াছে যখন, তখন আর হাত-ছাড়া হইবে না।

গোরাচাঁদের দল প্রস্থান করিল, এ দিকে কুলকামিনীর হৃদয়ে অত্যন্ত বিপদের আশঙ্কা উপস্থিত হইল। সুলোচনা যদি জীবিত থাকে, তবে আজ আর রক্ষা নাই—আজ আর সে বাঁচিবে না। হায়, আমি পাপে ডুবিয়াও তাহাকে বাঁচাইতে পারিলাম না। সুলোচনা যা বলেছিল, তাই সত্য হলো?—পাপে ডুবিলে কূল কিনারা পাওয়া যায় না, এ কি শাস্ত্র? পাপে ডুবিলে আর পথ পাওয়া যায় না, এ কি ব্যাপার? কুলকামিনীর হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল,—মনে মনে বলিলেন, যা হয়েছে তা হয়েছে, আমি অবশ্য রক্ষা পাইব—ঐ শাস্ত্রকে মিথ্যা প্রমাণ করিব। ইহা ভাবিয়া কুলকামিনী আবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। মাকে বলিলেন, তুই কিছু কাল অপেক্ষা কর্, আমি আসিতেছি। এই বলিয়া কুলকামিনী যাত্রা করিলেন। পুরোহিত তথনও একটু একটু সংজ্ঞাহীন ছিল, ভাল করিয়া কিছু বুঝিতে পারিল না, কাজেই কোন রকম বাধা দিল না।

এ দিকে গোরাচাঁদ দলবল লইয়া সেই নিবিড় অরণ্যের ভিতরে সুলোচনার অনুসন্ধানে বাহির হইল, এদিকে কুলকামিনী ভগ্নীকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল প্রাণে বহির্গত হইলেন। গোরাচাঁদের দল চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল—তাহাদিগের যেন প্রতিজ্ঞা যে, সেই রাত্রের ভিতরে সুলোচনাকে ধরিয়া আনিবে,—যেন যমকেও ভয় করিবে না—যেন মরা

মানুষকে জীবিত করিয়া আনিবে। অরণ্য ছাইয়া, প্রজ্বলিত মশাল হস্তে করিয়া যখন গোরাচাঁদের দল চতুর্দ্দিকে চলিল, তখন অরণ্যের পশুপক্ষীও যেন ভয়ে কলরব করিতে লাগিল, এ স্থান হইতে ওস্থান, ওস্থান হইতে অন্য স্থানে লুকাইতে লাগিল। পক্ষীর পক্ষপুটের তাড়নায়, পশুদিগের দ্রুত-গমনে অরণ্যের বৃক্ষাদির পল্লব ও শাখা প্রশাখা কম্পিত হইতে লাগিল ;—অরণ্য যেন ভয়ে বিহ্বল হইয়া জাগিয়া উঠিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

চিন্তা-পীড়নে।

সুলোচনা সেই আঁধারে,সেই নিস্তব্ধ রজনীতে দাঁড়াইয়া কি করিতেছেন ? পল যায়, ক্ষণ যায়, মুহূর্ত্ত যায়—কাল কালে মিশাইয়া যাইতেছে। প্রভাতের স্নিগ্ধ অরুণ মধ্যাহ্নে প্রখর হয়,—মধ্যাহ্নের তেজ সায়াহ্নে নিস্তেজ হইয়া ডুবিয়া যায়। প্রভাতের সুধামাখা—জগম্মোহন রূপ,—সুস্নিগ্ধ—যেন আঁধারে আলো, কঠোরতায় কোমলতা, শুষ্কতায় সরসতা, উষ্ণতায় শীতলতা, দুঃখে সুখ, মৃত্যুতে জীবন, বার্দ্ধক্যে নবীনত্ব, নিরাশায় আশা, বিষে সুধা, এক্ষণ কোথায় ? যাহা হইবার তাহা হইয়াছে—জগৎলোচন আঁখি মুদিয়াছেন—সুলোচনার জন্য কেবলই আঁধার রাখিয়া ডুবিয়াছেন। ঐ সূর্য্য আবার উঠিবে, কিন্তু আজ আর না। সুলোচনা আঁধারে ; বাহিরের এ আঁধার সময়ে ঘুচিবে, কিন্তু আজ আর না। সুলোচনা সেই আঁধারে দাঁড়াইয়া আজ কি ভাবিতেছেন ? গত কয়েক দিবস সুলোচনা যে প্রকার যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে চিন্তা বা ভাবিবার সময় মিলে নাই, বলিতে কি, শ্বাসপ্রশ্বাস যদি বিবেচনা বা যুক্তিতর্ক করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইত, তবে সুলোচনার তাহাও হইত না। এমনই অনবসর, এমনই ব্যস্ততা। সে ব্যস্ততা, সে অনবসরকে আজ আঁধারে ঘেরিয়াছে। আজ সুলোচনা একটু ভাবিবার সময় পাইয়াছেন। সূর্য্য ডুবিয়াছে, ভালই হইয়াছে ; আঁধার আসিয়াছে, ভালই হইয়াছে,—সুলোচনা ইহাই ভাবিতেছেন। ভাবিতেছেন,—ঐ নিষ্ঠুর সংসারকে আর দেখিব না ;—কেন দেখিব, কার মায়ায় দেখিব ? কি সুখের আশায় ওদিকে চাহিব ? তবে এই আঁধারেই কি চিরকাল

থাকিব! আঁধারে আবার যখন আলো ফুটিবে, তখন কি কেবল বৃক্ষ লতা, ফুল ফল লইয়াই থাকিব?—যদি থাকিতে পারি, তবে ক্ষতি কি? যদি এই সকল আমাকে স্থান দিয়া রাখে, থাকিতে ক্ষতি কি? বিধাতা মায়ের আঁচলে আমার সুখ বাঁধেন নাই। ঐ সর্ব্বনাশীই আমার,—ছি, এমন কথা মুখে আনিব না। তিনি আমার মা। মায়ের প্রতি আমি চটিব কেন?—তিনি মাতা, পূজনীয়া—আমার আরাধ্যা। তিনি যাই হউন, আমি চিরকাল তাঁর চরণ পূজা করিব। পূজা করিতে কি তবে আবার ফিরিব?—না, তা ফিরিব না। এ হৃদয়ে মায়ের রূপ আঁকিব, সেই রূপের পূজা করিব। সংসার তাহা জানিবে না, সংসার তাহা বুঝিবে না। মা অঞ্চল ঝাড়িয়াছেন, কিন্তু আমি মাকে কোলে পূরিব! আমার দিদিকে কি ভুলিব?—তিনি আমার মাতা, তিনিই পিতা, তিনিই আশ্রয়, তিনিই সুখ। হায়, দিদি আমার জন্য কত কষ্টই সয়েছেন। দিদির শরীর মন ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। আমার জন্য দিদি এত দিন সকল সুখকে তৃণের মত উপেক্ষা করেছেন। বাল্যকালে যখন পড়িতাম,—বিনোদবাবু যখন পড়াইতেন, তখন দিদি পড়ার সকল সুবিধা করিয়া দিতেন। আজ বই নাই, আজ কালী নাই, আজ কলম নাই; তখন দিদি আমার সহায় ছিলেন, কোন অভাব ছিল না। মা বাধা দিতেন, দিদি আঁচলের তলে আমাকে ঢাকিয়া রাখিতেন, সকল দোষ আপন মাথা পাতিয়া লইতেন। দিদির কথা কি ভাবিব?—দিদি আমার পক্ষে প্রত্যক্ষ দেবতা। দিদি মানুষ নয়, সত্যই দিদি দেবতা। এখন বড় হইয়াছি—কত শিক্ষা পাইয়াছি, কত বিষয় ভাবিতে পারিতেছি, ইহার মূল,—দিদি। দিদিকে যখন ভুলিয়াছি, তখনই আমার বিপদ আসিয়াছে। আর যখন দিদির স্নেহমাখা মুখ চক্ষের উপর রাখিয়া দেখিয়াছি, তখন সকল বিপদ, সকল কষ্ট উড়িয়া গিয়াছে। আজ সে দিদি কোথায়, আর আমি কোথায়? দিদি পাপে ডুবিতেছেন, আর আমি এখানে আছি?—ধিক আমার জীবনকে! আমার বিপদের সময় দিদি কোল পাতিয়া আমার বিপদকে সাদরে গ্রহণ করিতেন, আর আমি আজ তাঁহার পতনের সময় দূরে আসিয়াছি? আমি পশু। ঐ আকাশের কথা শুনিয়াই মরিয়াছি। দিদি কোথায়? আমি দিদিকে ছাড়িয়া এ আঁধারে থাকিব না। দিদিকে বাঁচাইতে যদি না পারি, তবে মরিব। দিদির গলা ধরিয়া দিদিকে তুলিব। বিপদের ভয়ে পলাইব?

এ দিদি-শূন্য আঁধারে আমার থাকা হইবে না। তবে আমি যাই,--ফুল ফল, তোমারা থাক, আমার এখানে আর থাকা হলো না। দিদিকে ছাড়িয়া আমি তোমাদিগকে লইয়া থাকিব না। এই প্রকার ভাবিয়া অস্থির-মনা সুলোচনা দুই এক পা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চিন্তা মনকে পরিত্যাগ করিল না; আবার ভাবিতে লাগিলেন;--"আগুনে পুড়িয়া মরিতে যাইব?—আবার পাপের পথে হাটিতে যাইব? বিনোদ বাবু যে পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কত স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এক কথায় আপন জীবনকে বিপদসাগরে ভাসাইয়াছেন, সেই পথে আবার যাইব? আজ দিদি একদিকে, বিনোদ বাবু ভিন্ন দিকে। যখন দুই জন একদিকে ছিল, তখন কোন ভাবনা ছিল না, আজ আমি কি করি?—কে বলিবে, কি করি? মন বলে যেও না, হৃদয় বলে যাও। হৃদয়ের কথা শুনিলে আজ আমি পাপে ডুবিব—নিশ্চয় ডুবিব। দিদিকে লইয়া কি চিরকাল পাপে ডুবিয়া থাকিতে পারিব?—না--তাত পারিব না। পাপের জ্বালা সইতে পারিব না, আর সব পারি, ও কথাটী রাখিব না। বিনোদ বাবুর পথেই কি তবে যাইব? বিনোদ বাবুর পথই কি এই আঁধার? সংসার নাই—পাপ নাই, তাপ নাই, কেবল আঁধার! এই আঁধারে কি সুখ? এই আঁধারেই কি চিরদিন ঘুরিব? এই ফুল ফল লইয়াই কি চিরকাল থাকিব?—বিনোদ বাবুকেও পাইব না, দিদিকেও পাইব না?—একজন পুণ্যে, আর একজন পাপে, দুই জন দুই সীমায়! ইঁহারা কি মিলিবেন না? চিরকাল একাকী থাকিব? ভাবিতে২ সুলোচনার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি সেই স্থানে, সেই অরণ্যের বৃক্ষের কোলে অবসন্ন শরীরকে রাখিয়া নিদ্রিত হইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

উচ্ছ্বাসে শান্তি।

সুলোচনা সেই অরণ্যের কোলে, আকাশের তলে, সেই আঁধারে—নিদ্রায় অচেতন। সেই নিদ্রিত অবস্থায় আবার বিনোদবাবুকে সুলোচনা নিকটে,অতি নিকটে দেখিলেন। স্বপ্ন বলিয়া সুলোচনার ধারণা নাই, সত্যই

যেন বিনোদবাবু সুলোচনার নিকটে। সুলোচনার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। পূর্ব্বে যে আচ্ছাদনে শরীর মন ঢাকা ছিল, সে আচ্ছাদন উড়িয়া গিয়াছে,—সরলা সরল ভাবে নির্ভয়ে বলিলেন—"বিনোদবাবু, এই কি লীলা, এই কি খেলা ?"

বিনোদবাবু যেন গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—এই লীলাময় পৃথিবীতে এই লীলা,—এই খেলার আরম্ভ। আপনাকে, সংসারকে, অনন্তকে বুঝিতে হইলে এই খেলাই খেলিতে, এই লীলাই দেখিতে হইবে। ভীত হও কেন ?

সুলোচনা।—ভীত আমি ?—না তুমি ? নিকটে আসিতে ভয় পাও—তুমি !—আমি ভীত ? এই আঁধারে আমি একাকী, কিন্তু তোমাতে নিমগ্ন। তোমার কথা পালনের জন্য সকল পরিত্যাগ করিয়াছি।

বিনোদবাবু।—সে কি আমার কথা ? তুমি অবোধ বালিকা, কি বুঝিবে ? হৃদয়ের পানে চাহিয়া শুন, কে কথা বলিতেছে,—আমি, না আর কেহ ? লোকের কথা পালনের জন্য লোক পাপ-মৃত্যুতে ডুবিতে যায় বটে, কিন্তু সত্যস্বর্গে যাইতে চায় না,—যাইতে পারে না। যাঁহার কথায় লোক পারে, তাঁহার কথা কাণ পাতিয়া শ্রবণ কর। অযুত তানে সেই মোহনস্বর হৃদয়ে গীত হইতেছে। তুমি বালিকা, কি বুঝিবে ?

সুলোচনা বলিলেন,—বিচ্ছেদের শাস্ত্র আর বুঝিতে চাহিনা। মিলনের শাস্ত্র একবার শুনাও দেখি।

বিনোদবাবু আরক্তিম লোচনে সুলোচনার পানে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিলেন, বলিলেন, আমি শুনাইব ? একদিন তাহা অবশ্য শুনিতে পাইবে। বধির যত দিন আছ, ততদিন সে স্বর শুনিতে পাইবে না। বিচ্ছেদের শাস্ত্রেই মিলনের শাস্ত্র আছে। যিনি শুনাইবেন, তিনিই তাহা শুনাইবেন। যখন সময় আসিবে, তখনই শুনিবে। আজ এখনও মোহের বশীভূত রহিয়াছ ?—উঠ, অবোধ, সংসারকীটের দংশন-পীড়নে মজিতেছ ?—উঠ, আমার সহিত আইস।

এই প্রকার নানা কথা বলিয়া, বিনোদবাবু যেন চলিতে লাগিলেন। উৎসাহময় কথায় সুলোচনার সর্ব্ব শরীরে যেন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। নিস্তেজ, নিস্পন্দ শরীরে শত শত বহ্নিকণা যেন একই সময়ে দীপ্তি পাইয়া উঠিল;—শরীর আগুন, মন আগুন, হৃদয় আগুন। অগ্নিময়ী সুলোচনা

বলিলেন, যাইবে? একাকী যাইতে দিব না, ধরিব, নিশ্চয় ধরিব। এই বলিয়া সুলোচনা উঠিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিলেন। নিদ্রার মোহিনী আকর্ষণ তখনও রহিয়াছে, সুলোচনা জঙ্গল ভেদ করিয়া বিনোদ বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

সেই শূন্য আকাশে, সেই গভীর রজনীতে মেঘ ভাসিল। ভাসিয়া, এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ছুটাছুটি করিয়া, অনন্ত নক্ষত্রমণ্ডলীর সহিত মধুর খেলা খেলিতে লাগিল। মেঘ যেন বলে—সুলোচনাকে আমিই ধরিব, আমিই শীতল করিব, আমিই দেখিব। নক্ষত্রদের যেন তাহা সহ্য হয় না, তাহারা বলে, সুলোচনাকে আমরাও দেখিব, আমরাও ডাকিব, আমরাও ভুলাইব। এই বলিয়া এক একবার বাহির হয়, আবার মেঘ আসিয়া চাপিয়া ধরে। একটী, একটী, একটী, করিতে করিতে কত নক্ষত্রই মেঘে ঢাকা পড়িল। নক্ষত্র-জগৎ যায় যায় হইল, ক্রীড়ায় হারিল; একে একে সকলের দর্প মেঘ চূর্ণ করিল। চূর্ণ করিয়া আপনি একাধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। নক্ষত্র-জগতের দুর্দ্দশা দেখিয়া বায়ুর প্রাণ চমকিয়া উঠিল; অসহ্য যাতনায় অধীর হইয়া সে আসরে নামিল। মল্ল যুদ্ধ বাঁধিল। মেঘ ধরে বায়ুকে, বায়ু ধরে মেঘকে। ভীষণ সমর-রোলে দিক পূর্ণ হইয়া উঠিল। বিদ্যুৎ চমকিয়া বিভীষিকা দেখাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে ভয়ে মেঘ বা বায়ু কেহই ভীত হইল না। এমনই যুদ্ধ বাধিল যে, ভয়ে বৃক্ষদিগের প্রাণ উড়িয়া গেল, তাহারা বিহ্বল হইয়া আপন আপন পত্র-কেশ, ফুল ফল ছিঁড়িয়া উড়াইয়া উপঢৌকন দিতে লাগিল। বায়ু উপহার পাইয়া আরো তেজে মাতিয়া মেঘ পানে ছুটিল। পৃথিবী আপন বক্ষ শূন্য করিয়া বালুকণা উপহার দিল, বায়ু তাহাতে মজিয়া আকাশে উঠিল। ভীষণ দৃশ্য! পশু পক্ষী ভয়ে কলরব করিল, আশ্রয় ছাড়িয়া আপন আপন দেহ রক্ষায় তৎপর হইল। সুলোচনা আর চলিতে পারিলেন না, শরীর থরথর কাঁপিতে লাগিল। এই সময়ে হঠাৎ সুলোচনার চেতনা হইল,—দেখিলেন, বিনোদ বাবুও নাই, সে মধুর স্বরও নাই। অমনি শরীর অবশ হইল, সকল যেন ভূতের খেলা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ওদিকে মেঘ ও বায়ুর যুদ্ধে মেঘ পরাজিত হইল, বায়ু তাহাকে জল করিয়া পৃথিবীতে নামাইল। আকাশ হইতে নামাইয়া নক্ষত্রদিগকে মুক্ত করিল, পরে বৃক্ষকে ও পৃথিবীকে কোষ কোষ ভরিয়া উপহার দিল। বৃক্ষ, পৃথিবী, সে উপহারে কৃতার্থ

হইল। আর সুলোচনা?—সুলোচনার হৃদয়ের আগুন—সেই প্রজ্জ্বলিত দুর্দ্দম্য বহ্নিকণা নিবিল,—সহসা চেতনা হইল। শীতে অবসন্ন, বৃষ্টিতে সর্ব্ব শরীরের আচ্ছাদন আর্দ্র; কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। কত বিপদই সুলোচনার ভাগ্যে আছে, তাহা কে জানে? সেই অন্ধকারে, সেই বৃষ্টিতে সুলোচনাকে কি কষ্ট পাইতে হইল, তাহা পাঠক, তোমরা একবার ভাবিয়া দেখ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

তিরোধানে।

সেই বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে, অবসন্ন শরীরে গোরাচাঁদের দল ফিরিয়া কালীর মন্দিরাভিমুখে গমন করিল। মশালের আলোগুলি বৃষ্টিতে নিবিয়া গিয়াছে—ঘোরতর আঁধার চতুর্দ্দিক ঘেরিয়াছে—সুলোচনাকে কোল পাতিয়া রক্ষা করিতেছে, গোরাচাঁদের আশা তখনও মিটি মিটি জ্বলিতেছিল, সে তখনও মনে করিতেছিল, সুলোচনাকে পথে পাওয়া যাইবে। তাহা গেল না। অনেক কষ্টে গোরাচাঁদের দল মন্দিরে ফিরিল। তখন রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর, সে মন্দিরে জনপ্রাণী শূন্য, কেবলই আঁধার। সেখানে পুরোহিত নাই,—কমলমণি নাই,—কুলকামিনী নাই। কুলকামিনী কোথায় গিয়াছে, পাঠক, তাহা জ্ঞাত আছ। পুরোহিত ও কমলমণির নেশা ভাল করিয়া ছুটিলে, কুলকামিনীর বিলম্ব দেখিয়া যখন তাহারা বুঝিল কুলকামিনী আর ফিরিবে না, তখন তাহারা ভয়ানক বিপদ গণনা করিল। গোরাচাঁদকে উভয়েই ভালরূপ চিনিত। গোরাচাঁদের ক্রোধের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারা উভয়েই অসম্ভব মনে করিয়া, উভয়ে প্রাণে প্রাণে মিলিয়া পরামর্শ করিল। দুই জনের স্বার্থ একজনের স্বার্থে মিলাইল। দুই জনে কত কি ষড়যন্ত্র করিল, কত কি গুপ্ত প্রতিজ্ঞা করিল। প্রতিজ্ঞা করিয়া উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া মন্দির পরিত্যাগ করিতে উদ্যোগী হইল। পুরোহিত এক একবার মনে করিল—যদি ধরা পড়ি, তবে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, আমার রক্তে—নরশোণিতে এই কালীর মন্দির পবিত্র হইবে। ভাবিল, হয় হবে, সে ভালই। আবার ভাবিল—ধরা পড়িব কেন? মা

কালীকে এখনই কিছু মানিয়া রাখি। এই বলিয়া পুরোহিত সজলনেত্রে মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—"মা, অভয়া, নির্ভয় কর, বর দেও। আবার আসিব, আবার ও রাঙ্গা চরণে রক্তচন্দনে মাখিয়া রক্ত জবা অর্পণ করিব, আবার তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া মাতিব,—গাইব,—নাচিব। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর—ফিরিয়া আসিয়া নরশোনিতে তোমার পা ধোয়াইব। এই বলিয়া পুরোহিত কমলমণির হাত ধরিয়া বলিলেন, যদি প্রাণের আশা থাকে, মায়ের নিকট বর চাহিয়া লও, তারপর চল। কমলমণি সেই পাপবিলাক্ত হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া উচ্চৈস্বরে তিন বার ডাকিল। সে ডাকে মন্দির কম্পিত হইল। তিন বার ডাকিয়া তারপর বলিল—"ঠাকুর, মায়ের আশীর্ব্বাদ আনিয়া দেও। পুরোহিত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আপনি মায়ের পদস্থিত রক্তজবা তুলিয়া মস্তকে রাখিল, এবং একটী বিল্বপত্র আনিয়া কমলমণির হস্তে প্রদান করিল। কমলমণি একবার আশীর্ব্বাদ বক্ষে ধারণ করিল, পরে তুলিয়া মাতার কেশে বাঁধিয়া রাখিল। উভয়েই বিশ্বাসের সহিত প্রাণ ভরিয়া ডাকিল, উভয়ের হৃদয়েই বল আসিল। চিন্তা ভাবনা দূর হইল। পরে কি হইবে, সে ভাবনা আর রহিল না। উভয়ে মন্দির পরিত্যাগ করিল। মন্দির শূন্য হইল। যাইবার সময়ে যে দীপ রাখিয়া গিয়াছিল, প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে সে দীপ নিবিয়া গিয়াছে। গোরাচাঁদের দল যখন মন্দিরে ফিরিয়া আসিল, করালবদনীর পূজা করিতে তখন কেবল সেখানে আঁধার ছিল। চতুর্দ্দিকে বায়ু সোঁ সোঁ করিতেছে—বৃক্ষ কাঁপিতেছে, পত্র উড়িতেছে, বৃষ্টি নামিতেছে, বজ্র হানিতেছে,—আর আঁধার ঘনীভূত হইয়া বিরাজ করিতেছে। মন্দিরে আসিয়া গোরাচাঁদ সকল স্থান খুজিয়া দেখিল—জনপ্রাণী নাই। গোরাচাঁদ বড়ই উদ্বিগ্ন হইল, মাথায় যেন বজ্র খসিয়া পড়িল। সেই আঁধারে করালবদনীকে সম্মুখে রাখিয়া গোরাচাঁদ কত কি ভাবিল, মনে মনে কত কি প্রতিজ্ঞা করিল, তাহা কেহই জানিল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অনন্তদেবীর অনন্ত দুঃখ।

বিনোদ গৃহ পরিত্যাগ করিলেন, সুরেশচন্দ্র গৃহে রহিলেন, বিনোদ শান্তিময়ীর প্রতি বিরক্ত হইলেন, সুরেশচন্দ্র আনন্দময়ীর প্রতি সন্তুষ্ট রহিলেন, ইহা শান্তিময়ীর সহ্য হইল না। শান্তিময়ী শাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকট সকল কথা বলিয়া দিলেন—আনন্দময়ীর যে পত্র খান বিনোদ বাবুকে দেখাইয়াছিলেন, সেই পত্র খান অনন্তদেবীর হাতে দিলেন। অনন্তদেবী সে দিন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, সেই ব্যস্ততার মধ্যে শান্তিময়ী আর একটু অগ্নিকণা ফেলিয়া দিলেন। অনন্তদেবী সেই পত্র খানি সুরেশের হস্তে দিলেন। সুরেশচন্দ্র সে দিন আরও ব্যস্ত—মকর্দ্দমা রুজু করিতে যাইবেন তাহার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে তাহার নিকট একটী ক্ষুদ্র মকর্দ্দমা উপস্থিত হইল। কিন্তু তিনি সে দিকে মন না দিয়া, বড় মকর্দ্দমা রুজু করিতে চলিলেন। মকর্দ্দমা গ্রাহ্য হইল বটে, কিন্তু উপযুক্ত সময়ে আইনের সূক্ষ্মবিচারে সুরেশচন্দ্র হারিলেন। তাঁহার গৃহ হইতে সুলোচনা ও কুলকামিনীকে কে লইয়া গিয়াছে, তাহার প্রমাণ তিনি করিতে পারিলেন না, কিন্তু বিপক্ষেরা প্রমাণ করিল—দলাদলির দারুণ প্রতিশোধের জন্য তিনি তাহাদের পক্ষের লোককে কয়েদ রাখিয়াছেন ও প্রহার করিয়াছেন। সুরেশচন্দ্র মকর্দ্দমায় জরিমানা দিয়াই নিষ্কৃতি পাইলেন বটে, কিন্তু বুঝিলেন—তাঁহার স্ত্রী ও শান্তিময়ী এই মকর্দ্দমায় ভিতরে ভিতরে ইন্ধন দিয়াছে। সুরেশচন্দ্র ক্রোধে অধীর হইলেন, যথা সময়ে বাড়ীতে আসিয়া ক্ষুদ্র মকর্দ্দমাটীর বিচার আরম্ভ করিলেন। শান্তিময়ী যে উদ্দেশ্যে মকর্দ্দমাটী রুজু করিয়াছিলেন, তাঁহার সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল না, সুরেশচন্দ্র স্ত্রীর দাস—তাহার কথার ভুলিয়া গেলেন, মকর্দ্দমায় শান্তিময়ী হারিলেন। শান্তিময়ী মকর্দ্দমায় হারিলেন—লজ্জায় ও অপমানে মুখ মলিন হইল, এ দিকে আনন্দময়ী শান্তিময়ীর শত্রু হইয়া উঠিলেন। বিনোদ বাবু বাড়ীতে নাই—সুরেশচন্দ্র শান্তিময়ীর প্রতি বিরক্ত, শান্তিময়ীর আর মনের কথা বলিবার লোক নাই—আনন্দময়ীর হিংসার তলে বিষন্নভাবে থাকিয়া সময় কাটাইছে

লাগিলেন। দশ দিন, পনের দিন, দেখিতে দেখিতে অনেক দিন চলিয়া গেল, তবুও বিনোদ বাবু ফিরিলেন না, তবুও সুলোচনা ও কুলকামিনীর সন্ধান পাওয়া গেল না, এই কারণে অনন্তদেবীর হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। মকৰ্দ্দমার পর গ্রামের লোকদিগের আস্ফালনে ও অহিত চেষ্টায় সুরেশচন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। ভ্রাতার অভাবে হৃদয়ের বলের হ্রাস হইয়াছে,—তিনি গ্রামের দলাদলির অনলের সম্মুখে তৃণের ন্যায় পড়িয়াছেন। গৃহে অনল, শান্তিময়ী ও আনন্দময়ীর হৃদয়ের অভ্যন্তরে—বাহিরে অনল, চতুর্দ্দিকে,—ক্রমে অনন্তদেবী ও সুরেশচন্দ্র উভয়েরই হৃদয় মনের বাঁধনিও ভাঙ্গিয়া পড়িল। গৃহে শান্তি স্থাপনের জন্য অনন্তদেবী অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল ফলিল না—কারণ সুরেশচন্দ্র স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া সকল প্রকার মিলনের আশার মূল উচ্ছেদ করিতে লাগিলেন। যে স্ত্রী স্বামীর নিকট আদর পায়,—তাহাকে আর রাখে কে? আনন্দময়ীকে তিরস্কার করিয়া অনন্তদেবী কোন ফলই পাইলেন না। অনন্তদেবী হার মানিলেন। গৃহের অশান্তি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অনন্তদেবীর প্রতি আনন্দময়ী অসন্তুষ্ট হইলেন—শাশুড়ীর বিরুদ্ধে স্বামীর নিকট বলিলেন। সুরেশচন্দ্র এ মকৰ্দ্দমাটী সহজে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। কাজটী ভাল হইল না। পদে পদে অনন্তদেবী পুত্রবধূদিগের দ্বারা অপমানিত হইতে লাগিলেন। শান্তিময়ী শাশুড়ীকে আর মানেন না—কারণ শাশুড়ী গৃহের অনল নিবাইতে পারেন নাই, শাশুড়ীর প্রতি তাহার অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। আনন্দময়ী কেন বিরক্ত হইয়াছেন, সে কথা আর বলিব না। অনন্তদেবী জীবনে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু এবার তিনি আর সহ্য করিতে পারিতেছেন না। বিনোদের অদর্শনে তাঁহার হৃদয়ের বাঁধনি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, মনে ভাবিতেছেন—আমিই বিনোদকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়াছি, আমিই বিনোদকে পথের কাঙ্গাল করিয়াছি;—সেই জন্য বিনোদ আর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না—এ বৃদ্ধ মায়ের মুখ আর দেখিবে না। আবার ভাবেন, না,—বিনোদ আমার তেমন ছেলে নয়, পরোপকার বিনোদের জীবনের ব্রত—সেই ব্রত-পালন হইলেই ফিরিবে। আমি তাহাকে তাহার কৰ্ত্তব্যপথে যাইতে বলিয়াছি—এতে মায়ের উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছি—বিনোদ সে জন্য কেন রাগ করিবে? বিনোদ আমার তেমন মূর্খ ছেলে নয়। আবার ভাবেন—একমাস গেল, দুমাস গেল—

কতদিন কত রাত্রি গেল, তবুও বিনোদ আসিল না—আমার মৃত্যুর দিন নিকটে—আর বুঝি দেখা হবে না! আবার ভাবেন—বিনোদ কোথায় গেল? যেমনটী ঘরের বাহির করিলাম, আর কি তেমনটী পাইব?—শুনেছি, লোক বিদেশে গেলে আর পূর্ব্বের মত থাকে না—মায়া দয়া শূন্য হয়। হায়, বিনোদ কোথায় গেল? কত করে লেখা পড়া শিখিয়ে ষোলআনা ছেলেকে ঘরে তুলেছিলাম, সে ছেলে আবার গেল!! হায়, হায়, তবে আর আমার সহিত সাক্ষাৎ হবে না। এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধ অনন্তদেবীর শরীর দিন দিন কৃশ ও মলিন হইতে লাগিল। এদিকে গৃহে অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে—সেই উত্তাপে অনন্তদেবী আরো শীর্ণ হইতে লাগিলেন। সুরেশচন্দ্র জননীর অবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন—তাঁহারও কিছুই ভাল লাগিতেছে না। সমাজের আন্দোলন ও অত্যাচারে, গৃহের আন্দোলনে এবং ভ্রাতৃবিচ্ছেদে তিনিও জীর্ণ শীর্ণ হইতে লাগিলেন। গোপালপুরে এমন কেহ নাই—যাঁহার নিকটে মনের কথা বলিয়া, উপদেশ পাইয়া একটু শান্তি পাইবেন। পূর্ব্বে দুই একটী বৃদ্ধা অনন্তদেবীর নিকট মধ্যে মধ্যে আসিত, কিন্তু মকর্দ্দমার পর আর কেহ আসা যাওয়া করে না,—গ্রামের লোকদিগের অত্যাচারে আর কোন জনপ্রাণী সুরেশচন্দ্রের বাড়ীতে আসিতে পারে না। গৃহের অশান্তি নিবিল না—সুরেশচন্দ্র অবশেষে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি শান্তিময়ী ও আনন্দময়ীকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করিলেন, ভগ্নীদিগকে মাতুলালয়ে প্রেরণ করিলেন, এবং ঘরের দরজায় চাবি দিয়া শেষে অনন্তদেবীকে লইয়া কলিকাতায় গেলেন। অনন্তদেবী মনে করিলেন, গঙ্গাতীরে থাকিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ শান্তিতে কাটাইবেন। কালীঘাটে ঘর ভাড়া করিলেন—কালী গঙ্গার বুকের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু জননীর হৃদয়ে কালীঘাট-বাসেও শান্তি মিলিল না—পুত্রের বিচ্ছেদ সেখানেও অস্থির করিয়া তুলিল। গোপালপুরের কোন লোক ইঁহাদিগের জন্য কাঁদিয়াছিল কি না, জানি না,—কিন্তু কালীঘাটে আসিয়া অনন্তদেবীর হৃদয় গোপালপুরের আত্মীয় বান্ধবদিগের জন্য অস্থির হইল।—বান্ধব না শত্রু? হউক শত্রু, দূরদেশে তাহারাই মিত্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কালীঘাট ভাল লাগিল না। গোপালপুরের মধুর গ্রাম-দৃশ্য অনন্তদেবী ভুলিতে পারিলেন না—সেই শিবপূজা ভুলিতে পারিলেন না। কালীঘাটেও শিবপূজা করেন, কিন্তু তেমন সুখ মিলে না।

কন্যাদিগের অদর্শন, পুত্রবধূদিগের অদর্শন--গোপালপুরের সামান্য গ্রাম্য শোভার স্মৃতিময় স্নেহ, সকলের উপরে বিনোদের অদর্শন অনন্তদেবীকে কালীঘাটে অস্থির করিয়া তুলিল। অনন্তদেবী কালীঘাটে আসিয়াও সুখ পাইলেন না। সুরেশচন্দ্র বিষণ্ণ হইলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

মধুর সহানুভূতি।

সুরেশচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া বিনোদের অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথায়ও সন্ধান পাইলেন না। স্কুলের ছাত্রদিগের সহিত বিনোদ-বাবুর বড়ই হৃদ্যতা ছিল, সুরেশ ছাত্রদিগের বাসায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যের বিষয়ই হউক, আর দুর্ভাগ্যের বিষয়ই হউক, বিনোদের পরিচিত ছাত্রদিগের বাসায় তাঁহার কিছু সংবাদ পাইলেন, কিন্তু সে সংবাদে সুরেশচন্দ্র আরো অস্থির হইলেন। স্কুলের ছাত্রেরা বলিল,— বিনোদবাবুর সহিত সাক্ষাৎ নাই, তবে আমরা শুনেছি, তাহাকে ভুলাইয়া কুলিশ্রেণী ভুক্ত করিয়া কোথায় চালান দেওয়া হইয়াছে। কোথায় চালান দিয়াছে, তাহার কোন সংবাদ পাইলেন না। প্রাণের ভাই বিনোদকে কুলি-শ্রেণীতে নিয়াছে, এ সংবাদ সুরেশচন্দ্রের প্রাণে সহিল না, বিষাদে তাঁহার মুখ মলিন হইল,—অস্থির হইয়া পড়িলেন! স্কুলের ছাত্রেরা বড় দয়ালু, সুরেশের দুঃখে অনেকেই ব্যথিত হইলেন, বলিলেন "আপনার কোন চিন্তা নাই, বিনোদবাবু আমাদের বড় প্রিয় জিনিস, তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য আমরা যথা সাধ্য চেষ্টা করিব, একটা সংবাদ অবশ্য বাহির করিতে পারিব।" সেই দিন হইতে বিনোদবাবুর রীতিমত অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, রেলওয়ে ষ্টেসন, কুলীর ডিপো এ সকল আর বাকী রহিল না। রেলওয়ে ষ্টেসনে ঘুরিলেন বটে, কিন্তু কোন সন্ধান মিলিল না। কোন একটী কুলী আফিসের একজন সহৃদয় বাঙ্গালী কর্ম্মচারী বলিল, "অনেক দিন হইল, হোসেনউল্লা রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে একটী বাবুকে চাকুরী দিবার ছলনায় লইয়া আসিয়াছিল বটে। বাবুটীর বেশ মলিন ছিল,—পাগলের মত,— জীর্ণ শীর্ণ। আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল, বাবুকে ফিরাই, চেষ্টাও করিয়া-

ছিলাম, কিন্তু কোন ফল পাই নাই। তিনি বলিলেন,—বাঙ্গালায় থাকিতে আর আমার ইচ্ছা নাই—আমি কোন দূর দেশে যাইতে চাই। বাবুর নাম কি, জানি না, তারপর তাঁহাকে কোথায় পাঠান হইয়াছে, তাহাও জানি না, তবে আপনারা আমাদের রেজেষ্টারি বহি যদি দেখিতে পারেন, তবে সবিশেষ সকলই জানিতে পারিবেন।”

একজন ছাত্র বলিল, রেজেষ্টারি বহি দেখিবার কি কোন উপায় আছে?

বাবু বলিল—সে উপায় নাই, তবে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন।

শুনিয়া সুরেশচন্দ্রের চক্ষু হইতে অশ্রু পড়িল।

স্কুলের ছাত্রেরা বলিল, কাঁদিলে কি হইবে, কুলি আফিসের লোকেরা না পারে এমন কাজ নাই, চলুন একবার চেষ্টা করিয়া দেখি; টাকায় সব হয়।

তখনকার স্কুলের ছাত্রেরা ঘুস দেওয়াকে দোষের মনে করিত না।

সুরেশচন্দ্র অগত্যা সম্মত হইলেন। ছাত্রেরা আফিসের অধ্যক্ষের নিকট গমন করিল। কুলীর অধ্যক্ষ,—ছোট নবাব, ছাত্রদিগকে দেখিয়াও যেন দেখিল না, অন্যমনস্ক হইয়া আপন কার্য্যে ব্যস্ত রহিল। ইহাদের হৃদয় পাষাণের ন্যায়, ক্রন্দনে—হৃদয় বিদারক আর্ত্তনাদেও ইহাদের প্রাণে আঘাত লাগে না। শত সহস্র লোকের চক্ষের জল দেখিয়া দেখিয়া ইহাদের নিকট ও সকল পুরাতন হইয়া গিয়াছে। সুরেশের চক্ষের জলে বক্ষ ভিজিয়া যাইতেছে—কিন্তু সেখানকার লোকেরা ঠাট্টা বিদ্রুপ করিতে ছাড়িতেছে না,—তাহারা কেহ হাসিতেছে, কেহ ঠাট্টা করিতেছে, কেহ বলিতেছে,—তোমাদের কি হয়েছে গো, বাপের শ্রাদ্ধের ভিক্ষা চাহিতে এসেছ? নিরুপায় ছাত্রেরা কোন প্রকার উত্তর করিল না। প্রায় দুই ঘণ্টার পর একটী ছাত্র বিনীত ভাবে অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মহাশয়, প্রায় দুমাস পূর্ব্বে বিনোদ বাবু নামে একটী যুবক আপনাদের আফিস হইতে কুলি হইয়া গিয়াছেন, সেই যুবকটীকে কোথায় পাঠান হইয়াছে, বলিতে পারেন কি?

অধ্যক্ষের কর্ণে একথা পৌঁছিল, কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না, আপনার মনে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে আর একটী ছাত্র বলিলেন,—মহাশয়, আমরা বিপন্ন হয়ে এসেছি, আমাদের প্রতি একটু সদয় হউন।

একথাও বায়ুতে মিশাইয়া গেল, উত্তর নাই।

কতকক্ষণ পরে ছাত্রেরা বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিল, কাণাকাণি চলিতে লাগিল,—খবরের কাগজে লেখার কথা উঠিল, চুপে চুপে নালিসের কথা উঠিল।

এ সংবাদ অধ্যক্ষের কর্ণে বাজিল, তেলে বেগুণে জ্বলিয়া বলিল,—যা, বাবার কাছে নালিস্ কর্ যেয়ে।

এই কথার পর একজন ছাত্র হাতের আস্তিন গুটাইয়া সদর্পে বলিল—আমাদের সহিত বদ্মায়েসী, থাক্, দেখা যাবে কিছু হয় কি না?

অধ্যক্ষ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—অনেক ছাত্র দেখেছি—অনেক লোক দেখেছি বাবা, আর কেন? এই কাজ করে করে আমাদের হাড় পেকেছে, তোদের ন্যায় লোককে যদি ভয় কর্‌তে হতো, তবে এতদিন এ ডিপো উঠে যেতো। যা পারিস তা করিস্।'

এই কথার পর হিন্দুস্থানী দ্বারবান আসিয়া চোক রাঙ্গাইয়া ছাত্রদিগকে অপমান করিতে লাগিল। ছাত্রেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া অপমানিত হইয়া ডিপো হইতে ফিরিয়া আসিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—ডিপো সম্বন্ধে সংবাদপত্রে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করা যাইবে।

কোন কোন ছাত্র বলিল, মকর্দ্দমা করা উচিত। কোন কোন ছাত্র তাহাতে আপত্তি করিল, বলিল,—বিনোদ বাবু যখন ইচ্ছা পূর্ব্বক গিয়াছেন, তখন মকর্দ্দমায় কিছুই হইবে না।

সুরেশচন্দ্র, কি করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না।

ছাত্রেরা পথে পথে বলাবলি করিল,—অধ্যক্ষেরা ভীত হইয়াছে। পাষাণ হৃদয় ডিপো রক্ষকেরা কাহাকেও ভয় করে না, একথা স্কুলের ছাত্রেরা বুঝিল না।

সুরেশচন্দ্র ছাত্রদের অনুরোধে তাহাদের বাসাতেই গেলেন। ছাত্রেরা সুরেশচন্দ্রকে বিশেষ যত্ন করিয়া রাখিল, এবং সংবাদ পত্র ইত্যাদিতে বিষয়টী লইয়া আন্দোলন তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহাদের উদ্যম দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। দুই চারি দিন ভিন্ন ভিন্ন সম্পাদকদিগের বাড়ী হাটাহাটি করিতে করিতে তাহাদের উৎসাহ কতক কমিয়া আসিল, এবং বাকী টুকু সম্পাদকদিগের তাচ্ছল্য ব্যবহারে দূর হইল। সম্পাদকদিগের নিকট ছাত্রেরা মুখ পাইল না। তখনকার সম্পা-

দকেরা ছাত্রদিগকে অকর্ম্মণ্য জীব বলিয়া জানিত, তাহাদের কথা ততদূর বিশ্বাস করিল না। তবে কোন কোন কাগজে একটু একটু সংবাদ বাহির হইল। এই সংবাদে আশু কোন ফল ফলিল না দেখিয়া, ছাত্রদিগের উৎসাহ কমিয়া গেল। সুরেশচন্দ্র ছাত্রদিগের নৈরাশ ভাব দেখিয়া বিষণ্ণ মনে তাহাদের বাসা পরিত্যাগ করিয়া কালীঘাটে গেলেন।

সুরেশচন্দ্র কিয়দ্দিবস কালীঘাটে রহিলেন, কিন্তু যেমন দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, ততই অনন্তদেবীর শোকোচ্ছাস অসহ্য হইয়া উঠিল। ওদিকে অবিবাহিত ২টী ভগ্নী মাতুলালয়ে রহিয়াছে, তাহাদের বিবাহের সম্বন্ধ জুটিতেছে না, দলাদলির দরুণ কেহই বিবাহ দিতে সম্মত হয় না। মাতুলদিগের চেষ্টায় যখন কিছুই হইল না, তখন সুরেশচন্দ্র জননীকে লইয়া পুন বাড়ীতে আসিলেন। অনেক প্রকার চেষ্টার পর ২টী পাত্র জুটিল, কিন্তু টাকায় কুলাইল না; দশ বার হাজার টাকা খরচ করিতে পারিলে ভগ্নী দুটীকে এক প্রকারে পাত্রস্থ করা যাইত, কিন্তু অত টাকার যোগাড় হইল না। নগদ টাকাদি পূর্ব্বেই মকর্দ্দমা মামলায় নিঃশেষ হইয়াছিল। বিষয়ের কিছু বিক্রয় করিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দলাদলির দরুণ বিষয় কেহই ক্রয় করিল না। এদিকে অলক্ষিত চক্রান্তে প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে, খাজনাদি বন্ধ। লোক নাই, জন নাই, দলাদলিতে সকলের চক্ষুর শূল হইয়া সুরেশচন্দ্র কি কষ্টে রহিলেন, তাহা তিনিই জানিলেন। সমদুঃখী নাই, আত্মীয় নাই, বন্ধু নাই, ভ্রাতৃবিচ্ছেদে অস্থির, ভগ্নীদিগের জন্য চিন্তা-কাতর, পরিবারের মধ্যে অশান্তি, এই সকল কতদিন সুরেশচন্দ্র সহ্য করিলেন, তাহা পরে জানা যাইবে।

গৃহবিচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদ, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, দলাদলি, কষ্ট যন্ত্রণা, শোক ও দুঃখের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, বিনোদ বাবু কোথায় রহিয়াছেন, ঠিক নাই। কুলকামিনী কোথায়, কমলমণি ও পুরোহিত কোথায়, তাহা জানা গেল না। সুলোচনা সেই অরণ্যে, গোরাচাঁদের দল সেই কালীর মন্দিরে। নবলীলার প্রথম খণ্ড এই অবস্থায় শেষ হইল।